৫ম খণ্ড।) (১ম হইতে ১২সংখ্যা।

পঞ্চম খণ্ড।

"কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ।"

(১২৮৯ সালের মাঘ হইতে ১২৯০ সালের পৌষ পর্য্যন্ত)

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
পাইকপাড়া নর্শরী হইতে প্রকাশিত।

১৮ নং টালাবাগান রোড
টালা মেট্রোপলিটন প্রেসে মুদ্রিত।

১২৯০ সাল।

মূল্য ২ টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সূচী পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
Graft বা জোড় কলম	১
খদির বৃক্ষ ...	৮
খইফুল ...	১০
তামাকের ইতিহাস	১২
কৃষি সম্বন্ধে খনার বচন	১৭, ৩৯, ১৭১
কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের গুণাবলী	১৯
রোটাবাগা Ruta Baga	২১
শাক সবজীর আকার বড় করিবার উপায় ...	২৪
হরিদ্রা বা হলুদ ...	২৮
আর্দ্রক বা আদা ...	৩৪
গুটি কলম করিবার সহজ উপায়	৩৭
ডেলফিনিয়ম ...	৪১
পইনসিয়ানা রিজিয়া বা বিলাতি কৃষ্ণচূড়া ...	৪৫
পিপ্পলি বা পিপুল ...	৫০
শণ ...	৫৪ ও ১৫০
মেস্টা ...	৫৫
বাঁশ ...	৫৭
দেশীয় কুলগাছে বিলাতী কুল ফলাইবার উপায় ...	৬২
আম্র সম্বন্ধে কএকটী কথা	৬৭
নানাপ্রকার আম্রের বিবরণ	৭২
রসুন ...	৭৮
নই ...	৮০
আঢ়কী বা অড়র ...	৮১
এরণ্ড বা ভেরাণ্ডা	৮৬
কাঁটাল সম্বন্ধে দুই একটী কথা	৯০
বীজ শূন্য অলাবু ...	৯৫
জোড় কলাগাছ ও একগাছে ৩।৪ প্রকার কদলী ফল	৯৭
একটি দৃষ্টান্ত ...	৯৭
এলাইচ ...	৯৯
মটর বা Peas ...	১০০
পাট ...	১০২
কাঁকুড় বা ফুট (Casaba Citron)	১০৫
রজনীগন্ধ ফুল ...	১০৭
মান কচু ...	১১০
ম্যাঙ্গোষ্টিন	১১২
অসেজ অরেঞ্জ বা চিরস্থায়ী মজবুত বেড়া করিবার গাছ	১১৪
তাল ...	১১৬
Maize (Indian corn) বা জিয়ামেজ ভুট্টা মক্কা বা জনার	১২১
করম শাক ...	১২৯
ডেট্রা Datura বা ধুতুরা	১৩০
সোনামুগ ...	১৩২
লাল লম্বা বা স্বুর্ত্তিমূলা Long (Scarlet strap leaved Radish)	১৩৩
Orchids বা পরগাছার বিষয়	১৩৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ডালিয়া (Dahlia) ...	১৩৯ ও ১৮৬
রাইবেল ফুল ...	... ১৪০
পেয়ারা ...	... ১৪২
বাদাম ...	... ১৪৪
ব্রকলি (Brocoli) ...	... ১৪৫
শ্রীফল ...	... ১৪৬
মধুরিকা বা মৌরী ...	... ১৪৮
বেহার অঞ্চলে চাষ সম্বন্ধীয় প্রবাদ ...	... ১৫৩
গাছপান ...	... ১৫৪
সাগু ...	... ১৫৫
কৃষিবিদ্যা ...	... ১৫৭
বৃক্ষ ...	... ১৫৯
আকন্দ গাছ ...	... ১৬৩
সূর্য্যমুখী ফুল (Helianthus) (Californicus) ...	... ১৬৫
সেগুণ গাছ ...	... ১৬৬
মৌয়াবৃক্ষ ...	... ১৬৯
চাঁপা নটে ...	... ১৭২
লটকন ...	... ১৭৪

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সার ও কর্ষণ ...	... ১৭৯
জল্‌দি উৎপন্ন হইবার কঠিন বাঁধা কপি ...	... ১৮৫
তিসি বা ফ্লাক্সের চাষ	... ১৮৯
নারিকেল সম্বন্ধে কএকটি কথা	১৯৩
কৃষি ব্যবহার্য্য অস্ত্র ...	... ১৯৫
কএকটি নিত্য ব্যবহার্য্য দেশী তরকারি ...	... ২০০
চিরস্থায়ী ফুল ...	... ২০৬
কদলী সূত্র ...	... ২০৭
ইক্ষু ...	... ২০৯
পলাণ্ডু ...	... ২২০
বড় পেঁয়াজ আবাদের প্রণালী	২২৩
লিক (Leek) ...	২২৫
কাউন ...	২২৮
সাচি পান ...	২৩০
ওলের নুতন চাস ...	২৩৩
গারো কুম্‌ড়া ...	২৩৫
কাশ্মীর জাত শাল গমের বিবরণ	২৩৬
সরিসা ...	২৩৮

—o⊂⊃o—

কলিকাতা।

GRAFT বা জোড়-কলম।

কোন গাছের শাখার সহিত অপর একটী চারার পরস্পর মিলন করিয়া গাছ প্রস্তুত করার নাম জোড় কলম। এই কলম প্রস্তুত করিবার নিয়ম জানা থাকিলে ফুল, ফল প্রভৃতি নানা প্রকার গাছ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। বীজের গাছ অপেক্ষা জোড় কলমের গাছে ফুল ও ফল মূল গাছের অনুরূপ হইয়া থাকে। বীজ যেরূপ তদুৎপন্ন গাছও সেইরূপ হওয়াই নিয়ম। কিন্তু নানা কারণে সকল স্থানে সে নিয়ম দেখা যায় না। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, উৎকৃষ্ট আম্র কিম্বা অন্য কোন প্রকার ফলের বীজ রোপণ করিয়া মূল গাছের সদৃশ ফললাভে বঞ্চিৎ হইয়া থাকেন। অনেক গাছের আবার এরূপ স্বভাব যে, তাহার বীজে প্রায়ই চারা উৎপন্ন হয় না। কোন কোন গাছের আবার এরূপ নিয়মও দেখা গিয়া থাকে যে, বীজের চারায় ফললাভ করিতে হইলে অধিক দিন সময় অপেক্ষা

করিতে হয়। কিন্তু জোড় কলমে চারা প্রস্তুত করিলে এই সকল অত্যাচারে কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না। কলমের গাছে অল্পদিনের মধ্যে ফল ধরিয়া থাকে, ফলের আস্বাদন ও আকার মূল গাছের ফলের ন্যায় হইয়া থাকে। এজন্য কলম করিবার নিয়ম জানা অতি আবশ্যক।

ফুল কিম্বা ফলের যে কোন গাছের কলম করিতে হইলে অগ্রে শাখা নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। অর্থাৎ যে ডালের সহিত যে চারার কলম বাঁধিতে হইবে, তাহারা পরস্পর সমবয়স্ক কি না। চারা ও ডাল ঠিক এক অবস্থাপন্ন হওয়া উচিত। পাকা ডালের সহিত কচি চারার কলম ভাল হয় না। আবার চারার কাট শক্ত এবং ডাল কচি হইলেও কলমে ব্যাঘাত হইয়া থাকে। এজন্য ডাল ও চারার কাষ্ঠাংশ তুল্য দেখিয়া কলম বাঁধিতে হয়। মনে কর যে চারার বয়স এক বৎসর, তাহার সহিত কলম বাঁধিতে হইলে এক বৎসর বয়সের ডালের সহিত বাঁধাই উচিত। পরস্পর সমান অবস্থাপন্ন পদার্থের যেমন যোগ হয়, অবস্থার বিরূপ হইলে সেরূপ হয় না। আবার ইহাও জানা উচিত যে, চারা কিম্বা ডাল খুব কচি হইলেও কলমের পক্ষে তত অনুকূল নহে। যে সকল ডালের কাষ্ঠাংশ কিছু শক্ত হইয়াছে এরূপ আকারের চারা ও ডালে কলম বাঁধিলে তাহা শীঘ্র লাগিয়া থাকে। ফুল কিম্বা ফলের গাছের যে সকল ডালের মাথা উপরের দিকে মুখ করিয়া থাকে সেই ডালে কলম বাঁধা বিধেয়। কারণ নিম্নমুখ শাখায় কলম বাঁধিলে কলমের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

যে নিয়মে কলম বাঁধিতে হয় এই প্রস্তাবের শিরোভাগে তাহার একটী চিত্র প্রদর্শিত হইল। এই চিত্রে একটী গোলাপ গাছের ডালের সহিত অপর একটী গোলাপের চারার কলম বাঁধা হইতেছে। বড় টবে যে বড় গাছটী আছে, তাহার পার্শ্বস্থ একটী ডাল বাঁকাইয়া চারার সহিত মিলিত হইয়াছে। সকল গাছের সকল ডাল কলম বাঁধার উপযুক্ত আকারে জন্মে না। যে সকল ডাল অনেক গুলি ডালের মধ্যে থাকে, তাহাদিগকে বাঁকাইয়া মাটিতে শোয়াইয়া রাখিতে হয়। ডাল মাটিতে পড়িয়া থাকিলে, তাহার প্রত্যেক গাঁইট হইতেই প্রায় এক একটী কেঁকড়ী

বা ছক বাহির হয়। ডালের ঐরূপ কেঁকড়ীই কলম বাঁধার পক্ষে সুবিধা। নতুবা প্রত্যেক ডালের সহিত কলম বাঁধিতে হইলে কলমের সংখ্যা অল্পই হইয়া থাকে। মনে কর একটী গাছে দশটী ডাল আছে, আর প্রত্যেক ডালে যদি কলম বাঁধা যায় তবে দশটীর অধিক কলম প্রস্তুত হইবে না। কিন্তু ঐ দশটী ডাল যদি মাটিতে শোওয়াইয়া রাখা যায় এবং প্রত্যেক ডালের গাঁইট হইতে যদি পাঁচটী করিয়াও কেঁকড়ী নির্গত হয় তাহা হইলে দশটী ডালে অন্ততঃ পঞ্চাশটী কলম বাঁধা যাইতে পারে। গোলাপ গাছ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। আম্র প্রভৃতি গাছের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। তাহাদিগের প্রত্যেক ডালে এক একটীর অধিক কলম প্রস্তুত হয় না। গোলাপ গাছের পক্ষেই ঐরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। গোলাপের মধ্যে জায়গেণ্টিয়া নামে এক জাতীয় জঙ্গলা প্রকৃতির গোলাপ আছে, তাহার চারার সহিত কলম বাঁধিলে কলমের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। জায়গেণ্টিয়া একপ্রকার অমর গাছ, সহজে নষ্ট হয় না। এই জাতীয় গাছে প্রায়ই গোলাপ হয় না। প্রথমে জায়গেণ্টিয়ার ডাল কাটিয়া খোঁচা কলম প্রস্তুত করিতে হয়। খোঁচা কলমের নিয়ম এই যে, এক একটী ডাল ৮।১০ আঙ্গুল পরিমাণ করিয়া কাটিতে হয়। পরে ঐ কর্ত্তিত অংশ কোন স্থানে হাপোর প্রস্তুত করিয়া তথায় পুঁতিতে হয়। হাপোরে কিছু দিন উহা থাকিলে গাছ লাগিয়া যায়। গাছ লাগিয়া গেলে, তখন তাহা তুলিয়া ভাল ভাল গোলাপ ডালের সহিত কলম বাঁধিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে কোন গোলাপের কলম বাঁধিতে হইলে তাহার ডাল মাটিতে শোওয়াইয়া রাখিতে হয়। অনন্তর ঐ ডালের চোক হইতে কেঁকড়ী বাহির হইলে সেই কেঁকড়ীর পাশে জায়গেণ্টিয়ার চারা পুঁতিতে হইবে উহা এরূপ ভাবে পুঁতিতে হইবে তাহা যেন কেঁকড়ীর মাথার সহিত সমান উচ্চভাবে থাকে। এইরূপ নিয়মে চারা রোপণ করা হইলে ডালের মধ্যস্থল হইতে দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থান এবং চারার মধ্যভাগ হইতেও ঐ পরিমিত অংশ ছুরিয়া কাটিতে হইবে। তীক্ষ্ণধার ছুরী দ্বারা কলম কাটা আবশ্যক। কারণ ছুরীর ভাল ধার না থাকিলে কলম কাটিবার সময় গাছে আঘাত লাগিতে পারে।

আঘাত লাগিলে সেই কর্ত্তিত স্থান নষ্ট হইবার সম্ভব। এই নিয়মে চারা ও ডালের নির্দ্দিষ্ট অংশ কাটা হইলে সূতা দ্বারা ঐ কর্ত্তিত অংশ পরস্পর জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। এই চিত্রে ক নামক স্থান কর্ত্তন করিয়া পরস্পর বাঁধা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জায়গেণ্টিয়ার ডাল খোঁচা কলমে চারা প্রস্তুত করিয়া সেই চারার সহিত অন্যান্য গোলাপের কলম বাঁধিতে হয়। এস্থলে ইহা মনে রাখা উচিত যে, জায়গেণ্টিয়ার যে ফেঁকড়ীটী সবল ও তেজাল তাহার সহিত কলম বাঁধাই উচিত। কারণ জায়গেণ্টিয়ার চারা যে পরিমাণে তেজবিশিষ্ট হইবে, কলমের চারাও সেই পরিমাণে সবল হইয়া উঠিবে। এজন্য জায়গেণ্টিয়ার যে ফেঁকড়ীতে কলম বাঁধা হইবে, তাহা রাখিয়া আর আর ডাল কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ উগতে অধিক ডাল থাকিলে প্রত্যেক ডালই আপন আপন দেহ পরিপোষণের নিমিত্ত মূল গাছ হইতে রস গ্রহণ করিবে। সুতরাং কলম বাঁধা ডালে প্রচুর রস প্রাপ্ত হইতে ব্যাঘাত জন্মিবে। যে চারায় কলম বাঁধিতে হইবে তাহা যত সতেজ হয় ততই ভাল।

কলম বাঁধিবার সময় আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। ডাল ও চারা যখন পরস্পর সূতা দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে, সেই সময় উহা যেন উত্তমরূপ বাঁধা হয়। কারণ ডাল ভাল বাঁধা না হইলেঅর্থাৎ সল থাকিলে ঐ বাঁধার স্থান হইতে আবের ন্যায় ফুলিয়া উঠিতে পারে। ঐরূপ ফুলিয়া উঠিলে চারা মরিয়া যাইবার সম্ভব।

কলম বাঁধার পর চারার মাথা অর্থাৎ বন্ধনের ঠিক উপর খ নামক স্থান কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ চারার মাথা না কাটিয়া দিলে গাছের রস উপরে উঠিয়া বাড়িতে থাকিবে। আর মাথা কাটিয়া দিলে ঐ রস উঠিতে না পারিয়া কলম বাঁধা শাখায় সঞ্চারিত হইবে। এইরূপ অবস্থায় কিছু দিন কলম বাঁধা থাকিলে উহা লাগিয়া যাইবে। কলম লাগিয়া গেলে, তখন কলম বাঁধা স্থানের নিম্নে কাটিয়া দিতে হইবে। অনন্তর কিছুদিন চারা না তুলিয়া সেই স্থানেই রাখিতে হইবে।

উপরি উক্ত নিয়মে কলম প্রস্তুত হইলে, তাহা তুলিয়া বাগানে অথবা টবে

কিম্বা যে কোন স্থানে রোপণ করিতে পারা যায়। যে কোন উদ্ভিদের স্বজাতীয় গাছের সহিতই উত্তম জোড় হইয়া থাকে। সমশ্রেণীর গাছ না হইলে প্রায় জোড় লাগে না। এজন্য আমের সহিত আম্র, গোলাপের সহিত গোলাপ এবং জবার সহিত স্থলপদ্মের জোড়কলম হইয়া থাকে। জবা এবং স্থলপদ্ম যদিও ভিন্ন জাতীয় গাছ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক উহা ভিন্ন জাতীয় গাছ নহে। আম্রের জোড় কলম বাঁধিতে হইলে এক বৎসরের পুরাতন ডালের সহিত জোড় বাঁধাই বিধেয়। অম্রের জোড়-কলম বাঁধিবার সময় আর একটী বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়; অর্থাৎ নিতান্ত অম্লরসবিশিষ্ট চারার সহিত মিষ্ট গাছের কলম বাঁধা উচিত নহে। কারণ মন্দ গাছের সহিত ভাল গাছের কলম বাঁধিলে ক্রমে ক্রমে ভাল গাছের গুণ নষ্ট হইতে পারে। এজন্য সুমিষ্ট আম্রের চারার সহিত মিষ্ট গাছের কলম বাঁধাই উচিত। জোড় বাঁধিতে যদি এক জাতীয় গাছ না পাওয়া যায়, তবে তজ্জাতীয় কোন ডালের সহিত বাঁধিলেও তাহা জোড় লাগিতে পারে। এক জাতীয় গাছের মধ্যে যত নিকট জাতীয় গাছ হয় কলমের পক্ষে ততই সুবিধা।

যে সকল গাছের আকার বড়, তাহাদিগের কলম বাঁধিতে হইলে, যে ডালে কলম বাঁধিতে হইবে, তথায় মাচা বাঁধিয়া সেই মাচায় টবে করিয়া চারা স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপভাবে চারা স্থাপন করিলে চারার মাথা ঐ ডালের মাথার সহিত সমান হইবে। এজন্য আম্রাদি বড় বড় গাছের চারা টবে প্রস্তুত করিতে হয়। গোলাপের চারা টবে প্রস্তুত না করিলে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ তাহার ডাল সকল মাটিতে শোওয়াইয়া কলম বাঁধিলে চলিতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গাছের পক্ষে জোড় কলম বাঁধিবার ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। আম্রাদির কলম বর্ষাকালে বাঁধিতে হয়। গোলাপের জোড় কলম বাঁধিবার পক্ষে কার্ত্তিক মাসই প্রশস্ত সময়। বৎসরের মধ্যে অন্যান্য সময়ে যদিও ঐ সকল গাছের জোড় কলম বাঁধিলে কলম প্রস্তুত করিতে পারা যায় কিন্তু অসময় নিবন্ধন অনেক কলম না লাগিবার সম্ভব। সকল কার্য্যের পক্ষেই এক একটী সময় নির্দ্দিষ্ট আছে।

উদ্যানকারীগণের সেই সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। কলম বাঁধিবার পক্ষে যেমন এক একটী সময় নির্দ্ধারিত আছে; সেইরূপ আবার এক এক জাতীয় গাছের কলম লাগিবার সময়ও নিরূপিত দেখা যায়। গোলাপের যত শীঘ্র জোড় লাগিয়া থাকে, আম্রের জোড় তত শীঘ্র লাগে না। গোলাপের কলম এক প্রকার অমর বলিলেও হয়। কারণ সহজে উহার জীবনী-শক্তি বিনষ্ট হয় না। সামান্য ডালেও গাছ হইতে পারে। তবে যাহার কলম বাঁধিবার আদৌ ক্ষমতা নাই, তাহা দ্বারা জোড় বাঁধিলে প্রথমে দুই একটী কলম না হইলেও হইতে পারে। কিছু দিন নিজের হাতে কলম তৈয়ার না করিলে, উহা শিখা যায় না। অস্ত্র চিকিৎসা-বিদ্যা যেমন কিছু দিন স্বহস্তে চালনা করিলে, তাহাতে জ্ঞান জন্মে, কলম কাটার পক্ষেও সেইরূপ নিয়ম। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে কলম বাঁধিবার পূর্ব্বে কলম বাঁধিবার উপযোগী শাখা ও চারা স্থির করিয়া লইতে হয়। কারণ তাহা স্থির করিতে না পারিলেও সুন্দররূপ কলম প্রস্তুতের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। কলম প্রস্তুত হইলে ডালের জোড়ের নিম্নে কাটিয়া দিতে হয়। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত কলম না লাগিয়া যায়, ততদিন শাখা কাটা উচিত নহে। কারণ অসময়ে শাখা কাটিয়া দিলে তাহার অগ্রভাগ অর্থাৎ জোড়ের উপর হইতে অবশিষ্ট শাখা শুকাইয়া যাইবে। এজন্য তদ্‌পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। চারা ও শাখা হীনতেজ হইলেও তাহাদিগের কলম ভাল হয় না। যে সূতা কি মোটা দড়ী দ্বারা জোড়স্থান বাঁধিয়া দিতে হয়, জোড় লাগিয়া গেলে সেই সূতা কিম্বা রজ্জু খুলিয়া না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। কলম বাঁধিবার সময় শাখা ও চারার যে স্থান কাটিয়া পরস্পর জুড়িয়া বাঁধিতে হয় সেই কর্ত্তিত স্থান হইতে এক প্রকার রস নির্গত হইয়া চারা ও শাখার কাষ্ঠাংশ এক অঙ্গের ন্যায় হইয়া উঠে। কলম বাঁধার পর প্রবল ঝড় কিম্বা অন্য কোন কারণে ঐ জড়িত স্থান যদি নড়িয়া যায়, তাহা হইলে জোড় লাগিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইতে পারে।

কলমের চারা রোপণ করিবার সময় আর একটী বিষয়ের প্রতি মনো-

যোগ দিতে হয়। চারা পুঁতিবার দোষে অনেক কলম নষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ কলম বাঁধা স্থানটী অনেক উপরে রাখিয়া চারা পুঁতিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ভাবে রোপণ করা অবৈধ। কারণ জোড় উপরে থাকিলে এবং শাখা প্রশাখা বড় হইলে, ঐ স্থান চিরিয়া যাইতে পারে। বৃক্ষের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা জোড় বাঁধা স্থান যে অপেক্ষাকৃত শিথিল থাকে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। মালদহ অঞ্চলে আম্রের কলম শাখার কিছু উপরে বাঁধা হইয়া থাকে। উহা এত উপরে বাঁধা হয় যে আবশ্যকীয় স্থান পর্য্যন্ত মাটির মধ্যে পুঁতিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ কলমের চারা জোড়ের অর্দ্ধেক পরিমাণ উপরে রাখিয়া পুঁতিবার নিয়ম। কিন্তু কলম অধিক উপরে বাঁধা হইলে রোপণের সময় সে নিয়ম রক্ষা হয় না। এজন্য অধিক উপরে জোড় বাঁধা নিষেধ।

যে সকল বৃদ্ধি-শীল বৃক্ষ বাগানের অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে, সেই সকল গাছের বীজের চারা রোপণ না করিয়া কলমের চারা রোপণ করা ভাল; কারণ কলমের চারা বীজের গাছের ন্যায় সহজে তত বড় হয় না। বাগানে বড় বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে অনেক স্থান অনর্থক পড়িয়া থাকে, গাছের আওতায় লাভজনক অন্য কোন উদ্ভিদ্ জন্মে না। কলমের গাছ রোপণ করিলে অনেক স্থান বাঁচিতে পারে এবং সেই স্থানে অন্যান্য গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। অল্প দিনের মধ্যে ফল ভোগ করিতে হইলে কলমের চারার গাছের ন্যায় বীজজাত চারায় তাহা হয় না। ফলতঃ ফুল ও ফলাদির উৎকর্ষ সাধন এবং অল্প দিনের মধ্যে উহা উপভোগ করিবার পক্ষে কলমের গাছই একমাত্র উপায়।

খদির-বৃক্ষ।

খদির আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি। খদিরের গাছ বাবলা গাছের ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে খএরেরের গাছ হইয়া থাকে। বাবলা বীজের ন্যায়ও খদিরের বীজ বুনিয়া চারা তৈয়ার করিতে হয়। উহার চারা প্রস্তুত করা অতি সহজ। কোন একটী স্থানে হাপোর করিয়া, তথায় বীজ বপন করিলেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। হাপোরে চারা কিছু বড় হইলে তাহা তুলিয়া বাগানে রোপণ করিলেই চলিতে পারে। অন্যান্য গাছ অপেক্ষা খএর গাছের অত্যন্ত বৃদ্ধি। অল্প দিন মধ্যেই উহার গাছ বড় হইয়া উঠে। পাইটের মধ্যে গোড়া পরিস্কার রাখিতে হয়। বৎসর বৎসর কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া অল্প পরিমাণে সারমাটি দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চারার অবস্থায় গ্রীষ্মকালে গাছের মূলে জল দিলে অনেকটা উপকার হইয়া থাকে। ফলকথা খএরেরের গাছ তৈয়ার করিতে বিশেষ কোনরূপ যত্ন করিতে হয় না।

খদির আমাদের অনেক উপকারী। অতি প্রাচীনকাল হইতে খদির ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। খদির দেখিতে পিঙ্গলবর্ণ এবং তিক্ত কষায়। খদির চূর্ণ ও দ্রব করিতে পারা যায়। হিন্দু শাস্ত্রমতে খদিরের কাষ্ঠ অতি পবিত্র, এজন্য উহা যজ্ঞীয় হোমে ব্যবহার হইয়া থাকে। খদির প্রস্তুত করিতে হইলে গাছের সারভাগ খণ্ড খণ্ড ভাবে কাটিয়া তাহা কাটাছে সিদ্ধ করিতে হয়। ঐ কাষ্ঠ খণ্ড কিছুক্ষণ সিদ্ধ হইলে তাহা হইতে মধুর ন্যায় এক প্রকার গাঢ় পদার্থ নির্গত হয়। অনন্তর ঐ ঘন পদার্থ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহা জমিয়া খদির প্রস্তুত হইয়া থাকে। খএরের সার ভাগ হইতে উহা প্রস্তুত হয়, এজন্য উহাকে খদির-সার কহে। বাজারে যে সকল খদির বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আকার দেখিতে পাওয়া যায়।

যে কয়েক প্রকার খএর দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পাপড়ি খএরই তাম্বুলের সহিত ব্যবহার করিতে ভাল।

খদির বৃক্ষ হইতে যেমন খএর প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগ এবং কতিপয় ভারত সাগরীয় দ্বীপ-শ্রেণীতে এক প্রকার গুবাক জন্মিয়া থাকে, তাহা হইতেও খএর জন্মে। ঐ সকল গুবাক হইতে খএর প্রস্তুত করিতে হইলে গুবাকগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হয়। অনন্তর কিয়ৎ পরিমাণ খদির বৃক্ষের ছাল এবং সোরা মিশ্রিত জল তাহাতে দিয়া আগুণে জ্বাল দিতে হয়। এইরূপ প্রণালী অনুসারে কিছুক্ষণ জ্বাল দিলে তাহা হইতে এক প্রকার ঘন পদার্থ নির্গত হয় অনন্তর উহা তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই খএর প্রস্তুত হইয়া থাকে॥

খয়ের যে কেবল তাম্বুলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা নহে। উহা আমাদের বিস্তর উপকারে লাগিয়া থাকে। বৈদ্যশাস্ত্রমতে খদির নানা রোগে ব্যবহার হয়। খদির শীতল, পাচন ও পিত্ত, কফ, কাশ বেদনা প্রভৃতি নানা রোগে অত্যন্ত উপকারী ঔষধ। ডাক্তারদিগের মতে উদরাময় রোগে উহা মহৌষধ। খদির সেবন করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ এবং বহিঃস্থ চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ লৌহপাত্রে আমলার জলে খএর ভিজাইয়া তাহা রৌদ্রে রাখিয়া সোহাগার খৈ দ্বারা ঐ জল মর্দ্দন করত একপ্রকার কলী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই কালী দ্বারা পুথি লিখিত হইয়া থাকে। খএরে কষ থাকাতে রঙের জন্য উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইয়ুরোপীয়েরা খদির মিশ্রিত করিয়া লোহিত পীত, এবং কপিশ প্রভৃতি নানাবিধ রঙ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এদেশে অনেক স্থানের স্ত্রীলোকেরা খদিরের নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত করিয়া থাকে। খদিরের খেলনা প্রস্তুত করিতে হইলে উহা তরল অবস্থায় ছাঁচে ঢালিতে হয়। ছাঁচে ঐ তরলবৎ পদার্থ শুষ্ক হইলেই খেলানার উপযোগী পদার্থ হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে খএরের গাছ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষ কোনরূপ পাইট করিতে হয় না, সামান্য যত্নেই উহার গাছ হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ইচ্ছা করিলে এই গাছ প্রস্তুত করিতে পারেন।

এদেশে খএরের বাগান করিয়া খদির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে বিস্তর লাভ হইতে পারে। খএর যেরূপ পরিমাণে নিত্য ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ইহার আবাদ করিলে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। এদেশের মাটিতে অনায়াসেই খএরের গাছ হইতে পারে। চাকরীপ্রিয় শিক্ষিতগণ যদি এই লাভজনক চাষে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে স্বাধীনভাবে সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। আমাদের দেশের লোকদিগের এই একটী মহৎ দোষ যে তাঁহারা কোন নূতন বিষয়ে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়েন না। দেশীয় লোকদিগের নূতন নূতন চাষে মনোযোগ থাকিলে দেশেরও অবস্থা ভাল হইতে পারে এবং সেই সঙ্গে নিজেরও অবস্থা উন্নতি-পদে অগ্রসর হইয়া থাকে।

খইফুল।

"Full many a gems of purcest ray serene
The dark fathoms of oceans bear,
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air."

Grag's Elegy.

খই ফুল দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার আকার ঠিক খইএর ন্যায়। বর্ষা-কালে পল্লীগ্রামের বাগ্দী, ডোম, হাড়ী, চণ্ডাল প্রভৃতি ইতর বংশদ্ভূতা দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা খইফুল ভাজিয়া অন্নের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। এতদিন এই ফুলের কেহ আদর করিত না; ইহার সুগন্ধ কিম্বা উপাদেয়তার জন্য কোন "সৌখীন বাবু" কিম্বা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত ইহার নিকটে উপস্থিত হইতেন না। পাড়াগাঁয়ের ছোট লোকদিগের হাঁড়ী এবং "চাটুর"

মধ্যেই খইফুল এতকাল বিরাজ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি ইহার গুণরাশি যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ভরসা করা যায়, অনতিবিলম্বে ইহা সৌখীন বাবুর পকেটে, কালেজের অজাত-শ্মশ্রু যুবার হস্তে, ম্যাম সাহেবের শিরোদেশে, মালীর তোড়ায় এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের "ক্যারেটে" শোভা পাইবে। কোন বাবুর বাগানে আমরা কখন খই-ফুল ফুটিতে দেখিনাই; পল্লীগ্রামের পতিত জায়গায়, ঝুপি বনে, বহু-কালের অব্যবহার্য্য পুকুরে, খালের ধারে এই ফুল ফুটিতে দেখা যায়। কেহ ইহার সুরভি গ্রহণ করে না, ইহা নিজের গন্ধেই নিজে মোহিত হয়। মরুভূমে যে ফুল ফুটে, কয় জন তাহার সুগন্ধি লয়? কিন্তু যাহার সুগন্ধ আছে, কয়দিন তাহা লুকাইয়া থাকিতে পারে?

খইফুলের বর্ণ শাদা, আকার ক্ষুদ্র। লম্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিস্তৃতি কিছু কম। জুঁই ফুলের ন্যায় ইহার সুগন্ধ; যত শুষ্ক হয় ততই সুরভি বাড়ে। তুলসী গাছের ন্যায় খইফুলের গাছ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া যায়; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের গুচ্ছ জন্মে। ঐ গুচ্ছগুলি শুষ্ক হইলে তাহা আপনি ঝরিয়া যায় এবং তাহা হইতে যে বীজ ভূমিতলে পতিত হয় তাহাতে পুনরায় নূতন বৃক্ষ জন্মে। আমি প্রায় তিন বর্ষকাল পূর্ব্বে কৃষিতত্ত্বে "সূর্য্য-মুখী ফুলের প্রসঙ্গে, সূর্য্যমুখী ফুল হইতে তৈল, সুগন্ধজল, সার (manure) ইন্ধন ইত্যাদির কথা লিখিয়াছিলাম। খইফুল সম্বন্ধেও সেই কথা প্রয়ো-জিত হইতে পারে। কৃষিতত্ত্বের পাঠকেরা মল্লিখিত সূর্য্যমুখী ফুল নামধেয় প্রবন্ধটি আর একবার পাঠ করিয়া দেখিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। খইফুলের আবাদ করিলে নানা প্রকারে বেশ দশটাকা লাভ হইতে পারে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক (ডাক্তার) তামিজুদ্দীন লিখিয়াছেন——

"* * আমি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমের কথা উল্লেখ করিলাম, তদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য প্রকার কুসুম আছে; তন্মধ্যে খইফুল অতি উৎকৃষ্ট। খইফুল যেমন সুগন্ধযুক্ত, তেমন উপাদেয়। পল্লীগ্রামের খালের ধারে যখন অগণ্য খইফুলের গাছ সারি সারি জন্মায় তখন বড় শোভা হয়। পুকুরের জলের মাঝে ফুটিতে দেখিলে মন বড় প্রীতিলাভ করে। খইফুল কেবল শোভা বৃদ্ধি করে না, কেবল নয়নের ও নাসিকার তৃপ্তি সাধন করে না, ইহার গাছ

এদেশে খএরের বাগান করিয়া খদির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে বিস্তর লাভ হইতে পারে। খএর যেরূপ পরিমাণে নিত্য ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ইহার আবাদ করিলে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। এদেশের মাটিতে অনায়াসেই খএরের গাছ হইতে পারে। চাকরীপ্রিয় শিক্ষিতগণ যদি এই লাভজনক চাষে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে স্বাধীনভাবে সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। আমাদের দেশের লোকদিগের এই একটী মহৎ দোষ যে তাঁহারা কোন নূতন বিষয়ে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়েন না। দেশীয় লোকদিগের নূতন নূতন চাষে মনোযোগ থাকিলে দেশেরও অবস্থা ভাল হইতে পারে এবং সেই সঙ্গে নিজেরও অবস্থা উন্নতি-পদে অগ্রসর হইয়া থাকে।

খইফুল।

" Full many a gems of purcest ray serene
The dark fathoms of oceans bear,
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air."

Grag's Elegy.

খই ফুল দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার আকার ঠিক খইএর ন্যায়। বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের বাগদী, ডোম, হাড়ী, চণ্ডাল প্রভৃতি ইতর বংশদ্ভূতা দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা খইফুল ভাজিয়া অন্নের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। এতাদিন এই ফুলের কেহ আদর করিত না; ইহার সুগন্ধ কিম্বা উপাদেয়তার জন্য কোন "সৌখীন বাবু" কিম্বা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত ইহার নিকটে উপস্থিত হইতেন না। পাড়াগাঁয়ের ছোট লোকদিগের হাঁড়ী এবং "চাটুর"

মধ্যেই খইফুল এতকাল বিরাজ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি ইহার গুণরাশি যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ভরসা করা যায়, অনতিবিলম্বে ইহা সৌখীন বাবুর পকেটে, কালেজের অজাত-শ্মশ্রু যুবার হস্তে, ম্যাম সাহেবের শিরোদেশে, মালীর তোড়ায় এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের "ক্যারেটে" শোভা পাইবে। কোন বাবুর বাগানে আমরা কখন খই-ফুল ফুটিতে দেখিনাই; পল্লীগ্রামের পতিত জায়গায়, ঝুপি বনে, বহু-কালের অব্যবহার্য্য পুকুরে, খালের ধারে এই ফুল ফুটিতে দেখা যায়। কেহ ইহার সুরভি গ্রহণ করে না, ইহা নিজের গন্ধেই নিজে মোহিত হয়। মরুভূমে যে ফুল ফুটে, কয় জন তাহার সুগন্ধি লয়? কিন্তু যাহার সুগন্ধ আছে, কয়দিন তাহা লুকাইয়া থাকিতে পারে?

খইফুলের বর্ণ শাদা, আকার ক্ষুদ্র। লম্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিস্তৃতি কিছু কম। জুঁই ফুলের ন্যায় ইহার সুগন্ধ; যত শুষ্ক হয় ততই সুরভি বাড়ে। তুলসী গাছের ন্যায় খইফুলের গাছ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া যায়; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের গুচ্ছ জন্মে। ঐ গুচ্ছগুলি শুষ্ক হইলে তাহা আপনি ঝরিয়া যায় এবং তাহা হইতে যে বীজ ভূমিতলে পতিত হয় তাহাকে পুনরায় নূতন বৃক্ষ জন্মে। আমি প্রায় তিন বর্ষকাল পূর্ব্বে কৃষিতত্ত্বে "সূর্য্যমুখী ফুলের প্রসঙ্গে, সূর্য্যমুখী ফুল হইতে তৈল, সুগন্ধজল, সার (manure) ইন্ধন ইত্যাদির কথা লিখিয়াছিলাম। খইফুল সম্বন্ধেও সেই কথা প্রয়োজিত হইতে পারে। কৃষিতত্ত্বের পাঠকেরা মল্লিখিত সূর্য্যমুখী ফুল নামধের প্রবন্ধটি আর একবার পাঠ করিয়া দেখিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। খইফুলের আবাদ করিলে নানা প্রকারে বেশ দশটাকা লাভ হইতে পারে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক (ডাক্তার) তানিজুদ্দীন লিখিয়াছেন——
" * * আমি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমের কথা উল্লেখ করিলাম, তদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য প্রকার কুসুম আছে; তন্মধ্যে খইফুল অতি উৎকৃষ্ট। খইফুল যেমন সুগন্ধযুক্ত, তেমন উপাদেয়। পল্লীগ্রামের খালের ধারে যখন অগণ্য খইফুলের গাছ সারি সারি জন্মায় তখন বড় শোভা হয়। পুকুরের জলের মাঝে ফুটিতে দেখিলে মন বড় প্রীতিলাভ করে। খইফুল কেবল শোভা বৃদ্ধি করে না, কেবল নয়নের ও নাসিকার তৃপ্তি সাধন করে না, ইহার গাছ

যে স্থলে জন্মে সে স্থলের বায়ু পরিষ্কার থাকে। অন্যান্য ফুলগাছের প্রতি যেরূপ যত্ন করিতে হয়, এই গাছের প্রতি ততদূর করিতে হয় না। এই একটী বেশ্ সুবিধা, এগাছ গরুতে খায়না; শুনিয়াছি পল্লীগ্রামের ইতরজাতীয় দরিদ্রা বিধবা বৃদ্ধাগণ এই ফুল ভাজিয়া তরকারী করে।” প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হণ্টার সাহেব বর্দ্ধমানের statistical account নামক পুস্তকে এই ফুলের প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্ত।

তামাকের ইতিহাস।

কোন্ সময় হইতে তামাক ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। ইতিহাসে দেখা যায় কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইয়ুরোপ খণ্ডে তামাক প্রচলন ছিল না। কলম্বস যে সময় আমেরিকা আবিষ্কারার্থে আটলাণ্টিক মহাসাগরে জাহাজ পরিচালনা করেন, সেই সময় তাঁহার দুইটী সহচরকে কিউবাদ্বীপ আবিষ্কার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন কতকগুলিন লোক একস্থানে বসিয়া আছে এবং তাহাদিগের মুখ ও নাসিকা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। কি কারণে ঐ সকল লোকদিগের মুখ ও নাসিকা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করায় অবগত হইলেন, তাহারা এক প্রকার গাছের শুষ্ক পত্র অগ্নিসংযোগ করিয়া সেবন করিয়া থাকে। ঐ পত্রের ধূম সেবন করিলে শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ শ্রান্তি হইয়া থাকে। ইউরোপীয়েরা ইতিপূর্ব্বে তামাকের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। এক্ষণে কিউবাবাসীগণের নিকট হইতে

তামাকের ব্যবহার অবগত হইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমেরিকা ও কিউবাবাসীরা তিনটী মুখবিশিষ্ট এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তত করিয়া তদ্বারা তামাক সেবন করিতেন। এই তিন মুখবিশিষ্ট নলের একমুখে গুঁড়া তামাক সাজিয়া অপর মুখদুটী নাসিকার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া উহা সেবন করিত। এবং মুখ দ্বারা ধূম নির্গত করিত।

১৫৬১ অব্দে নাইকট্ নামে এক ব্যক্তি রাজ্ঞী ক্যাথারাইনকে কিয়ৎপরিমাণে তামাক উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন এই কারণ বশতঃ তামাকের তৈলাক্ত বিষের নাম নিকোটাইন হইয়াছে। তামাকের টোবাকো নাম কি কারণে হইয়াছে, তদুত্তরে অনেকে বলিয়া থাকেন, প্রথমে টোবাকো নামক স্থানে উহা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইউরোপীয়েরা উহার টোবাকো নাম রাখিয়াছেন। স্পেনীয়েরাও উহা টোবাকো বলিত। আর কিউবাবাসীরা যে ত্রিমুখ নলে তামাক খাইত তাহাকেও টোবাকো কহিত। কাহারও কাহারও মতে এই টোবাকো হইতে টাবাকু নাম হইয়াছে। ফরাসিসেরা ট্যাবাক্ কহিয়া থাকেন, ওলন্দাজ ও সুইডেন দেশের লোকেরাও টোবাক্ বলিরা থাকেন, পোলাণ্ডের লোকেরা ট্যাবাক্ কহে এবং পর্টুগাল ও ইটালির লোকেরা টবাকো বলিতেন।

বিলাতের মধ্যে মিষ্টার রালফ্‌লেন নামে এক ব্যক্তি প্রথমে ধূমপান করেন। কেহ কেহ আবার ইহাও কহিয়া থাকেন ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে তামাক আসিয়াছিল। মতান্তরে ইহাও উল্লিখিত আছে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে ইংলণ্ডে তামাক আনীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে প্রথমে যখন তামাক ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয় সেই সময় অনেকে তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আপত্তিতে কোন ফলোদয় হয় নাই। দেশের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত এতদূর তামাকে অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে অনেকে স্বগৃহে তামাক খাইতে পাইতেন না বলিয়া ধূমপানের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিতেন।

তামাক সম্বন্ধে ইংলণ্ডে একখানি কাব্য প্রকাশ হয়। সেই কাব্যে লিখিত আছে “কোন সময়ে পঞ্চভূতের সভা সংস্থাপিত হয়।” প্রমিথিয়স নামক দেবতা উক্ত সভায় এই প্রকার বলেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টি এখনও

সম্পূর্ণ হয় নাই। পৃথিবীতে এমন এক প্রকার আশ্চর্য্য গাছ জন্মিবে যে তাহার ধূমপানে মৃতব্যক্তিরও চৈতন্য সঞ্চার হইবে। ঐ পঞ্চভূত কর্ত্তৃক তামাক সৃষ্ট হইয়াছিল। জুপিটর দেবতা এই তামাকের গাছ দেখিয়া যার পরনাই রাগান্বিত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন যে, ইউরোপ খণ্ড ও যে সকল দেশে ইহার পরিচিত সে সকল দেশে উহার চাষ হইবে না।

পারস্য দেশে বহুকাল অবধি তামাক প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রচলিত ছিল। সেই জন্যই কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, পূর্ব্বাঞ্চলেই ইহার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে এদেশে তামাক আনীত হইবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে ইহা প্রচলিত ছিল কি না ইহা লইয়া অনেকে বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, ইউরোপ খণ্ডে তামাক আনীত হইবার পূর্ব্বে, এমন কোন পুস্তক দেখা যায় না যাহাতে তামাকের নাম উল্লেখ আছে। বেল সাহেব বলেন যে, চীনবাসীরা কহিয়া থাকে তাহাদের দেশে বহুকাল হইতে ধূমপানের প্রথা প্রচলিত আছে। আমরা বোধ করি যে, বেল সাহেবের ভ্রম হইয়া থাকিবে। না হয় তিনি যাঁহার মুখে শুনিয়াছেন, তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে। কারণ চীন ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হইয়াছি যে, তাঁহাদের দেশে বহুকাল হইতে ধূমপানের প্রথা প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা যে, তামাকের ধূম তাহার কোন প্রমাণ নাই। বোধ হয় গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ধূম হইবে। চীনবাসীরা যে, ভারতবর্ষ হইতে তামাক লইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা অনেক স্থানে পাইয়াছি।

অসামান্য রূপমাধুরিসম্পন্না সুবিখ্যাতা নূরজাহানের হৃদয়নাথ জাহাঙ্গির যখন দিল্লির সিংহাসনে আধিপত্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যপ্রিয় পর্ত্তুগালবাসীরা ভারতভূমিতে তামাক আনয়ন করেন। এই সময়ের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগালবাসীরা পারস্য উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে পারস্য দেশে তামাক প্রচলিত হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি কহেন, পর্ত্তুগালের লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের সহিত তামাকও বহুপরিমাণে ক্রয় করিয়া পারস্যবাসীদিগকে বিক্রয় করিত।

তুরস্কবাসীরা পারস্যদেশ হইতে তাম্রকূট ক্রয় করিয়া সেবন করিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তুরস্কবাসীরাও ভারতবর্ষ হইতে তামাক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। স্যার টমাস হারবট কহেন যে "আমি এক দিবস দেখিলাম বোগদাদের সরাইতে বৈকালে বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া ধূমপান করিতেছে। শ্রুত হইলাম তাহারা প্রত্যহ বৈকালে এই প্রকার ধূমপান করিয়া থাকে।"

স্যাণ্ডিস সাহেব ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনিও কহেন, আমি এই প্রথম তুরস্কবাসীদিগের তামাক সেবন অভ্যাস হইতেছে দেখিলাম। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দেই তুরস্ক দেশে তামাক প্রচলিত হইয়াছিল। স্যাণ্ডিসসাহেব এ কথাও বলেন ইংরাজেরাই ইহাদিগকে প্রথম তামাক সেবন করিতে অভ্যাস করাইয়াছিলেন।

তামাকের দোষ গুণ।———তামাক পটাস দ্রব্যের সহিত চুয়াইলে এক প্রকার তৈলাকার ক্ষার গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহাকে নাইকোটিয়ানিন কহে। এই বিষ বর্ণহীন, তরল, উগ্র তাম্রকূটের গন্ধযুক্ত। আস্বাদ তিক্ত এবং কটু। এই বিষয়ই মানব দেহের অতি অহিতকর পদার্থ। তাম্রকূটের ধূমপান করিলে শরীরে যে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়, ইহা বোধ হয়, ইহার ভক্তবৃন্দ মাত্রই অবগত আছেন। বহু দিবস পর্য্যন্ত তাম্রকূট ব্যবহার করিলে, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য এবং পোষণ ক্রিয়ার হ্রাস হয়। তন্নিবন্ধন শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং বহুবিধ স্নায়ুশূল উপস্থিত হয়। প্রথম প্রথমে তামাক অভ্যাস করিবার সময় বমন, বিবমিষা, অবসাদ এবং কাহারও মূর্চ্ছাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্যার আষ্টলি কুপর, ডাক্তার কোপলণ্ড, স্যার চার্লস বেল, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, তামাক মানবদেহের অতি অহিতকর পদার্থ।

একটী ৮ বৎসর বয়স্ক বালকের শিরোদেশে ক্ষত হওয়াতে কোন এক জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক উক্ত ক্ষত আরোগ্য করণাভিপ্রায়ে তাম্রকূটের রস প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিন ঘণ্টাকাল অতীত না হইতে হইতেই উক্ত বালক করাল কাল ভবনে প্রেরিত হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন মলদ্বারে তাম্রকূটের পিচকারী দেওয়াতেও অনেকের মৃত্যু হই-

য়াছে। যখন ইউরোপীয়েরা তাম্রকূটের ধূমপান প্রথম প্রথম অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা বলিতেন যে, তাম্রকূটের ধূম সেবন করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি নিবারিত হয়। শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন পরিশ্রম অন্তে, যদি ইহার ধূম সেবন করা যায়, তাহা হইলে উক্ত উভয় বিধ শ্রমজাত ক্লেশ দূরীভূত হইয়া মন পুনরায় হর্ষোৎফুল্ল হয়। তাঁহারা আরও কহিতেন যে, দয়াময় ঈশ্বর আমাদের ঐহিক সুখের নিমিত্ত এই মহারত্ন অবনীতে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

কতিপয় প্রসিদ্ধ এম, ডি, ডাক্তারের মতে মানব দেহে যত প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হয় তাহা সমস্তই এক মাত্র তাম্রকূটের ধূমপান দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে। ডাক্তার এড্‌মণ্ড গার্ডিনা নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-কৃত "ট্রায়েল অব টোবাকু" নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, তামাক প্রায় সমস্ত পীড়ার ব্যবস্থা পত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তামক প্রথম প্রথম শ্বেতকায়দিগের যখন অভ্যাস হইতে আরম্ভ হয়, তখন ইউরোপীয় ভিষক্‌গণ ইহাকে দুরূহ পীড়ার ব্যবস্থা পত্রে সন্নিবেশিত করিতেন। তাঁহারা আরও কহিতেন, দয়াময় ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই সর্ব্বরোগ সংহারক মহৌষধ ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন। এমন কি ব্রিটনের একখানি নাটকে লিখিত আছে যে, প্যাণ্ডরা নাম্নী অনুপম রূপ-লাবণ্য সম্পন্না একজন ষোড়শী যুবতী, স্বীয় উপপতিতে কঠিন প্রহার করায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল বলিয়া উক্ত নিরীহ মহিলা চৈতন্য ও আরোগ্য করণাভি-প্রায়ে একজন দাসকে তাম্রকূটের গাছ আনিতে পাঠাইয়া ছিলেন।

হেনরি বট্‌স সাহেব ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। বট্‌স ঐ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তামাকের অত্যন্ত পরিপাক শক্তি আছে। ফল, মৎস্য, মাংস, শস্য ও মসলা প্রভৃতি সমস্তই ইহার দ্বারা পরিপাক হয়। ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় কতিপয় বিজ্ঞব্যক্তি কহিয়া থাকে যে তাম্রকূট ব্যবহারে বুদ্ধিবৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। অপর কতিপয় পাণ্ডিত্যাভি-মানী ব্যক্তির মুখে শুনা যায় ইহার দ্বারা সে অপরের সম্ভাবনা নাই; বরং তাম্রকূট ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত হয়।

(ক্রমশঃ)

কৃষিসম্বন্ধে খনার বচন।

এদেশে লোক পরম্পরার কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সকল প্রবাদ খনার বচন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল বচন যে এক ব্যক্তির দ্বারা বিরচিত হইয়াছে তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষিসম্বন্ধে খনার যে সকল বচন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তদ্‌সমুদায়ে জ্ঞানলাভ করিলে চাষের কাজে বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। লোকে দীর্ঘকাল কৃষিকার্য্য করিলে যে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এই বচন দ্বারা জ্ঞান অতি সহজে লাভ হইতে পারে। খনা যে কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার বচন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কৃষিকার্য্যের পক্ষে খনার বচনগুলি বিশেষ উপ-কারী এজন্য নিম্নে তাহা সংগৃহীত হইল।

মূলার ভুঁই তুলা,
কুশারের ভুঁই ধূলা।

মূলার ভূমি তুলার মত ও কুশারের অর্থাৎ ইক্ষুর ভূমি ধূলা অর্থাৎ সুন্দররূপ চাষ করিতে হইবে। ভূমি সুচারুরূপে কর্ষিত না হইলে ফসল ভাল হইবে না।

শ্রাবণের বার, ভাদ্রের তের,
এর মধ্যে যত পার।

শ্রাবণের ১২ তারিখ হইতে ভাদ্রের ১৩ তারিখ পর্য্যন্ত ধান্য রোপণের সময়।

চাঁদের সভার মধ্যে তারা,
বর্ষে পানী মুষল ধারা।

চান্দ্রের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার যে ছায়া পতিত হয়, তাহার মধ্যে তারা থাকিলে মুষলধারে বৃষ্টি হইবে।

চৈতে কুয়া বৈশাখে শীত,
বর্ষা হয় কদাচিত।

যে বৎসর চৈত্র মাসে কুয়াসা ও বৈশাখ মাসে শীত হয়, সে বৎসর সামান্যরূপ বর্ষা হইয়া থাকে।

শয়ে শুকা আশীতে বান,
নই ছিয়া নই ধানেই ধান।
যদি হয় শ্রাবণে বৃষ্টি,
তবে হয় ধানের সৃষ্টি।

আশ্বিন মাসে রুইলে সীম।
পালা যোগাতে নারেন ভীম॥

আশ্বিন মাসে শিম বীজ বপন করিলে শিমলতা এত পল্লবিত হয় যে ভীমের ন্যায় পুরুষ পালা ও ডালাদি দিয়া সম্যক মাচা করিতে পারেন না।

পচুই মেঘে মূষল বরে
পূবে মেঘে হয় বাত।
কোদালে মেঘে পুকুর ভরে
ঘুচে যায় তাত॥

পশ্চিম দিকে মেঘ হইলে অত্যন্ত বৃষ্টি বর্ষে, পূর্ব্বে হইলে শুদ্ধ বায়ু ও ঝড় বহে। আকাশে কষিত ভূমির ন্যায় মেঘ হইলে সে বৎসর উত্তম বৃষ্টি হয় ও তাত ঘুচিয়া যায়।

কলা ওপড়ায় ফুল ছাঁটে
কুল সজনার ডাল কাটে।
তবে গৃহস্থের সুসার ঘটে।

বৎসর বৎসর কলাগাছের মূলের তেউড় অর্থাৎ চারা এবং পুরাতন গাছের মূল তুলিয়া দিতে হয়। ফুলগাছ সকল ছাটিয়া এবং কুল ও সজনা গাছাদির ডাল কাটিয়া দিতে হয়। গাছাদি সম্বন্ধে এই নিয়মটী অত্যন্ত উপকারী। কারণ অনেক গাছের এরূপ স্বভাব যে বৎসরান্তে

ডাল পালা কাটিয়া না দিলে নূতন শাখা না হইলে ফুল ও ফলের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। গাছের ডাল কাটিয়া দিলে সেই কর্ত্তিত স্থান হইতে নূতন নূতন শাখা উৎপন্ন হইয়া গৃহস্থের সুসার করিয়া দেয় অর্থাৎ ফুল ও ফলাদি প্রচুর জন্মে।

যদি বরে আগণে, রাজা যান মাগনে।
যদি বরে পৌষে, কড়ি হয় তুষে।
যদি বরে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্যদেশ,
যদি বরে ফাগুনে, চিনা কাউন দ্বিগুণে।

বর্ষে, অগ্রহায়েণ, ফালগুনে ইত্যাদি শব্দ গুলির স্থানে বরে, আগণে ফালগুনে শব্দগলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

অগ্রহায়ণে মাসে বৃষ্টিপাত হইলে সেই বর্ষণে ধান্যে পোকা জন্মিয়া তাহা কাটিয়া ফেলে, এই কারণেই প্রজালোক বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া রাজকর প্রদানে অশক্ত হয়, সুতরাং রাজাও বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আর যদি পৌষ মাসে বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে হৈমন্তিক পক্ক ধান্য সকল ঝরিয়া পড়িয়া যায় এবং তজ্জন্য সেই বর্ষণে ধান্য মহার্ঘ হইয়া উঠে।

মাঘ মাসের শেষ অবস্থায় বৃষ্টি হইলে সেই বর্ষণে প্রচুর পরিমাণে রবি শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফাল্‌গুন মাসের বৃষ্টি দ্বারা চিনা এবং কাউন দ্বিগুণ পরিমাণে ফলিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের গুণাবলী।

কৃষিজাত দ্রব্য সমূহ আমাদের খাদ্য প্রভৃতি নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা আমরা নিত্য ব্যবহার করিতেছি, যাহা দ্বারা আমাদের শারীরিক মানসিক উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে, যাহার সহিত আমাদের অতি নিকটতর সম্বন্ধ সেই কৃষিজাত দ্রব্যাদির গুণ সমূহ অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কৃষিজাত দ্রব্যের গুণাবলী প্রকাশ করা কৃষি-তত্ত্বের একটী প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রাচীনকালে আর্য্যেরা এই গুণ নির্ণয়ে যেরূপ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে

দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্য ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির গুণ নির্ণয়ে তাঁহারা যেরূপ বিচক্ষণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আর কোন জাতি দ্বারা সেরূপ হয় নাই। সাধারণের গোচরার্থে আমরা তদ্ সমুদায় সংগ্রহ করিয়া কৃষিতত্ত্বে প্রকাশ করিব।

বেগুণ—হিন্দু শাস্ত্রমতে ত্রয়োদশী তিথিতে ভক্ষণ নিষেধ। ইহার গুণ অগ্নিকারক, বায়ুনাশক, শুক্র ও রক্ত বৃদ্ধিকারক, হৃল্লাসকোশ, এবং অরুচি নষ্ট-কারক। কোমল বার্ত্তাকু কফ, বায়ু নষ্ট করিয়া থাকে। পক্ক বেগুণ ক্ষারযুক্ত এবং পিত্ত বৃদ্ধিকারী। কচি ও পাকা বেগুণ ভিন্ন মধ্যমাবস্থার বেগুণে ত্রিদোষ নষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু রক্তপিত্ত বৃদ্ধিকারী দোষ বর্ত্তমান থাকে। অগ্নিদগ্ধ বেগুণে কিঞ্চিৎ পিত্ত বৃদ্ধি করে ও কফ মেধ, বায়ু হরণ করিয়া থাকে এবং লঘুপাকও কোষ্ঠ শুদ্ধি রাখে। (১)

কুষ্মাণ্ড—সাধারণতঃ পিত্ত নষ্ট করিয়া থাকে। নবীন কুষ্মাণ্ড কফ নষ্ট করে। পক্ক কুষ্মাণ্ডে ক্ষার থাকে এবং অগ্নি বৃদ্ধিকারী ও রক্ত পিত্ত রোগনাশক। (২)

আলাবু—গুরু পাক, ভেদী, পিত্তনাশক, কফ বৃদ্ধিকারক এবং শীতল। তিক্ত লাউ কৃমি, কফ ও পিত্ত নষ্ট করিয়া থাকে এবং লঘুপাক। (৩)

ঝিঙ্গা—তিক্ত ও মধুর রসবিশিষ্ট ও আমবাতজনক এবং অগ্নিমান্দ্যকর। (৪)　　(ক্রমশঃ)

অগ্নিপ্রদানারুতনাশিনী চ শুক্রপ্রদা শোণিতবর্দ্ধিনী চ।
হৃল্লাস কাসারুচিনাশিনী চ বার্ত্তাকুরেষা গুণসপ্তযুক্তা॥
সা বালা কফবাতঘ্নী পক্কাসক্ষার পিত্তলা সদাফলা।
ত্রিদোষঘ্নী রক্তপিত্তপ্রসাদনী॥
অঙ্গারপক্কাবার্ত্তাকুঃ কিঞ্চিৎ পিত্তকরীমতা।
কফ মেদোঽনিলহরা লঘুস্থিরতরাপরা॥ (১)

কুষ্মাণ্ডকং পিত্তহরং বালং মধ্যং কফহরং পরং পক্কলঘুষ্ণ চ সক্ষারদীপনং বস্তি শোধং। (২)

অলাবুর্ভেদিনী গুর্ব্বী পিত্তঘ্নী কফদাহিমা পাণ্ডার কৃমিশ্লেষ্মপিত্ত জিত্তিক্তলঘুঃ। (৩)

ঝিঞ্জাকং তিক্তং মধুরং আমবাতাগ্নিমান্দ্যকৃৎ। (৪)

রোটাবাগা।

(RUTA BAGA)

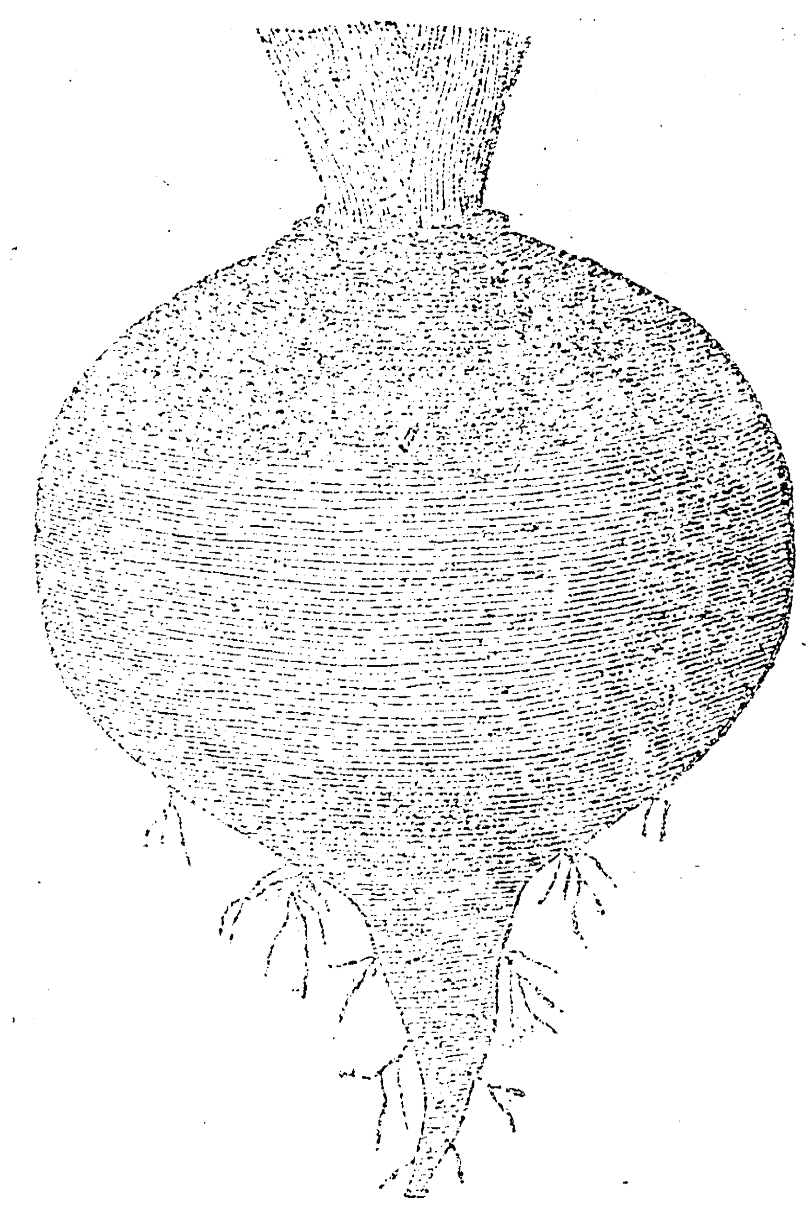

রোটাবাগা ইহা এক প্রকার শালগাম। শালগাম প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; এই দুই ভাগের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। যত প্রকার শালগাম আছে সমুদায়ই খাদ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। শালগাম দ্বারা উত্তমরূপ তরকারী প্রস্তুত হয়। এজন্য কএক বৎসর হইল ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উহার বীজ আনীত হইয়া এদেশে চাষ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে কেহই উহার ব্যবহার পর্য্যন্তও জানিত না। সাহেবেরা উহা এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে বৎসর বৎসর এদেশে যে রূপ শালগামের আদর বৃদ্ধি হইতেছে, কালে যে সর্ব্বত্রই উহার চাষ হইতে আরম্ভ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে শালগাম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে রোটাবাগা একটী অতি সুখাদ্য শালগাম। এই চিত্রে রোটা-

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বাগার আকার ও গঠন প্রদর্শিত হইল। শালগাম মূল প্রধান তরকারী, উহা
মাটির মধ্যে জন্মে, উহার ছোট ছোট গাছ হইয়া থাকে সচরাচর গাছগুলি
প্রায় এক হাত বড় হইতে দেখা যায়। সকল শ্রেণীর শালগামের আকার ও
আস্বাদন একরূপ নহে, আকার ও আস্বাদনের উৎকৃষ্টতানুসারে শালগামের
মূল্য হইয়া থাকে। শালগাম মাত্রেরই গঠন প্রায় দেখিতে এক প্রকার।
শালগামের মধ্যে কতক গুলির পাতা অসমান এবং কতকগুলি দেখিতে
চৌরস হইয়া থাকে। পাতার রঙ একরূপ নহে, ঈষৎ লাল, সাদা প্রভৃতি
নানা বর্ণের পাতা দেখা যায়।

শালগাম অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার চাষে লাভ মন্দ নহে। এদেশে
ভাদ্রের শেষ হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে শালগাম বুনিলে ভাল হয়। চাষ
করিতে বিলম্ব হইলে ফসল বিলম্বে প্রস্তুত হয়। যে কোন ফসল আগে তৈয়ার
করিতে না পারিলে লাভ করা যায় না। দেরিতে উৎপন্ন করিলে কেবল
যে মূল্য অধিক হয় না এরূপ নহে, সময় অতীত হইলে উহার আস্বাদন
খারাপ হইয়া যায়। মনে কর শীতকালের কপি যেমন সুখাদ্য চৈত্র বৈশাখ
মাসের কপি সেরূপ সুখাদ্য হয় না। গ্রীষ্ম অধিক হইলে এবং প্রবল রৌদ্রে
পাতা শক্ত হইয়া যায়, অধিক জাল না দিলে ভালরূপ সিদ্ধ হয় না এবং
পোকা লাগিয়া ও অন্যান্য নানা কারণে তাহার গুণেরও পরিবর্ত্তন হইয়া
থাকে। এজন্য যে কোন ফসল হউক সময় বুঝিয়া চাষ করা উচিত। সময়
বুঝিয়া চাষ করা যেমন আবশ্যক, সেই রূপ আবার ঠিক অবস্থা বুঝিয়া
তাহা ব্যবহার করিতে হয়। শালগাম অধিক দিন মাটির মধ্যে থাকিলে
মূল শক্ত হইয়া যায়, তখন উহা খাইতে ভাল লাগে না।

রোটাবাগা বা যে কোন জাতীয় শালগাম দোআঁশলা মাটিতে ভাল
হয়। মূলা প্রধান গাছ মাত্রেই অর্থাৎ যে সকল গাছের মূল ব্যবহার করিতে
হয় তাহাদিগের পক্ষে হালকা মাটিই উত্তম। মাটি যে পরিমাণে হালকা
হইবে, মূলও সেই পরিমাণে বাড়িয়া থাকে। এজন্য অগ্রে ভাল রকম করিয়া
মাটির পাইট করিতে হয়। সাধারন শালগাম চাষের যে নিয়ম কৃষিতত্ত্বের
ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে,রোটাবাগা চাষ সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম।
রোটাবাগার বীজ প্রথমতঃ চৌকায় বপন করিয়া রাখিয়া ক্ষেতে সার দেওয়া

চারা তৈয়ার করিলে কিম্বা ক্ষেতে বীজ ছড়াইয়া চাষ করিলে চলিতে পারে।
চৌকায় চারা সকল তিন চারিটী পাতা ধরিলে তখন তাহা তুলিয়া ক্ষেতে
রোপণ করিলে ভাল হয়। চারা অধিক ঘন করিয়া না পুঁতিয়া আন্দাজ
আট আঙুল ফাক ফাক করিয়া রোপণ করা উচিত। গাছ ঘন হইলে মূল
বাড়িতে পারে না। মূল যত বড় হয় ততই ভাল। রোটাবাগার যে ছবি
দেখান হইল, মাটির মধ্যে ঐরূপ মূল হইয়া থাকে। হালকা মাটিতে চাষ
করিবার কথা পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই মাটি হালকা অর্থাৎ
ঝুরা হইলে উক্ত মূল গা মেলিয়া বাড়িতে পারে। কঠিন মাটিতে চাষ
করিলে চারিদিকের মাটি এরূপ ভাবে আঁটিয়া ধরে যে ঐ মূল উপযুক্ত
আকারে বাড়িয়া উঠিতে পারে না। এজন্য ক্ষেতে চারা লাগান হইতে
সর্ব্বদা পাইট ও গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। যে কোন চাষ যে পাইটের উপর
অধিক নির্ভর করে, তাহা কৃষক মাত্রেরই জানা আবশ্যক।

পাইটের দোষে অনেক সময় ফসল ভাল হয় না। সন্তান প্রতিপালন
করিতে পিতা মাতার যেমন যত্নের ক্রটি হইলে সন্তানের নানা প্রকার রোগ
হইয়া থাকে এবং তাহাদের শারীরিক উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে সেইরূপ
চাষী ব্যক্তিদিগের চাষ আবাদে ও গাছ পালার প্রতি অযত্ন হইলে ফসলা-
দিও ভাল হয় না, নানা কারণে ফসলের অবস্থা মন্দ হইয়া থাকে। এজন্য
চাষী ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত সর্ব্বদা ক্ষেত তদারক করা। রোটাবাগা চাষে
বিশেষ কোনরূপ পাইট করিতে হয় না। তবে সাধারণ চাষ আবাদ সম্বন্ধে
যেমন ক্ষেতে সার দেওয়া, ঘাস মুথা প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, মাটির অবস্থা
বুঝিয়া জল দেওয়ার যে সকল ব্যবস্থা আছে, ইহার আবাদেও সেই সকল
নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

এদেশে যে কএক জাতীয় শালগামের চাষ হইয়া থাকে, চাষীরা তদ্-
সমুদায়ের পৃথক পৃথক নাম জানে না। তাহারা এক সঙ্গে সকল রকমের
শালগামের চাষ করিয়া থাকে, সুতরাং ফসল প্রস্তুত হইলে মূলের ছোট বড়
আকার দেখিলে মনে মনে স্থির করিয়া রাখে বীজের দোষে ঐরূপ হইয়াছে।
বীজের দোষে যে ফসলের অবস্থা মন্দ হইয়া থাকে, তাহা যথার্থ বটে কিন্তু
তাই বলিয়া পাইটের পক্ষে অযত্ন করা উচিত নহে। আমরা বিশেষ পরীক্ষা

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

করিয়া দেখিয়াছি পাইটের গুণে মন্দ বীজ হইতেও উত্তমরূপ ফসল হইয়াছে। রোটাবাগা চাষ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইল তদসমুদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চাষ করা উচিত। কোন্ কোন্ জাতীয় শালগামের কিরূপ আকার তাহা জানা থাকিলে ফসল দেখিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় ঠিক বীজের অনুরূপ ফসল হইয়াছে কি না। কারণ যাহাদিগের স্বাভাবিক আকার ছোট তাহারা কখন বৃহৎজাতীয় শালগামের সমতুল্য হইতে পারে না। ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় এদেশেও উৎকৃষ্ট রকম শালগাম হইয়া থাকে। ভাল ভাল জাতীয় শালগামের বীজ প্রতি বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়া থাকে। এদেশে বীজ ধরিলেও সেই বীজে শালগাম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তাহা বিদেশীয় বীজের তুল্য উৎকৃষ্ট নহে। দেশীয় বীজের মধ্যে পাটনাই বীজ অনেকটা ভাল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, অন্যান্য জাতীয় শালগামের চাষ যে প্রণালীতে করিতে হয়, রোটাবাগা চাষেও ঠিক সেইরূপ নিয়ম। সুতরাং রোটাবাগা চাষ সম্বন্ধে এস্থলে অধিক লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

শাকসবজীর আকার বড় করিবার উপায়।

শাকসবজী প্রভৃতি চাষাদির উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে ভূমির অবস্থা ভাল করিতে হয়। যে পরিমাণে ভূমির পাইট করিতে পারা যায়, শাকসবজীর আকারও যে সেই পরিমাণে উত্তম হইয়া থাকে, তাহা চাষী মাত্রেই বিশেষরূপ অবগত আছে। একটু যত্নের সহিত চাষ আবাদ না করিলে কোন ক্রমেই তাহার উন্নতি হইতে পারে না এজন্য যে কোন চাষে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অগ্রে চাষ ও সারাদি দিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়। উর্ব্বরা ক্ষেত্র ভিন্ন কোন ক্রমেই শাকসবজীর আকার বড় হয় না। সচরাচর যে সকল শাক সবজী হইয়া থাকে, তদসমুদায়ের আকার তত বড় হইতে দেখা যায় না। এজন্য একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত চাষ আবাদ করিতে হয়, আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ক্ষেত্রে অন্ততঃ আড়াই আঙুল

পুরু করিয়া সার দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকের পক্ষে এরূপ নিয়মে সার দেওয়া ব্যয় সাধ্য এজন্য চাষীরা প্রায়ই ততটা সার দিয়া শাকসবজীর আবাদ করে না। ঐরূপ নিয়মে সার দেওয়ার একটী বিশেষ গুণ এই যে একবার সার দিলে আবার দুই তিন বৎসর ক্ষেত্রে সার না দিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

শাকসবজীর আকার বড় করাই চাষীর প্রধান গুণপণা। কারণ উহাদিগের আকার যে পরিমাণে বড় হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে মূল্যাদিও অধিক হইতে দেখা যায়। চাষের যে কএকটী অঙ্গ তাহার প্রত্যেক বিষয়েরই প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ না দিলে কোন ক্রমেই উন্নতি হইতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজ চাষ করিয়াও শাকসবজীর আকার ছোট হইয়া থাকে। অতএব কেবল মাত্র ক্ষেত্রে সার দিলে আশানুরূপ ফল লাভ হইবার পক্ষে সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে না। ভালভাল জাতীয় বীজ সংগ্রহ করিয়া চাষ করা, ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া এবং যো অর্থাৎ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পাইট করা, এই গুলিই চাষের প্রধান অঙ্গ। কৃষকের উচিত এই কয়েকটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আবাদ করেন।

শাকসবজীর চাষে ভূমি অধিক গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়। এমন কি ক্ষেত্র অন্ততঃ আট নয় আঙুল পরিমাণ গভীর করিয়া খনন করিলে শাকসবজীর পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইয়া থাকে। ভূমি কর্ষণ বা খনন অল্প হইলে গাছপালা উপযুক্ত পরিমাণে বাড়িতে পারে না। গাছপালা ভাল রকম না বাড়িতে পাইলে তাহাদের আকার যে ছোট হইয়া থাকে, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। গাছের মূল যতই বিস্তারিত হইতে পারে ততই তাহাদিগের পক্ষে উপকারী। এদেশে ভূমি খনন সম্বন্ধে অনেকেরই তাচ্ছিল্য ভাব দেখা গিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় ক্ষেত্র আট আঙুল পরিমাণ গভীর করিয়া খনন করত তিন বা সাড়ে তিন হাত চৌড়া ও ইচ্ছানুরূপ দৈর্ঘ ভূমি খণ্ডের উভয় পার্শ্ব হইতে খুঁড় মাটি তাহার উপর তুলিয়া ভূমি অপেক্ষা আট দশ আঙুল উচ্চ চৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পাশের মাটি তুলিয়া দিলে প্রত্যেক চৌকার পাশে জুলির ন্যায় হইবে। ঐ জুলির গভীরতা আট আঙুল এবং চৌড়া অন্ততঃ চার আঙুল হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্তরূপ চৌকা তৈয়ার হইলে, তাহার উপর বীজ বা চারা পুতিতে হইবে। যখন ক্ষেতে জল দেওয়ার আবশ্যক হইবে, তখন ঐ সকল জুলি জল পূর্ণ করিয়া দিলেই চৌকার মাটি সরস থাকিতে পারে। প্রতিদিন এই নিয়মে জল দেওয়া উচিত নহে। মাটির অবস্থা বুঝিয়া জল দেওয়ার নিয়ম করিলে চলিতে পারে। বোমা কিম্বা অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা গাছে অল্প অল্প পরিমাণে জল দিলে উহা সতেজ হইয়া উঠে। ক্ষেত্রস্থ জুলি সমূহ জল পূর্ণ থাকিলে, তদ্দ্বারা গাছের শিকড় সরস থাকে বটে, কিন্তু সাবধান হইবে যেন অধিক জল থাকিতে না পারে, কারণ শিকড়ে সর্ব্বদা জল সঞ্চিত হইলে কিম্বা শিকড় ভিজা মাটিতে থাকিলে উহা পচিয়া নষ্ট হইবার সম্ভব।

কপি, এওয়ামূলা প্রভৃতি শাকসবজীর চারা ঘন ঘন হইলে, পাতলা করিয়া দিতে হইবে। চৌকার উপর চারি পাঁচ হাত উচ্চ করিয়া মাচা প্রস্তুত করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্র কিম্বা অত্যন্ত বর্ষার সময় মাদুর অথবা দরমা দ্বারা মাচা ঢাকিয়া দিতে হইবে। অপর অত্যন্ত রৌদ্র ও বৃষ্টির পর মাটির আচ্ছাদন খুলিয়া দিলে গাছের আকার অনেকটা বড় হইয়া থাকে।

শাকসবজী প্রভৃতির আকার বড় হইলে কেবল যে মূল্য অধিক হইয়া থাকে, তাহা নহে উহার বৃহৎ আকার দেখিলেও মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মিয়া থাকে। উপযুক্ত নিয়মে চাষ করিলে যে কোন উদ্ভিজ্জ সমূহের ফল, মূল, কাণ্ড প্রভৃতির আকার নিশ্চয়ই বৃহৎ হইয়া থাকে। এদেশের জল বায়ুর যেরূপ শক্তি তাহাতে প্রায় পৃথিবীর সকল স্থানেরই শাকসবজী উৎপন্ন হইতে পারে। দোয়াঁশ হলকা মাটিতেই শাকসবজী উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই একরূপ বীজ রোপণ করিয়া কেহ কেহ বৃহৎ আকার বিশিষ্ট শাকসবজী উৎপাদন করিয়া থাকেন, এবং অপরে আবার সেই বীজের আবাদে ফসল ভাল করিতে সমর্থ হয়েন না।

অনেকে শাকসবজীর আকার বড় করিবার মানসে ক্ষেতে অধিক সার দিয়া থাকেন। সারের ভাগ অধিক হইলে যে ফসল ভাল হয় তাহা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি যে, আবশ্যকের অতিরিক্ত সারে শাকসবজীর আকার বড় হওয়া দূরে থাকুক বরং ফসলের পক্ষে অনিষ্ট হইয়া থাকে। ভূমির অবস্থা ও যে দ্রব্য চাষ করা হইবে এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি

উচিত। জমির সার উদ্ভিদাদির এক প্রকার খাদ্য বিশেষ, কোন্ উদ্ভিদের পক্ষে কোন্ প্রকার সার সেই খাদ্যের কাজ করিতে পারে তাহা জানা না থাকিলে হাজার সার দিলেও কোন ফল হইবে না। মনে কর যে সকল খাদ্য দ্বারা আমাদের দেহের কোন উপকার হয় না এরূপ দ্রব্য যদি আমরা আহার করি, তবে তদ্দ্বারা কোন উপকারই হইবে না, সেইরূপ যে সার শাকসবজীর দেহ পোষণ করিতে অসমর্থ এরূপ সার দিয়া চাষ করিলে কিছুই উপকার হয় না। অধিকন্তু বৃথা সার দেওয়ার জন্য অনর্থক ব্যয় এবং ফসল ভালরূপ না হওয়াতে আয়েরও ব্যাঘাত হইয়া থাকে। এজন্য সার সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা চাষের একটী প্রধান কার্য্য।

অনেক চাষী অধিক লাভের আশায় ক্ষেতে ঘন ঘন করিয়া শাকসবজী আবাদ করিয়া থাকে, গাছ ঘন হইলে তাহার আকার কখনই বড় হয় না। পাতলা করিয়া বুনিলে যদিও ফসলের পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে। কিন্তু গাছের চারিদিকে ফাক থাকাতে এবং ক্ষেত হইতে আবশ্যক মত সার পাওয়াতে সেই পাতলা গাছ এরূপ বড় আকারের হইয়া থাকে যে তাহার এক একটী গাছ দ্বারা ঘন বুনানির পাঁচটী গাছের সমান লাভ হইতে দেখা যায়। গাছ অধিক হইলেই যে অধিক লাভ হয় তাহা নহে, ফসল অনুসারে লাভালাভ হইয়া থাকে।

শাকসবজীর আকার বড় করিতে হইলে বড় বড় জাতীয় গাছের বীজ বুনিতে হয় কারণ বীজই সমুদায়ের মূল, বীজ যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইবে তদুৎপন্ন শাকসবজীও সেই পরিমাণে বৃহৎ আকার বিশিষ্ট হইবে। বীজের দোষেও অনেক স্থলে ফসলের আকার ছোট হইতে দেখা যায়। এস্থলে চাষীদিগের আর একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বীজ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, কিন্তু সময় অতীত করিয়া চাষ করিলে ফসলের আকার প্রায়ই ছোট হইয়া থাকে। সময়ে আবাদ করিলে সেরূপ হয় না। এজন্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চাষ করা উচিত। এদেশে চাষীদিগের একটী মহৎ দোষ দেখা যায় যে, তাহারা কোন প্রকার ফসলের উন্নতি পক্ষে কোন প্রকার চেষ্টা করে না। এইরূপ চেষ্টার ত্রুটি বশতঃ এ দেশে শাকসবজীর আকার ক্রমেই ছোট হইয়া আসি-

PAGE CONTAINS TWO COLOUR

তেছে। অতএব শাকসবজীর আকার বড় করিবার পক্ষে যে সকল নিয়ম উল্লিখিত হইল, তদসমুদায়ের প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হরিদ্রা বা হলুদ।

"মিড়েনারা" (১) বা দোআশ বা "উলুটেবা" (২) জমী হলুদ আবাদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইরূপ জমীতে অতি উত্তম হলুদ জন্মিয়া থাকে। বর্ষার শেষ হইলে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের মধ্যে নির্ব্বাচিত জমী "কোদলাইয়া" (৩) রাখিতে হয়। সমস্ত শীতকাল ঐ কোদলান ভূমিকে হিম খাওয়াইয়া মাঘ মাসের শেষ বা ফাল্‌গুন মাসের প্রথমে জমীতে হালি কাটিয়া (৪) চাষচেলা মত বৃষ্টি হইলে লাঙ্গল দ্বারা দোয়ার(৫)বা তেয়ার(৬) চাষ দিয়া ২।৩ পালা (৭) মৈটা দিয়া জমী সমান ও পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসের মধ্যে সুবৃষ্টি হইলে শেরো (৮) যো (৯) বুঝিয়া হলুদ রোপণ করিতে হয়; হলুদ রোপণ প্রণালী নানা স্থানের

১। গ্রামের নিকটবর্ত্তী বহুকালীয় জঙ্গলবিশিষ্ট জমী পরিষ্কার করিয়া কোদলাইয়া আবাদযোগ্য করিলে সেই ভূমিকে দেশ বিশেষে মিড়েনারে কহে।

২। যে জমীতে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ উলুখড় পূর্ণ থাকে তাহাকে উলুটে জমী বলে।

৩। কোদাল দ্বারা কোপানী করাকে, কোদলাইয়া বলে।

৪। কোপান জমীতে পুনর্ব্বার ২।১ টী জঙ্গল হইলে তাহাকে পুনর্ব্বার কোপাইয়া ফেলার নাম হালিকাটা বলে।

৫। দুইবার চাষ দেওয়ার নাম দোয়ার।

৬। ঐরূপ তিনবার চাষ দেওয়াকে তেয়ার কহে।

৭। চাষের জমীতে মৈ দিবার প্রতি একবারকে পালা বলিয়া থাকে।

৮। প্রথমকে শেরো শব্দে ব্যবহার করে।

৯। সময়কে যো বলিয়া থাকে।

নানা মত দেখা গিয়াছে কিন্তু আবাদের প্রণালীগত বৈষম্য দোষে ফলনের তারতম্য হইয়া থাকে। এস্থলে হলুদ রোপণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী লিখিত হইতেছে।

প্রথমে ঐরূপ পাইটের (১০) জমীতে কোদাল দ্বারা সারি করিয়া পা (১১) অন্তর খুপি (১২) কাটিয়া ও প্রত্যেক খুপিতে এক এক খানি হলুদ-মোতা অর্থাৎ বীজ ফেলিয়া যাইবে এবং উভয় সারির মধ্য হইতে এক এক কোদাল করিয়া মাটি ঐ খুপিস্থ বীজের উপর চাপা দিতে হইবে। এমন ভাবে বীজ মাটির দ্বারা ঢাকিতে হইবে যেন ৩।৪ আঙুল মাটির নীচে বীজ পোঁতা পড়ে। আর ইহাও দৃষ্টি রাখিতে হইবে উভয় সারি যেন পাকা এক এক হাত অন্তর হয়।

চুমো, আদাগিটে, বন্নার বাটী, পাঁকালে ও কাজলী প্রভৃতি অনেক জাতীয় হলুদ আছে, ইহার মধ্যে শেষোক্ত তিন জাতীয় হলুদের ফলন অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, রঙেও বড় উত্তম হয়। হলুদ রোপণের সঙ্গে সঙ্গেই হলুদ রোপিত ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বেড়া বান্ধিয়া দিতে হইবে, কোন মতে যেন গো মহিষাদি পশু সকল হলুদ ক্ষেতে প্রবেশ করিতে না পায়। রোপণের ১২।১৪ দিন পরেই জমিতে একটী দুইটী করিয়া অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইতে আরম্ভ হয়, ক্রমে ক্রমে মাসের মধ্যেই প্রায় তাবৎ রোপিত মোতা অঙ্কুরিত হইয়া ভূমির একরূপ শোভা করে। হলুদ গাছ গুলি একটু পুষ্টল হইলে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যে রুক্ষো (১৩) যোয়ে নিড়ানি করিয়া ও দাঁড়া বান্ধিয়া দিতে হয়। গাছ সকল ক্রমেই তেজাল হইতে থাকিবে। বর্ষার প্রবলতায় যদি ঘাস খড় বেশী হয় তবে আর একবার নিড়াইয়া দিলেই হলুদ আবাদের কারকিত (১৪) হইয়া গেল।

১০। পাইট সময় মত জমীর কর্ত্তব্যতাসাধন।

১১। পায়ের গুড়ালী হইতে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্য্যন্ত পরিমাণকে পা কহে।

১২। কোদাল দ্বারা ৪।৫ অঙ্গুল করিয়া গর্ত্ত করাকে খুপি বলে।

১৩। বৃষ্টি না হইয়া তীক্ষ্ণ ও মধ্যে মধ্যে ছায়া হওয়াকে রুক্ষো কহে।

১৪। আবাদ শেষ হওয়াকে কারকিত বলে।

কার্ত্তিক মাস গত হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, হলুদ গাছ দুই একটী করিয়া শুষ্ক হইতেছে। এই সময়ে সমস্ত ক্ষেতের শুষ্ক প্রায় পত্র গুলিকে কাস্তে দ্বারা গোড়া ঘুসিয়া কাটিয়া আটি বান্ধিয়া যেখানে হলুদ শুট করিবার খোলা (১৫) প্রস্তুত হইবে সেই স্থানে কর্ত্তিত পত্র আঁটি গুলিকে সংগ্রহ করিতে হইবে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত হলুদ তুলিয়া সিদ্ধ ও শুষ্ক করা নিতান্ত প্রয়োজন নচেৎ হলুদের ফলনের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে।

হলুদ তুলিবার সময় প্রথমে এইটী অনুমান করা চাই, ক্ষেতের দাঁড়া বান্ধা দক্ষিণ উত্তর কি পূর্ব্ব পশ্চিম হইয়াছে; যদি দক্ষিণোত্তর হইয়া থাকে তবে পূর্ব্ব বা পশ্চিমাভিমুখে যদি পূর্ব্ব পশ্চিম হইয়া থাকে তাহা হইলে দক্ষিণোত্তরাভিমুখে দাঁড়াইয়া কোদাল দ্বারা উভয় - দাঁড়ার মধ্য হইতে কোপ ধরিয়া তুলিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই মোতা, মুখী ও পচা হলুদ পৃথক পৃথক করিয়া যাইবে, অর্থাৎ মোতার যাবতীয় মোতায়, মুখির যাবতীয় মুখিতে এবং পচার যাবতীয় পচায় এইরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বাছিয়া লইলেই হলুদ তোলা শেষ হইয়া গেল। বীজ বেশী রাখিতে হইলে ২।৪ খানি করিয়া শির-মুখী ও মোতা গুলিকে একটী ছায়াযুক্ত স্থানে রাশি দিয়া পাতা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলেই আগামী বৎসরের নিমিত্ত বীজ রাখা হইল। পচা গুলিকে জলে ধৌত করিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই পচা হলুদ প্রস্তুত হইল, এই হলুদ রন্ধন কার্য্যে অতি আদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখন মুখী গুলিকে সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিতে পারিলেই হলুদ শুট হইয়া গেল। যেখানে খোলা প্রস্তুত হইয়াছে সেই স্থানে নির্ব্বাচিত মুখী গুলিকে ক্রমে সংগ্রহ করিতে হইবে। গুড়ে (১৬) বানের মত খোলার এক প্রান্তে সারি করিয়া আকা কাটিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক হলুদ পত্রের আটি

১৫। শস্য প্রস্তুত করিবার নির্দ্দিষ্ট স্থানকে খোলা কহে।

১৬। খেজুর রস বা ইক্ষুর রস জ্বাল দিবার জন্য যে আকা বা উনন তাহাকে বান বলে।

গুলিকে আকার এক পাশে সংগ্রহ করিতে হইবে। পাড়ার ছুতোহাঁড়ী কুড়াইয়া মুখী হলুদের রাশির নিকট রাখিতে হইবে। আকার অনতিদূরে তিনটী খুঁটা ভূমিতল হইতে দুই হাত উচ্চ করিয়া উহার উপর একটী ঝুড়ী বসাইবার মত করিয়া দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতে হইবে। প্রোথিত তিনটী খুঁটীর মধ্য স্থলে অর্থাৎ খুঁটার উপরিস্থিত ঝুড়ীর নীচে একটী মধ্যমাকারের গামলা পাতিয়াএকটী ঝুড়ী ঐ খুটার উপর বসাইতে হইবে। ছুতো হাঁড়ির পরিমাণ করিয়া হলুদ পূর্ণ করত হলুদ গুলি ডুবিতে পারে এমত করিয়া জল দিয়া শ্রেণীবদ্ধ আকার উপরিভাগে সারি সারি করিয়া হলুদপূর্ণ হাঁড়ি চড়াইয়া দিতে হইবে। অনন্তর সেই শুষ্ক হলুদ পত্র দ্বারা সমানভাবে জ্বাল দিতে আরম্ভ করিতে হইবে। আকার উপরিস্থিত হাঁড়ি গুলি উথলিয়া উঠিবামাত্র পর পর বেড়ী দ্বারা ধরিয়া খুঁটার উপরিস্থত ঝুড়িতে ঢালিতে হইবে। হলুদ সিদ্ধ উষ্ণ জল ঝুড়ির নীচে দিয়া চোঁয়াইয়া নিম্নস্থিত গামলায় পড়িতে থাকিবে; হলুদ ঢালা শূন্য হাঁড়ি গুলি পূর্ব্ব মত হলুদ পূর্ণ করিয়া আকার উপর বসাইয়া ডৈ (১৭) দ্বারা গামলাস্থিত উষ্ণ জল হাঁড়িতে দিতে হইবে। খুঁটার উপরিস্থিত ঝুড়ী সিদ্ধ হলুদে পরিপূর্ণ হইলে খোলার একপ্রান্তে শ্রেণীপূর্ব্বক ঝুড়ি ঢালিয়া ফেলিবে ক্রমে ক্রমে সকল হলুদ এইরূপ করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে।

বোধ করি এই সকল ছুতো হাঁড়িতে হলুদ সিদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া আমাদের স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বচনটী বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়া থাকিবেন যথা "হরিদ্রা গোরসোধান্যঃ পুনঃ পাকেন শুদ্ধতি।" এক্ষণে সিদ্ধ হলুদ সকল, খোলায় প্রথমে পাত্‌লা করিয়া ছড়াইরা দিতে হইবে, ৪।৫ দিন ঐ অবস্থায় রাখিয়া একটু শুষ্ক মত হইলে একবারে উলটাই পালটাইয়া একটু পুরু করিয়া মেলিয়া দিবে; কিছু শুষ্ক হইলে হস্ত দ্বারা অল্প অল্প রগড়াইয়া বড় গুলি হইতে ছোট গুলিকে পৃথক পৃথক করিয়া মেলিয়া দিতে হইবে। ক্রমান্বয়ে রগড়ান ও কম বিস্তৃত করিয়া মেলিয়া দেওয়া হলুদ শুঠ করিবার

১৭। একটা ২।২॥ হাত বাঁশের আগাতে একটী ভাঁড় দৃঢ়রূপে সংলগ্ন ক যে দ্রব্য তাহাকে ডৈ কহে।

একটী প্রধান অঙ্গ; যত ডলামলা বেশী হইবে শুঠ হলুদও তত উৎকৃষ্ট হইবে; হলুদ শুষ্ক প্রায় হইলে তদ্‌সমুদায় এক স্থানে কাঁড়ি দিয়া ৫।৬ দিন রাখিয়া দেখিতে হইবে হলুদের গায়ে অল্প অল্প ছাতা ধরিয়াছে। তখন পুনর্ব্বার ঐ কাঁড়ি ভাঙ্গিয়া খোলায় খুব পাতলা করিয়া মেলিয়া দিবে, সম্পূর্ণ ভাবে শুষ্ক হইলে রগড়াইলেই হলুদ শুঠ হইয়া থাকে। ভাল রূপ আবাদ হইলে বিঘা প্রতি ২০ মণের কিছু বেশী হয়; সচরাচর ২০ মণ হইতে ন্যূন পরিমাণে হইলেও ১৫।১৬ মণ হইয়া থাকে। বৎসরের গতিকে দরেরও ইতর বিশেষ আছে। ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে হলুদ প্রায় বিক্রয় হয়। স্থান বিশেষের হলুদের দরের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; পাবনাই ও জগন্নাথপুরে হলুদ কলিকাতায় উচ্চদরে বিক্রীত হইয়া থাকে।

হলুদ আবাদের আয় ব্যয়ের প্রকৃত বিবরণ প্রদর্শিত হইতেছে। এই হলুদ চাষের বিবরণ নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী মেহেরপুর সবডিবিজনের মধ্যে মণিখালি কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদ্যালয় সংযুক্ত কৃষিক্ষেত্রে হলুদ আবাদ করিয়া যেরূপ আয় ব্যয় এবং লাভের হিসাব দেখাইয়াছেন পার্শ্ববর্ত্তী তালিকায় তাহাই দেখান যাইতেছে।

প্রকৃত আয় ব্যয়ের বিবরণ। বিঘা প্রতি।

ব্যয়

জমি কোদলান বাবদ ১৴০ বিঘার কাত	২॥০
ছালী কাটা বাবদ তুইটী মজুরের কাত ৴১০ হিঃ	৶০
লাঙ্গল ও মৈ দেওয়া বাবদ ৫ খান লাঙ্গলের কাত	১৲
হলুদ রোপণ বাবদ ১২ টা মজুরের কাত ৴১০ হিঃ	১৶০
বেড়া দেওয়া বাবদ ২২ টা মজুরের কাত ৴১০ হিঃ	২৴০
নিড়ানী ও দাঁড়া বান্ধাই বাবদ ১০ জন মজুরের কাত ৶০ হিঃ *	১।০
বাবদ দুনা নিড়ানী ৪ টা মজুরের কাত ৶০ হিঃ	॥০
পাতা কাটাই বাবদ ২ টা মজুরের কাত ৴১০ হিঃ	৴০
হলুদ তোলাই বাবদ ৬০ টা মজুরের কাত ৴১০ হিঃ	৭॥০
আকাকাটাই ও ছুতোহাড়ি কুড়ান বাবদ ২টা মজুরের কাত ৴১০ হিঃ	৴০
হলুদ সিদ্ধ করা বাবদ ৮ টা মজুরের কাত ৴১০ হিঃ	৸০
	১৭।০

ব্যয় জের—১৭।০	
শুষ্ক করা বাবদ— ১৫ টা মজুরের কাত ৴১০ হিঃ	১৸৶০
হলুদ বীজের মূল বাবদ ১০৴ মণের কাত ॥০ দরে	৫৲
জমীর মাল গুজারী বাবদ ২।০ হারে	২।০
	২৬।৶০

আয়

পচা শুষ্ক হলুদ বাবদ ১৴০ মণের কাত ১॥০ দরে	১॥০
বীজ বা মোতা হলুদ ১৬ মণের কাত ॥০ দরে	৮৲
কাঁচা মুখী হলুদ ৮০৴ মণে সিদ্ধ ও শুষ্কিবাদ শুঠ ১৮॥২ সের মাত্র ৩৲ টাকার দরে	৫৫॥৶৮
মোট আয়	৬৫৶৮
ব্যয় বাদ	২৬।৶০
নিট লাভ	৩৮৸৮ মাত্র

* ঐ সময় মজুরের দর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আদ্রক বা আদা।

বঙ্গ দেশের প্রায় সকল স্থানেই আদা জন্মিয়া থাকে। এ দেশে তিন প্রকার আদা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সচরাচর যে আদা ব্যবহার করিয়া থাকি, তদ্ভিন্ন কৃষ্ণ আদা ও আম আদা নামে আর দুই প্রকার আদা জন্মিয়া থাকে। কৃষ্ণ আদা ও আম আদার চাষ অতি অল্পই দেখা যায়। কৃষ্ণ আদা প্রায় এই আদার ন্যায় তবে প্রভেদের মধ্যে উহার অন্তর্ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণ আদার চাষাদি সাধারণ আদার চাষের ন্যায়। এই আদা সকল স্থানে জন্মে না, কোন কোন স্থানে অতি সামান্য জন্মিয়া থাকে। আম আদা; এই আদার গন্ধ কাঁচা আমের ন্যায় সেই জন্য উহাকে আম আদা কহিয়া থাকে। অম্লাদি রন্ধনে উহা ব্যবহায় হয়। ইহারও চাষাদির কোনরূপ পৃথক নিয়ম নাই।

আদা চাষে বেশ লাভ হইয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে প্রায় চল্লিশ মণ আদা জন্মে। নিতান্ত খারাপ জমিতেও কুড়ি মণের কম উৎপন্ন হয় না। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে রংপুর জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আদার আবাদ হইয়া থাকে। একমাত্র রংপুর জেলা হইতে প্রতি বৎসর অন্যূন এক লক্ষ টাকার আদা বাণিজ্যার্থে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

আদার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আদা কেবল যে আমাদের রন্ধন মসলার কাজ করে তাহা নহে। নানা প্রকার ঔষধে আদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদা দ্বারা এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়। বৈদ্যশাস্ত্র মতে আদা অত্যন্ত উপকারী। ডাক্তারি মতেও আদা ব্যবহার হইয়া থাকে।

একটু উচ্চ অথচ বহুদিনের অনাবাদী জমিতে উৎকৃষ্ট রূপ আদা জন্মিয়া থাকে। আদার চাষ করিতে হইলে অগ্রে ভূমি ঠিক করিয়া লইতে হয়। যে স্থানের নীচের মাটিতে বালির ভাগ বেশী এবং উপরিভাগে পলি কিম্বা হাল্‌কা মাটি থাকে এরূপ ক্ষেত্র আদা আবাদের পক্ষে ভাল। জলা জমি অর্থাৎ বর্ষাকালে যে স্থানে জল দাঁড়ায় অথবা বন্যার সময় জলে ডুবিয়া যায় এরূপ ভূমিতে আদা ভাল জন্মে না। তদ্ভিন্ন খিয়ার ও দোঁয়াশ মাটিতেও

চাষ হইতে পারে। মৃত্তিকা কঠিন হইলে মূল ভাল রূপ বাড়িতে পারে না। বেশী দিনের পতিত বা অনাবাদী জমিতে সার না দিয়া আদার চাষ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ বহুদিনের পতিত জমি সার দেওয়ার তুল্য উর্ব্বরা। আদার জমিতে সার না দিলে বিশেষ হানি হয় না, তবে সার দিলে উপকার ভিন্ন অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। আদার পক্ষে গোবর সারই প্রশস্ত। গোবরের টাট্‌কা সারে কোন উপকার হয় না বরং অপকার হইয়া থাকে। এজন্য গোবরের পুরাতন সার উত্তমরূপ শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া ক্ষেত্রে দিতে হয়।

আদার মূলে বীজের কার্য্য করে। বীজের দোষ গুণানুসারে আদার ফলন হইয়া থাকে। আদার গা হইতে চোকযুক্ত অংশ খণ্ড খণ্ড অংশে ভাঙ্গিয়া লইয়া রোপণ করিতে হয়। বীজ প্রস্তুত করিতে হইলে ঐরূপ খণ্ড খণ্ড ভাঙ্গিয়া এক দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করত ঘরের মধ্যে কোন স্থানে খড় বিছাইয়া তাহার উপর আন্দাজ এক ফুট উচ্চ করিয়া গাদা দিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে প্রতি বৎসর বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। চাষীদিগের নিকট যে কোন বীজ অতি আদরের বস্তু, কারণ বীজের উপরই তাহাদের পরিশ্রমের ফলাফল সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। যে নিয়মে বীজ রাখিবার ব্যবস্থা লিখিত হইল এই নিয়মে উহা রাখিলে কোন ক্রমেই তাহার নষ্ট হইবে না। অনন্তর উপযুক্ত সময়ে যো বুঝিয়া ঐ বীজ ভূমিতে লাগাইতে হইবে।

আদা রোপণের পক্ষে বৈশাখ মাসই ঠিক উপযুক্ত সময়। বৈশাখ মাসের মধ্যে রোপণ করিয়া না উঠিতে পারিলে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্তও বুনানির কাজ চলিতে পারে।

বৈশাখ মাসে আদা বুনিতে হইলে মাঘ ও ফাল্‌গুণ মাসের মধ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। এই সময় ক্ষেত কোদাল দিয়া খনন করিয়া রাখিতে হয়। অনন্তর বৈশাখ মাসে ভাল করিয়া কর্ষণ করিতে হইবে। এই সময় যদি ক্ষেতে ঘাস মুথা প্রভৃতি জঙ্গল থাকে, তবে তাহা উত্তম রূপে পরিষ্কার করা উচিত। জমিতে যদি বড় বড় মাটির চাপ থাকে, তবে তাহা বেশ করিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। এই সময় মৈ দ্বারা জমিটী একবারী সমান করিয়া দিতে হইবে অনন্তর ঐ সমান জমিতে দেড়ফুট অন্তর একএকট

শ্রেণী করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে এক এক ফুট অন্তর এক এক খণ্ড আদা রোপণ করিতে হইবে। আদা রোপণ করিতে হইলে বীজ আদা খানির চোক উপরের দিকে করিয়া পুঁতিতে হইবে এবং তাহার উপর সামান্য পরিমাণে গুঁড়া মাটি চাপা দিতে হইবে।

অল্প দিনের মধ্যেই আদার অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠের শেষ ও আষাঢ়ের প্রথম ভাগের মধ্যে যখন চারা একটু বড় হইবে, তখন একবার নিড়াইয়া গুঁড়া মাটি দ্বারা সমুদায় ক্ষেতের মাটি সমান করিয়া দিতে হইবে। আবশ্যক হইলে আষাঢ় মাসের শেষ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যেও আর একবার ক্ষেত নিড়াইয়া দিলে ভাল হয়। কৃষকের সর্ব্বদা ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। ক্ষেতে জঙ্গল হইতে দেখিলে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের মধ্যে আর একবার নিড়ান ভাল। কৃষকদিগের ইহা বেশ মনে রাখা উচিত যে কোন চাষে ক্ষেত্র জঙ্গল পূর্ণ হইলে কখনই ফসল ভাল হয় না। যাহাতে ফসল ভাল হয় তাহাতে ষোল আনা চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে চাষীদিগের মধ্যে একটী দোষ দেখা যায় যে, তাহারা কোন রূপ শিক্ষা পাইয়া চাষে প্রবৃত্ত হয় না। কিছুদিন চাষাদি করিতে করিতে এক প্রকার জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানানুসারে আজীবন কাজ করিয়া থাকে। তাহারা যদি প্রত্যেক জেলার চাষাদির বিবরণ জানিয়া চাষে প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলেও কিছু দূরদর্শিতা লাভ কবিতে পারে। যাহারা যেকাজ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সেই কাজের উন্নতি বা অবনতির কারণ সমূহ জানা আবশ্যক, এই রূপ জ্ঞান জন্মিলে চাষাদির পক্ষেও বিস্তর উপকার দর্শে। অন্যান্য জেলা অপেক্ষা যেমন রংপুর জেলায় তামাক ও আদা প্রভৃতি কয়েকটী ফসল ভাল হইয়া থাকে, সেইরূপ রংপুর ভিন্ন আর আর জেলার চাষীদিগের কর্ত্তব্য রংপুর জেলার ঐ সকল চাষাদির নিয়ম প্রভৃতি উত্তমরূপ শিক্ষা করেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চাষের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশে চাষ করিবার প্রণালী নাই। সুতরাং প্রত্যেক জেলার লোকেরা এক প্রকার অন্ধকারে থাকিয়া চাষাদি করিয়া থাকে। শিক্ষিত লোকেরা চাষ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়াই এদেশে চাষের দিন দিন অবনতি হইয়া আসিতেছে। এদেশের মৃত্তিকা যেরূপ উর্ব্বরা বুদ্ধিমান লোকেরা চাষে প্রবৃত্ত হইলে প্রভূত

লাভ করিতে পারেন। যে আদা অতি সামান্য জিনিস বলিয়া লোকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, সেই আদার চাষে লাভ নিতান্ত কম নহে।

ফাল্গুন মাসে ক্ষেত হইতে আদা তুলিতে হয়। আদা তুলিবার সময় একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ এরূপ নিয়মে উহা তুলিতে হইবে যাহাতে চাপ না ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইতে পারে।

আদা তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বীজের জন্য রাখিতে হইবে। বীজ আদা রাখিয়া অবশিষ্ট আদার চোক ছুরী দ্বারা ছিলিয়া ক্ষেতে ছড়াইয়া শুষ্ক করিতে হইবে। শুষ্ক করিবার সময় তাহাতে যেন বৃষ্টির জল না লাগিতে পারে, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৃষ্টির আশঙ্কা দেখিলে ক্ষেত হইতে আদা তুলিয়া রাখিতে হইবে। রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিয়া না রাখিলে আদা নষ্ট হইতে পারে। শুষ্ক আদা ঘরে মাচা করিয়া তুলিয়া রাখিতে হয়।

আম আদা ও কৃষ্ণ আদার চাষ অতি সামান্যরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে দুই এক ঝাড় গাছ করিলে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য আদার সংকুলান হইতে পারে। আদার গাছ হলুদের গাছের ন্যায় ঝাড় হইয়া থাকে, গৃহস্থের বাড়ীতে দুই একটী ঝাড় থাকিলে তাহার বিশেষ কোন রূপ পাইট না করিলেও চলিতে পারে।

গুটিকলম করিবার সহজ উপায়।

খাঁটি সরিষার (পুরাতন হইলে ভাল হয়) খৈল যত শুক্‌নো গোবরের গুঁড়া তার অর্দ্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী, গোবর গুঁড়া যত এটেল মাটীর ধুলা তত দিয়া এক প্রকার এবং এমত পরিমাণে জল দিয়া গুলাও যেন তাহা এটেল কাদার মত হয়। ইহাই সহজে কলম করিবার মিশ্র মৃত্তিকা প্রস্তুত হইল।

পরে এক খানি তীক্ষ্নধার ছুরী লইয়া যে গাছের কলম লইবে, সেখানে

যাইয়া, এমন একটি ডাল নির্ব্বাচন কর, যাহা বেশ শক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে স্থানে চির চির অথবা গাঁট গাঁট হইয়াছে। তাহার উপরের দিকে যেখানে টস টসে সবুজ বর্ণ দেখাইতেছে, তাহার এক কড়া নীচেই ডালের চারিদিকে তিন আঙুল পরিমিত স্থান ছুরীর দ্বারা চাঁছিয়া দাও তাহা যেন কাঠ হইতে কিছু কিছু চাঁছিয়া আসে।

অনন্তর তিন ছটাক পরিমিত উক্ত মাটী লইয়া, যেখানে চাঁছিয়াছ, তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া এক খানি চট অথবা ৮।১০ আঙুল পরিমাণের কাটা জুনো দড়ি সোজা সোজী রাখিয়া দড়ি দিয়া বান্ধিয়া দাও। তিন মাসগত হইতে না হইতে কেতকী শিকড়ের ন্যায় শিকড় বাহির হইয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিবে। উক্ত শিকড় না শুকাইয়া যায় এরূপ সাবধানে থাকিতে হইবে। অর্থাৎ শিকড় গজাইলেই যেন ধীরে ধীরে কাটিয়া আনিয়া সরস ও উর্ব্বরা স্থানে লাগাইবে এবং কিছু দিন রোদ লাগিতে দিবে না। কিন্তু রাত্রে অনাবৃত রাখিবে।

এপ্রক্রিয়ায় শতকরা নব্বুইটা কলম বাঁচে। ফলতঃ আমরা যত কলমকরিয়াছি সকলই বাচিয়াছে। বৃষ্টিকালে কলম করিলে কোন কষ্ট নাই। অনেকে বলেন বৃষ্টিতে পচিয়া যায়, আমরা তাহা স্বীকার করি না বাস্তবিক বৃষ্টিতে পচে না তবে উহা যখন কাটিয়া আনিয়া রোপণ করিবে, তখন যদি তাহার মূল অতিশয় স্যাঁত সেঁতে মাটীতে থাকে, তাহা হইলে পচিয়া যাইবারন অধিক সম্ভাবনা। এজন্য লাগাইবার সময় একটু সাবধান হইয়া লাগাইলে, কো আষ্টন হইবে না। অর্থাৎ মূলে একটু উচ্চ করিয়া মাটী দিলে, চারিদিকে জল গড়াইয়া যাইবে। অন্যান্য সময়েও কলম হয় কিন্তু তাহা এত সহজ নয়, মধ্যে মধ্যে জল দিয়া কলম স্থানের মাটী ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতেও কোন কষ্ট নাই।

এ প্রক্রিয়ায় আম, আমড়া, গোলাপ, জবা, লেবু, পিচ প্রভৃতির কলম হইয়া থাকে।

শ্রীরুদ্রনারায়ণ পট্টনায়ক।

খনার বচন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯ পৃষ্ঠার পর)

বাড়ীর কাছে ধন পা।
যার মার আগে ছা॥
চিনিস বা না চিনিস।
ঘুজি দেখে কিনিস॥

কিরূপ স্থানে চাষ করিলে সমধিক লাভের সম্ভব, তদ্‌সম্বন্ধে খনার এই উপদেশটী মহোপকারী। চাষ বাড়ীর নিকটে হইলে সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে পারা যায়। এই জন্য ক্ষেত বাড়ীর যতই নিকটে হয় ততই ভাল। ঘুজি দেখিয়া গোরু কিনিলে প্রায়ই ঠকিতে হয় না।

আগে পুঁতে কলা।
বাগ্‌ বাগীচে ফলা॥
শোন্‌রে বলি চাষার পো।
পরে নারিকেল ক্রমে গুও।
নারিকেল বার, সুপারি আট এর ঘন তখনি কাট॥

ফল বৃক্ষের বাগান করিতে হইলে প্রথমে কলার আবাদ করা ভাল। কলার আবাদ করিয়া সেই সঙ্গে আম কাঁঠাল প্রভৃতির গাছ করিলে কলার চাষে ক্ষেত রসাল থাকিতে পারে। আর আম কাঁঠাল ফলিতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে কলার পাতা, থোড় এবং কলা বিক্রয় দ্বারা লাভ হইতে পারে। নারিকেল বার হাত অন্তর এবং সুপারি আট হাত অন্তর রোপণ করা উচিত; ঘন রোপিত হইলে গাছ কাটিয়া দিয়া ফাক করা আবশ্যক। ফল-বৃক্ষ অধিক অন্তর অন্তর রোপণ করিলে গাছে ফল অধিক হয়। গাছ ঘন হইলে গাছের শিকড় ও ডাল পরস্পর ঠেকাঠেকি হওয়াতে ফলের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বাতাস ও রৌদ্র গাছের সকল দিকে সমান ভাবে লাগিতে পারে না এজন্য ফাক ফাক করিয়া গাছ পুঁতিতে হয়। চারা রোপণ সম্বন্ধে এদেশে একটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকে ঘন করিয়া গাছ পুঁতিয়া শেষে মায়া ক্রমে তাহা কাটিতে পারে না। ঘন

গাছে যে ফলনের বিস্তর ব্যাঘাত হয় তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক। গাছ ঘন করিয়া রোপিত হইলে তাহার স্বাস্থ্য ভালরূপ রক্ষিত হয় না। গাছের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উদ্যানকারীর একটী প্রধান কাজ। এক স্থানে অধিক গাছ রোপিত হইলে কেবল যে ফলন কম হয় তাহা নহে, বড় বড় বৃক্ষ উপযুক্তরূপে বাড়িতে কিম্বা মোটা হইতে পারে না। গাছ মোটা হইলে কাষ্ঠ বিক্রয় দ্বারা বিস্তর আয় হইতে পারে। সকল গাছে কিছু ফল হয় না। কাষ্ঠের জন্য যে সকল গাছ রোপিত হইয়া থাকে, সেই সকল গাছ যত মোটা এবং সারবান হয় ততই মূল্য অধিক হইয়া থাকে। এক স্থানে ঘন করিয়া গাছ রোপিত হইলে গাছের গুঁড়ি মোটা না হইয়া সরু হইয়া থাকে। অতএব কি ফল বৃক্ষ কি বিক্রয় কাষ্ঠোপযোগী বৃক্ষ সমূহ ঘন করিয়া রোপণ করা উচিত নহে।

গোয়ে গোবর বাঁশে মাটি।
অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি ওলে কুটী মানে ছাই।
এইরূপে কৃষি কর্‌গে ভাই॥

সকল গাছের পক্ষে এক প্রকার সার উপকারী নহে। গাছের প্রকৃতি অনুসারে সারের ব্যবস্থা করা উচিত। যেমন একরূপ খাদ্যে সকল মনুষ্যের দেহ পোষণ হয় না, ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের আবশ্যক হয় সেইরূপ উদ্ভিদ্‌দিগের পক্ষেও পৃথক পৃথক সার প্রয়োজন করে। সুপারি গাছের মূলে গোবর এবং বাঁশের গোড়ায় মাটি দিলে বিশেষ উপকার হয়। অফলন্ত নারিকেল গাছের মূলের মাটি তুলিয়া চারিদিকের শিকড় কাটিয়া দিবে। গোড়ার মাটি তুলিয়া দিলে মূলে রৌদ্র ও বাতাস লাগিয়া অত্যন্ত উপকার হয়। ওল গাছের গোড়ায় তৃণাদি পচা সার এবং মানকচুর গাছের গোড়ায় ছাই দিলে তাহারা শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। চাষীর উচিত গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন। অনেক চাষী সার নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া যে কোন সার ক্ষেতে দিয়া থাকেন, ক্ষেতে সার দিলেই যে উপকার হইবে সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। কোন্ উদ্ভিদ্ কোন প্রকার সার গ্রহণ করিয়া দেহ পরিপুষ্ট করিতে সমর্থ হয় তদ্বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে অধিক পরিমাণে সার দিলেও কোন ফল হইবে না।

ডেল্‌ফিনিয়ম।

(DELPHINIUM)

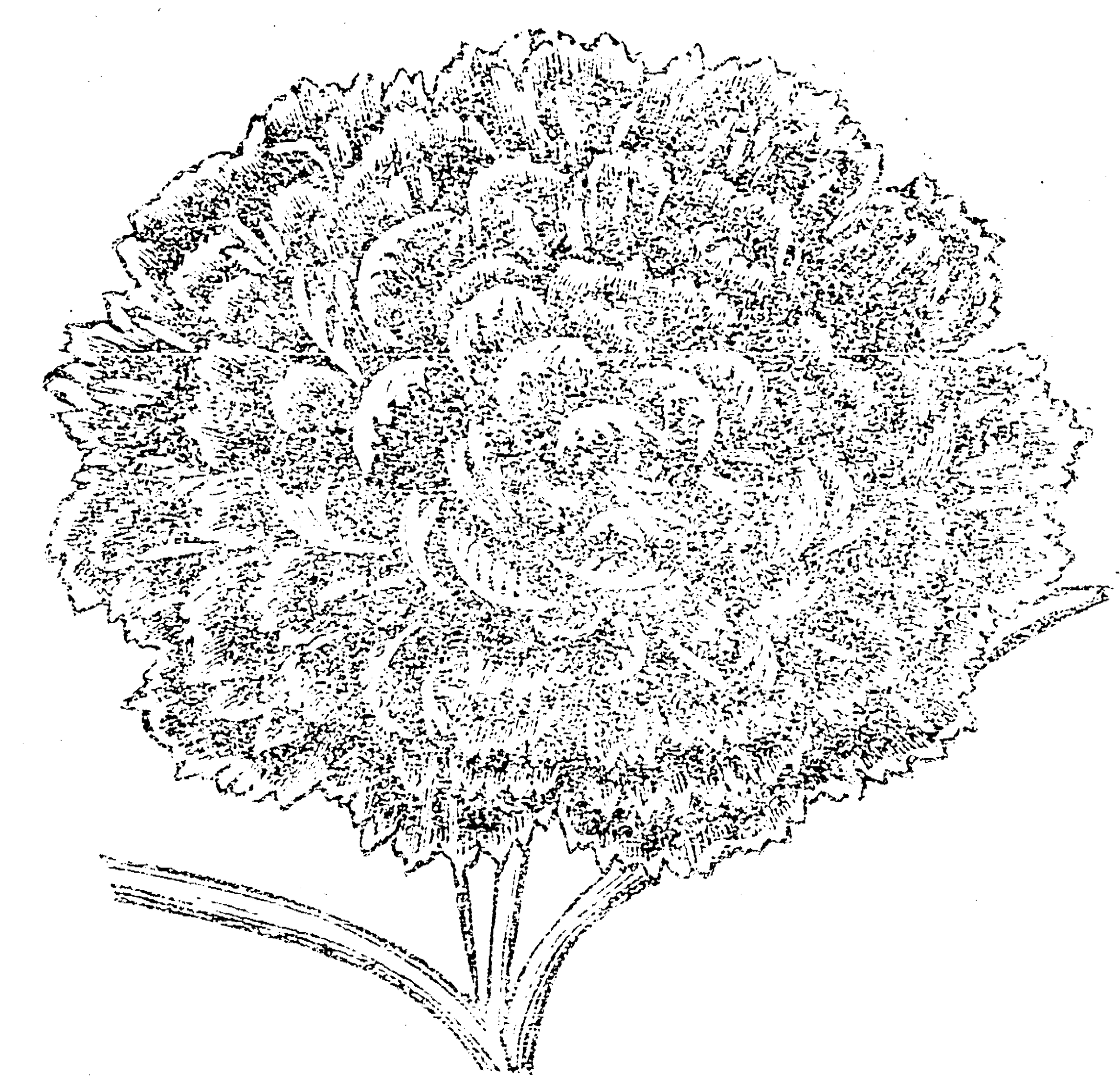

ডেল্‌ফিনিয়মকে সাধারণে লার্ক্‌সপার কহে। লার্ক্‌সপার অতি রমণীয় ফুল। এই ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিলে এমন লোক কেহ নাই যে, তিনি বিমোহিত না হয়েন। যে সময় লার্ক্‌সপার ফুটিতে আরম্ভ হয়, তখন সকলেরই ইচ্ছা হয় ফুলের গাছটী সম্মুখে রাখিয়া রাত দিন উহার সৌন্দর্য্য দেখি। যাঁহাদিগের ফুলের সখ আছে তাঁহাদিগের ত কথায় নাই। ফলতঃ ফুলের সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে হইলে লার্ক্‌সপার বাগানে রোপণ করা একান্ত আবশ্যক।

অন্যান্য ফুলের ন্যায় ডেল্‌ফিনিয়ম বা লার্ক্‌সপারের বারমাস গাছ সজীব থাকে না সুতরাং বৎসরের মধ্যে সকল সময় ফুলের শোভা উপভোগ করিতে পারা যায় না। ডেল্‌ফিনিয়ম বৎসরের মধ্যে একবার ফুটিয়া থাকে। শীত কালে এই ফুল হইয়া থাকে এজন্য ইহাকে ঋতু পুষ্প (Annuls) বা জেড়ুয়া ফুল কহে। জেড়ুয়া ফুলের মধ্যে এই জাতীয় ফুল দেখিতে অত্যন্ত মনোহর।

ডেল্‌ফিনিয়মের বর্ণ এক প্রকার নহে: এক একটী ফুলের অসাধারণ

বর্ণের সৌন্দর্য্য দেখা যায়। ফুলের মাথায় অর্থাৎ প্রত্যেক ফুলের দলের অগ্রভাগ কাঁক্‌রিকাটার ন্যায়। কোন কোন শ্রেণীর ডেল্‌ফিনিয়মের ঐ অগ্রভাগে শাদা শাদা রেখা থাকে। ডেলফিনিয়মের একটী নির্দ্দিষ্ট রঙ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরমোসম্ (Formosum) এই জাতীয় ফুলের মধ্য ভাগ শাদা, এবং অন্যান্য অংশ সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট, এই জাতীয় গাছ দুই ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। ইলাটম (Ilatum) ইহার বর্ণ সবুজ এবং অত্যন্ত সুশ্রী। হেণ্ডার্সনী (Hendersoni) ইহার রঙ পাতলা সবুজ। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ডেল্‌ফিনিয়ম বাগানে ফুটিতে আরম্ভ হইলে যার পর নাই শোভা হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন চৈত্রের কতক দিন পর্য্যন্ত ডেল্‌ফিনিয়মের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পৌষ ও মাঘ মাসের ফুলের যেরূপ সৌন্দর্য্য অন্যান্য মাসের ফুলের সেরূপ শোভা থাকে না। যে সময় অধিক শীত প্রবল হয় এবং শিশির সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। সেই সময়ে ফুল সমূহ অপূর্ব্ব শ্রী লইয়া প্রস্ফুটিত হয়। ডেল্‌ফিনিয়ম আমাদের এদেশের ফুল নহে। সাহেবদিগের দ্বারা উহা এতদ্দেশে আনীত হইয়াছে।

প্রথমে ইংরাজদিগের বাগানেই এই ফুল দেখা যাইত কিন্তু আজ কাল দেশীয়দিগের মধ্যে অনেকেরই বাগানে লার্ক্‌সপার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর এই ফুলের বীজ বিদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে। বীজ পুরাতন বা খারাপ হইলে আদৌ তাহা অঙ্কুরি হয় না। বীজ ভাল না হইলে গাছ ভাল হয় না সুতরাং গাছ উত্তম না জন্মিলে উপযুক্ত মত ফুল হইতেও দেখা যায় না।

যে কোন ফুল বা ফল কিম্বা শস্যাদির উন্নতি এবং অবনতি বীজের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এজন্য উত্তম বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। লার্ক্‌স-পারের বীজের একটা মহৎ দোষ এই যে, শীতল বাতাস লাগাইলে কিম্বা সাঁৎ্তা স্থানে রাখিলে উহা প্রায় অঙ্কুরিত হয় না এজন্য শিশি মধ্যে উত্তম-রূপ মুখ বন্ধ করিয়া ভাল স্থানে রাখিতে হয়। এ দেশে যে সকল বীজ হইয়া থাকে তৎ সমুদায় বিদেশীয় বীজের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। ইহার বীজের

আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদেশীয় জল বায়ু এবং উত্তাপের উপযোগী বীজ হইতে চারা বাহির করা কিছু কঠিন। অনেকে চারা বাহির করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। যে নিয়মে বীজ বুনিলে এবং পাইট করিলে গাছ হইয়া থাকে, তাহা জানা একান্ত আবশ্যক।

সকল প্রকার মাটিতে লার্কসপার ভাল জন্মে না। যে দোঁয়াস মাটিতে বালির ভাগ অধিক তাহাতে বীজ বুনিলে শীঘ্র চারা বাহির হয়। মাটিতে বালির ভাগ কিছু বেশী থাকিলে তাহা প্রায় হাল্‌কা হইয়া থাকে, হাল্‌কা মাটি জেড়ুয়া ফুল মাত্রেরই পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। লার্কস্পারে সার দিতে হইলে পাতা সারই উত্তম। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে মাটি এরূপ করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে যে, তাহা যেন খুব ঝুরা হয়। সেই ঝুরা মাটি দ্বারা টব বা গামলা পূর্ণ করিতে হইবে। অন্যান্য জেড়ুয়া ফুল বুনিবার পক্ষে যেমন টবে মাটি দিয়া বীজ বপনের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, লার্কসপার বা ডেল্‌ফিনিয়মের পক্ষেও সেইরূপ নিয়ম। যতদিন পর্য্যন্ত বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত না হয় ততদিন টব বিশেষ সাবধানে রাখিতে হইবে অর্থাৎ দিবসে বারাণ্ডায় এবং রাত্রিকালে বাহিরে রাখিতে হয়। রাত্রিকালের শিশির পাইলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় না। কোন রকমে বৃষ্টির জলে যেন টবের মাটি ডুবিয়া না যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ এই অবস্থায় বৃষ্টির জলে উহা ভিজিয়া গেলে চারা হওয়ার প্রায় আশা থাকে না। এজন্য আকাশে মেঘ দেখিলে টব ঘরে তুলিয়া রাখিতে হয়। রাত্রিকালে শিশির এবং প্রভাতে মৃদু রৌদ্র পাইলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। যত দিন পর্য্যন্ত চারা একটু জোরাল হইয়া না উঠিতে পারে ততদিন অধিক রৌদ্র পাওয়ান উচিত নহে। টবের মাটির অবস্থা বুঝিয়া জল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয় অর্থাৎ বীজ বুনানির পর হইতে যখন দেখিবে মাটী শুষ্ক হইয়াছে তখন সরু ধার বোমা কিম্বা হাতে করিয়া আস্তে আস্তে জল দিতে হইবে। একেবারে অধিক জল টবে ঢালিয়া দিয়া উচিত নহে; কারণ চারার অবস্থায় জোরে অধিক জল ঢালিয়া দিলে বীজ সকল হয় অধিক মাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্কুরিত হইবে না অথবা সকল স্থানের

বীজ এক স্থানে জমা হইয়া পড়িবে। আর চারার অবস্থায় ঐরূপ করিয়া জল দিলে চারার গোড়া আল্‌গা হইবে তাহা যদিও না হয় তবে উহা হেলিয়া পড়িবার খুব সম্ভব। এজন্য জল দেওয়ার পক্ষে একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, অধিক দিন অতীত হইয়া অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। অঙ্কুর হইতে বিলম্ব দেখিলে টবের অর্দ্ধেক পরিমাণ জলে ডুবাইয়া রাখিলেও অঙ্কুর নির্গত হইতে দেখা গিয়া থাকে। কোন রকমে চারা একটু বড় হইলে কোন রূপ আশাঙ্কা থাকে না। টবে চারা ৩।৪ আঙুল বড় হইলে তখন তাহা তুলিয়া অন্যান্য টবে লাগাইতে হয়। এক একটা টবে অধিক পরিমাণে গাছ লাগান ভাল নহে। তাহাতে গাছ ভালরূপ বাড়িয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং গাছ ভাল না হইলে মধ্যে মধ্যে টবের মাটী খুসিয়া দেওয়া উচিত। কারণ গোড়ার মাটী যত সল হয় ততই গাছের তেজ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তেজাল গাছে উত্তমরূপ ফুল হইতে দেখা যায়। লার্ক্‌সপারের গাছ করিয়া ফুলের শোভা ভোগ করিতে হইলে একটু বিশেষ যত্ন করিতে হয়। যত্নের ত্রুটি হইলে গাছ বাঁচান বড় কঠিন।

ফাল্গুণ মাস হইতে যেমন রৌদ্র প্রবল হইতে আরম্ভ হয় সেই সঙ্গে গাছ হীন-শ্রী হইয়া উহা শুকাইতে থাকে। তখন গাছে প্রচুর জল দিলেও তাহা জীবিত থাকিয়া ফুল প্রসব করিতে সমর্থ হয় না। ক্রমে গাছ একেবারে শুষ্ক হইয়া থাকে। লার্ক্‌সপার অধিক রৌদ্র কিম্বা বৃষ্টির উপযোগী নহে। এজন্য আশ্বিনের শেষ হইতে অগ্রহায়ণের কতক দিন পর্য্যন্ত বীজ বপনের পক্ষে অনুকূল। যে বৎসর আশ্বিন মাসে অধিক বৃষ্টি হইতে থাকে সে বৎসর তত শীঘ্র বীজ বপন নিষেধ। এ সম্বন্ধে এই একটী সহজ কথা জানিয়া রাখা উচিত যে, যত দিন পর্য্যন্ত একটু শীত বা হিম পড়িতে আরম্ভ না হয় তত দিন কোন ক্রমে বীজ বপন করা উচিত নহে। কারণ ঐরূপ সময়ে বীজ বপন করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির করা বড় কঠিন। প্রত্যেক ব্যক্তির ইহা জানা আবশ্যক যে, সময়ে বীজ বপন করিলে যত শীঘ্র এবং যত সহজে চারা হইয়া থাকে, অসময়ে বুনিলে সেরূপ হয় না। এজন্য সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা একটী প্রধান কাজ।

উদ্যান-প্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে লার্ক্‌সপার একটী বড় আদরের ফুল। শীতকালে বাগান সাজাইবার এরূপ শোভাজনক ফুল অতি অল্পই দেখা যায়। লার্ক্‌সপার ফুলের কোন প্রকার গন্ধ নাই। কেবল শোভার জন্য উহার আদর।

———*———

পইন্‌সিয়ানা রিজিয়া
বা
বিলাতী কৃষ্ণচূড়া।

(POINCIANA Regia)

পইন্‌সিয়ানাকে এদেশে বিলাতী কৃষ্ণচূড়া কহিয়া থাকে। বাগান সাজাইবার পক্ষে এই গাছ অতি সুন্দর। পইন্‌সিয়ানার বারমাসই সৌন্দর্য্য দেখা যায়। গাছের যেরূপ আকার এবং পাতার যেরূপ বাহার তাহাতে কেহই উহার সৌন্দর্য্য ভুলিতে পারে না। পন্‌সিয়ানার পাতা সরু সরু এবং চির সবুজ বর্ণে রঞ্জিত। এই সবুজ বর্ণের পাতা আবার ঘন ঘন ভাবে সাজান থাকাতে গাছের যে একটী অপূর্ব্ব শ্রী হয়, তাহা নিজের চোকে না দেখিলে সে শোভার কথা অন্যকে কথায় বলিয়া কিম্বা পুস্তকে লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

পইন্‌সিয়ানা গাছের সমুদায় অংশই শোভা জনক। গাছের ডালগুলি সরল, পাতার গঠন সুন্দর; বর্ণ চমৎকার এবং ফুলের অতুলনীয় শোভা। পইন্‌সিয়ানার যখন ফুল ফুটিয়া থাকে, তখন তাহার সৌন্দর্য্যে বাগান আলো হয়। ইহার গাছ বড় হইয়া থাকে, সেই বড় বড় গাছে চারিধারে ডালপালা বিস্তারিত হয়, সুতরাং সেই বিস্তারিত শাখা সমূহে প্রচুর ফুল ধরিলে—সহজেই চমৎকার শোভা হইয়া উঠে। পইন্‌সিয়ানার ফুলের আরও সৌন্দর্য্য এই যে, উহার নানারূপ বর্ণ এবং এক একটী থোলতে অনেকগুলি ফুল থাকাতে বোধ হয় যেন, গাছময় ফুলের তোড়া সাজান রহিয়াছে। পইন্‌সিয়ানার ফুলের রঙ একরূপ নহে। যদিও সমুদায় গাছের ধরণ, আকার এবং পত্রের গঠন এক প্রকার কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন গাছে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ফুল ফুটিতে দেখা যায়। ঘোর লাল, পাতলা (ফিকে) লাল, ঈষৎ হরিদ্রা

বর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ বর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে একবার পইন্‌সিয়ানার ফুল হয়। চৈত্র মাস হইতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয় এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত প্রচুর ফুল হইয়া থাকে। ফলতঃ ফুলের শোভা এবং গাছের শোভা দুইটাই যদি একসঙ্গে উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয় তবে পইনসিয়ানা বাগানে রোপণ করা উচিত।

পইন্‌সিয়ানার একটী বিশেষ গুণ এই যে, উহা অল্প যত্নে হয় এবং অল্প দিনের মধ্যে গাছ বাড়িয়া উঠিয়া উদ্যান স্বামীর আনন্দ বর্দ্ধন করে। পইন্‌সিয়ানার কাষ্ঠ তত কঠিন নহে। একটু বেশী ঝড় হইলে ডালপালা ভাঙ্গিয়া থাকে। কাষ্ঠ অতি সরল। পইন্‌সিয়ানার কাষ্ঠে কোন প্রকার ভাল কাজের জিনিস হয় না, তবে হাল্‌কা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

রাস্তার উভয় পার্শ্বে এবং উদ্যানের প্রাচীরের ধারে এই গাছ রোপণ করিতে হয়। যে কোন গাছ এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিলে শোভা হইয়া থাকে। গাছের অবস্থা না বুঝিয়া যেখানে সেখানে রোপণ করিলে তত শোভা-জনক হয় না। এজন্য কোন গাছাদি পুঁতিবার পূর্ব্বে তাহার অবস্থা অর্থাৎ কোন্ গাছের আকার কত বড় তাহার ডালপালা এবং ফুলের ধরণ কি প্রকার তাহা জানা আবশ্যক। যাহার শোভানুভাবকতা আছে সেই বাগানে গাছ পালা সাজাইয়া রোপণ করিতে পারে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র লাগিতে পায় এরূপ স্থানে পন্‌সিয়ানা রোপণ করিলে গাছে প্রচুর ফুল হইয়া থাকে। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি সকল গাছে সমান ফুল ধরে না। কোন কোন গাছে এত অধিক ফুল ফুটিয়া থাকে যে গাছের পাতা পর্য্যন্ত দেখা যায় না, কেবল গাছময় ফুল ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া থাকে।

বীজ রোপণ কিম্বা কলম দ্বারা দুই উপায়েই পইন্‌সিয়ানার গাছ হইতে পারে। বীজের গাছ অপেক্ষা কলমের গাছে শীঘ্র ফুল হইয়া থাকে, এমন কি কলমের চারায় এক বৎসরে ফুল ফুটিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু বীজের চারায় ফুল ফুটিতে অন্যূন তিন চারি বৎসর সময় লাগিয়া থাকে। এজন্য কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত করাই ভাল।

খোঁচা ও গুটিকলম দ্বারা পইন্‌সিয়ানার চারা প্রস্তুত করিতে হয়। যে সকল গাছ গুটিকলম দ্বারা তৈয়ার হইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ গাছই খোঁচা কলমে হইতে পারে। খোঁচা কলম ও গুটিকলম উভয় প্রকার কলম প্রস্তুত করা অতি সহজ। পইন্‌সিয়ানার খোঁচা কলম করিতে হইলে একটী স্থানে আগে হাপোর প্রস্তুত করিতে হয়। হাপোরের মাটি যেন রসাল থাকে। হাপোর প্রস্তুত হইলে পইন্‌সিয়ানার সরল ডালগুলি আন্দাজ ৮।১০ আঙুল লম্বা করিয়া কাটিতে হয়। অনন্তর সেই কর্ত্তিত ডালগুলি হাপোরে একটু আড়ভাবে পুঁতিতে হয়। গাছের যে কোন ডাল পুঁতিলেই যে চারা প্রস্তুত হয় তাহা নহে। এক এক জাতীয় গাছের পক্ষে এক এক প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। পইন্‌সিয়ানার যে ডালগুলি মোটা অথবা যেন অর্থাৎ তাহার গা হইতে পত্রাদি বাহির হইবার কোনরূপ সম্ভব নাই তাহা পুঁতিলে তত সুবিধা হয় না। ডালের অগ্রভাগ কাটিয়া লইয়া পুঁতিলে ভাল হয়। কারণ যে কোন ডালের অগ্রভাগেই প্রায় অধিকাংশ পত্রাদি নির্গত হইয়া থাকে। ডালের অগ্রভাগ পুঁতিলে প্রত্যেক পত্র গ্রন্থি অর্থাৎ পাতা বাহির হইবার স্থান হইতে অঙ্কুর নির্গত হইতে দেখা যায়। স্থলপদ্ম, জবা এবং গোলাপাদির খোঁচা কলম যে নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, পইন্‌সিয়ানার খোঁচা কলম করিবার পক্ষেও সেইরূপ নিয়ম। বৎসরের মধ্যে সকল সময়ে পইন্‌সিয়ানার কলম প্রস্তুত করিবার পক্ষে সুবিধা-জনক নহে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত পইন্‌সিয়ানার কলমের প্রশস্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে কলম করিলে প্রায় তাহা নষ্ট হয় না। হাপোরের অবস্থা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল দিতে হয়। বৃষ্টির সময় এবং মাটী ভিজা থাকিলে হাপোরে জল দেওয়ার কোন আবশ্যকতা হয় না। মধ্যে মধ্যে হাপোরের মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। হাপোরে ঘাস মুথা হইলে তাহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ অবস্থায় কিছু দিন হাপোরে থাকিলে চারা লাগিয়া যায়। হাপোরের মধ্যে যে সকল ডাল না লাগিয়া মরিয়া যায় সেই শুষ্ক ডাল তুলিয়া ফেলা উচিত। অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় কেঁচো ও উঁই লাগিয়া শিকড়

নষ্ট করিয়া দেয় তাহাতে অনেক গাছ মরিয়া যায়। তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় হুঁকার জল দিলে ভাল হয়। হাপোরে ডাল ভাল করিয়া লাগিয়া গেলে, অর্থাৎ নূতন নূতন শাখা ও পত্র নির্গত হইয়া যখন সতেজ চারার ন্যায় উহা হইয়া উঠিবে, তখন তাহা তুলিয়া লইয়া নিয়মিত স্থানে স্থায়ীরূপে রোপণ করা কর্ত্তব্য। কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে, পইন্সিয়ানার ডাল পুঁতিয়া বাগানের বেড়া বাঁধা হইয়াছে, কিছু দিন পরে সেই ডাল লাগিয়া গিয়া গাছ উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ পাইয়াছি, অতি সহজেই পইন্সিয়ানার গাছ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

খোঁচা কলম ও গুটি কলম যদিও উভয় উপায়ে চারা প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু গুটিকলম অপেক্ষা খোঁচা কলম অতি সহজ। অন্যান্য গাছ সম্বন্ধে গুটিকলম করিবার যেরূপ নিয়ম লিখিত হইয়াছে পইন্সিয়ানার গুটিকলম করিবার পক্ষেও অবিকল সেইরূপ নিয়ম। গুটি কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত করার বিষয় কৃষিতত্ত্বে অনেক স্থানে উল্লিখিত হওয়ায় এস্থলে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

যে সময়ে পইন্সিয়ানার কলম বাঁধিতে হয় বীজ রোপণের পক্ষে সে সময় প্রশস্ত নহে। মাঘ মাসের শেষ হইতে বৈশাখ মাস মধ্যে যে কোন সময়ে বীজ পুঁতিলে চলিতে পারে। পইন্সিয়ানার বীজ সঁদালের সোঁটার ন্যায় ধরিয়া থাকে। সোঁটার মধ্যে এক একটী ঘর আছে সেই ঘরে শিম বীজের ন্যায় এক একটী বীজ থাকে। বীজের আকার কিছু লম্বা ধরণের, বর্ণ কাল এবং টিপিলে খুব শক্ত বোধ হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুণ চৈত্র মাসে গাছে বীজ পাকিয়া থাকে।

গাছের সুপক্ক বীজ চারা প্রস্তুত করিবার জন্য যত্ন করিয়া রাখিতে হয়। সুপক্ক বীজ না হইলে চারা জন্মে না। এজন্য উপযুক্ত সময়ে বীজ ধরা আবশ্যক। অনেকে বীজের দোষে চারা তৈয়ার করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। পইন্সিয়ানার সকল বীজ এক সময়ে অঙ্কুরিত হয় না। বীজ রোপণের দিন হইতে ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত উহা মাটীর মধ্যে থাকিয়া অঙ্কুর হইতে

দেখা গিয়াছে। অতএব শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত না হইলে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে বীজ মন্দ বলিয়া এরূপ হইতেছে। পইন্সিয়ানার বীজ রোপণ করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হইলে অগ্রে কোন স্থানে তাহা পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়। প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই চারা হইয়া থাকে। তবে দোঁয়াস মৃত্তিকায় বীজ রোপিত হইলে তাহা প্রায় নষ্ট হয় না। বীজ বুনিবার অগ্রে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঘাস মুথা এবং ইঁটের কুচি প্রভৃতি ভাল করিয়া বাছিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর সেই স্থানের মাটী উত্তম করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। খুঁড়িবার সময় মাটির যে সকল ঢিল থাকে তাহা ভাঙ্গিয়া গুঁড় করা আবশ্যক। এইরূপে মাটি প্রস্তুত হইলে সেই স্থানে এক একটী করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। বীজ রোপণের পর মধ্যে মধ্যে মাটির অবস্থা বুঝিয়া জল দিতে হইবে। নিয়মিতরূপে জল পাইলে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যত দিন সেই চারা সতেজ না হয় ততদিন তাহা সেই অবস্থায় রাখিতে হইবে। কারণ তেজাল গাছ না হইলে তাহা তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিলে গাছ ঝিম ধরা হইয়া মরিবার সম্ভব। যে কোন গাছের তেজাল চারা পুঁতিলে প্রায় নষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বীজের চারা বড় হইয়া ফুল ধরিতে প্রায় ৪।৫ বৎসর সময় লাগিয়া থাকে এজন্য শীঘ্র ফুলের শোভা ভোগ করিতে হইলে কলমের চারা রোপণ করাই ভাল। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই পইন্সিয়ানার গাছ করিয়া শোভা ভোগ করিতে পারেন। চারা প্রস্তুত করিবার উপায় জানা থাকিলে একটী গাছ হইতে বহুতর গাছ করিতে পারা যায়।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পইন্সিয়ানার গাছ হইতে পারে। পূর্ব্বে এই গাছ দেশ মধ্যে দেখা যাইত না কিন্তু এক্ষণে অনেক স্থানে পইন্সিয়ানার গাছ দেখা যায়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে এক প্রকার কৃষ্ণচূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণচূড়ার ফুলে হিন্দু মতে দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। দেশী কৃষ্ণচূড়াকে পইন্সিয়ানা পলচেরিমা (Poinciana, Pulcherrima.)

কহে। দেশী কৃষ্ণচূড়ার বিশেষ কোন রূপ পাইট করিতে হয় না। এই জাতীয় কৃষ্ণচূড়ার এক একটী গাছ সচরাচর ৮।১০ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। বিলাতী কৃষ্ণচূড়ার ন্যায় দেশী কৃষ্ণচূড়ার গাছের তত বাহার নাই। বিলাতী কৃষ্ণচূড়ার পাতা যেমন সাজান এবং পাতার বর্ণ ও আকার যেরূপ শোভাজনক দেশী কৃষ্ণচূড়ার পাতার ভাব ঠিক সেরূপ নহে। বিলাতী কৃষ্ণচূড়া এবং দেশী কৃষ্ণচূড়ার কেবল যে পাতা ও গাছের আকারেতে প্রভেদ তাহা নহে ফুলেরও অনেক প্রভেদ দেখা যায়। বিলাতি কৃষ্ণচূড়ার যেমন ফুলের পৃথক পৃথক বর্ণ দেখা যায় দেশী কৃষ্ণচূড়ার ফুলেরও সেইরূপ পৃথক ভাব আছে।

(পিপ্পলি বা পিপুল।)

পিপুল এদেশীয় একটী অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহার আবাদেও বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হইয়া থাকে। আমাদের প্রাচীন চিকিৎসক মহাশয়েরা পাঁচন ও ঔষধাদিতে পিপুল মূল এবং পিপুলের যেরূপ আদর দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে পিপুলের প্রয়োজনীয়তা এখনও নিতান্ত কম নহে। এস্থলে উহার গুণাগুণ বিষয়ের বর্ণনা করা আমার অনধিকার চর্চ্চা করা হয় বলিয়া তাহা উপেক্ষিত রহিল। কি প্রণালীতে উহার আবাদ করিতে হয় ও তাহার লাভালাভ কি হইতে পারে, তদ্বিষয় সকল আনুপূর্ব্বিক লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গের নিকট প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

পোলি অংশের ডাঙ্গা জমী পিপুল আবাদের জন্য প্রশস্ত, এইরূপ ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে জমী ভাঙ্গিয়া, বারমেসে চাষের দ্বারা সুন্দর রূপে চাষ করিয়া রাখিতে হয়। লঙ্কা আবাদের মত চাষ ও মই টানিয়া ক্ষেত খানিকে সমান ও পরিষ্কার করিয়া তাহার চারিদিকে দৃঢ়রূপে বেড়া বান্ধিতে হইবে। শ্রাবণ মাসের শেষভাগ হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত পিপুল মূল সংগ্রহ করিতে হইবে; মূল সংগ্রহ কালে এই সতর্কতা নিতান্ত

প্রয়োজন; পিপুল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় আছে; যে সকল কৃষক পিপুলের গাছ ও পত্র দেখিয়া জাতি পৃথক করিয়া অফলা পিপুল মূল পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মূল তুলিতে সক্ষম; সেইরূপ কৃষক দ্বারা যেন মূল তোলা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লওয়া হয়; নচেৎ এ প্রকার ঘটিবে, উত্তম গাছ হইবে কিন্তু পিপুল ফলিবে না।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণের বৃষ্টিতে ঐ জমির তাপ বহির্গত হইলে, ভাদ্র মাসের শেষাংশে যো বুঝিয়া আর একখান চাষ ও এক পালা মই টানিয়া সংগৃহীত পিপুল মূল এক হাত অন্তর অন্তর সারি বান্ধিয়া রোপণ করিতে হইবে। মূল রোপণের সঙ্গে সঙ্গে এভাবে হাপোরোত্তলিত লঙ্কা চারা সারি বান্ধিয়া রোপিত হইবে, সারির দুই দিকে দুইটী পিপুল মূল এবং মধ্যে মধ্যে লঙ্কা চারা বসিবে; এইরূপ পিপুল মূল ও লঙ্কা চারা একত্রে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপণের পর তিন সপ্তাহ পরে নিড়ানী দ্বারা নিড়াইয়া দিতে হইবে।

কিছুদিন পরে রোপিত পিপুল মূল হইতে নূতন নূতন ডগা বহির্গত হইতে লাগিল, লঙ্কা চারা গুলিও বেশ কুসি ছাড়িয়া ঝাড়াল হইতে লাগিল। ঘাস জঙ্গলের অবস্থা বুঝিয়া আর একবার নিড়াইয়া বেঁকো* দ্বারা চালা দিলেই লঙ্কা চাষের শেষ হইল। এই সময়ে সুপক্ক জয়ন্তী বীজ বিঘা প্রতি এক সের হিসাবে লঙ্কা ও পিপুল রোপিত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হইবে; জয়ন্তী বীজ বপনের সময় এই সতর্কতা চাই বীজ সকল যেন ক্ষেত্রের সর্ব্বস্থানে সমান রূপে পড়ে। স্থান বিশেষে ঐ নিয়মে ধঞ্চে বীজও ছড়াইয়া থাকে কিন্তু ধঞ্চে বীজ অপেক্ষা জয়ন্তী বীজই পিপুল আবাদের জন্য বিশেষ উপকারী। আশ্বিন মাসের মধ্যেই রোপিত জয়ন্তী বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া, গাছ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

লঙ্কা গাছগুলি ক্রমে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠিবে। লঙ্কা কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই সুপক্ক হইতে আরম্ভ হয়, নাগাইদ ফাল্গুন মাসের প্রথম পর্য্যন্ত পাকিয়া শেষ হয়। এই কালের মধ্যে

---

* মাটী সমান করিবার অস্ত্র বিশেষ।

লঙ্কা তোলা শেষ হইবে, কাঁচাগুলি হইতে সুপক্কগুলিকে বাছিয়া তুলিতে হইবে, অনন্তর লঙ্কা শুষ্ক করার নিয়মানুসারে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে।

এক্ষণে সমস্ত ক্ষেতের ফল-শূন্য লঙ্কা গাছগুলিকে এইরূপ সাবধানতার উপড়াইয়া ক্ষেত হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, যেন কোন মতে পিপুল লতাগুলি ও জয়ন্তী গাছ সকলের কোন অংশে ক্ষতি না হয়। তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। পিপুল লতা সকল পার্শ্বস্থ জয়ন্তী গাছসমূহে আশ্রয় করিয়া উঠিতে লাগিল; এ বৎসরে ইহার আবাদও শেষ হইয়া গেল। যে বৎসরে পিপুল রোপণ করা হয়, সে বৎসরে পিপুল ফলে না, সুতরাং বৎসরের ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য লঙ্কা চাষে যাহা আয় হয় তাহাতেই এবার সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যদি বৎসর গতিকে লঙ্কা ভাল রূপ জন্মে তাহাতেও বিলক্ষণ লাভ থাকে; ফলতঃ কম পরিমাণে লঙ্কা উৎপন্ন হইলেও কোন ক্রমে আবাদে ক্ষতি হইবেক না।

দেখিতে দেখিতে বর্ষ শেষ হইয়া পুনরায় নববর্ষ সমাগত হইল, এবৎসরে পিপুল ক্ষেতের কোন ব্যয় বাহুল্য বা আবাদের কোন বিশেষ পরিশ্রম নাই, কেবল জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের মধ্যে একবার উত্তম করিয়া নিড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট হইল। জয়ন্তী বৃক্ষাশ্রিতা পিপুল সকলে শ্রাবণ মাস হইতে পিপুল ফলিতে আরম্ভ করিবে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত শেষ হইয়া আসিবে। পিপুল সকল একেবারে ধরে না এবং এক সময়ে পক্ক হয় না; এক ধরিতেছে, এক পুষ্ট হইতেছে ও এক পাকিতেছে। সুপক্ক পিপুল উঠাইবার সময় পালাক্রমে ক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন পিপুলগুলিকে নির্ব্বাচন করিয়া তুলিতে হইবে, উত্তোলিত সুপক্ক পিপুলগুলিকে যে স্থানে সমস্ত দিনের রৌদ্র পায়, সেই প্রকার স্থানে পাতলা করিয়া ছড়াইয়া দিয়াও নাড়িয়া চাড়িয়া শুষ্ক করা ভিন্ন উহার আর কোন তদ্বির করিতে হয় না।

স্থান বিশেষের কৃষকেরা মালে বেশী ফলিবে বলিয়া ঐ সুপক্ক পিপুলকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উষ্ণ জলে ভাপাইয়া শুষ্ক করিয়া লয়; ভাপানতে উহার স্বাভাবিক গুণের অনেক তারতম্য হইয়া থাকে, সুতরাং না ভাপাইলেই ভাল হয়।

একবার পিপুল রোপণ করিলে, উপর্য্যুপরি পিপুল লতা সকল, তিন বৎসর কাল ফল প্রসব করিয়া থাকে; এই সময়ের মধ্যে কেবল প্রতিবর্ষে বেড়া বান্ধা ও নিড়ানীর উপর লক্ষ্য থাকিলেই যথেষ্ট হইল। পিপুল ফলন প্রথম ও শেষ বৎসর হইতে মধ্য বর্ষে অধিক হইয়া থাকে, ঐ তিন বৎসরের গড় পড়তায় কাঠা প্রতি ত্রিশ সের হইতে পঁয়ত্রিশ সের পর্য্যন্ত ফলন হইয়া থাকে।

বৎসর গতিকে উহার দরেও ইতর বিশেষ দেখা যায়, ৪০৲ টাকা হইতে ন্যূন কল্পে ২০৲ টাকার নিম্ন দরে কখনই বিক্রীত হয় না। এস্থলে পিপুল চাষের আয় ব্যয় বিবরণ স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমি উপরোক্ত ফলনের ও দরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, কাঠা প্রতি অর্দ্ধ মণের এবং কুড়ি টাকা দরের হিসাবে ইহার আয় ব্যয় স্থিরতর করিলাম।

বিঘা প্রতি।*

আয়—		ব্যয়—	
লঙ্কা ১২/০ মণ			
দর ৩৲ টাকার হিসাবে	৩৬৲	লাঙ্গল ও মৈ দেওয়া খরচ	৪৲
প্রঃ বৎসরের পিপুল ১০/০ মণ		পিপুল মূল সংগ্রহের খরচ	১৲
দ্বিঃ বৎসরের পিপুল ১০/০ মণ		বেড়া বান্ধাই খরচ	২॥০
তৃঃ বৎসরের পিপুল ১০/০ মণ		লঙ্কা চারা ও পিপুল মূল রোপণের খরচ	৸০
মোট পিপুল ৩০/০ মণ		নিড়ানী ও চালা দেওয়া খরচ	২৲
দর ২০৲ টাকার হিসাবে	৬০০৲	লঙ্কা তোলার খরচ	৸০
মোট আয়	৬৩৬৲	লঙ্কা গাছ তুলিয়া ফেলা খরচ	॥০
বাদ ব্যয়	৩৫৶০	জমীর খাজনা বাবদ খরচ	২।০
নিট আয়	৬০০৸৶০	অপর তিন সনের পিপুল	১৩৷০
এতদ্ভিন্ন পিপুল মূল ও জয়ন্তী কাষ্ঠেও লাভ আছে।		আবাদের মোট খরচ	২১।৶০
		সর্ব্বসাধারণে খরচ	৩৫৶০

শ্রীপ্যারীমোহন গোস্বামী,
মণিখালি কৃষি পাঠশালা।

* এই হিসাব জেলা নদীয়ার মধ্যে মেহেরপুর সবডিবিজানের অধীন মণিখালি কৃষি বিদ্যালয়ের কৃষি ক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত।

শণ।

শণ একটী বিশেষ লাভ জনক ফসল। অধিক পরিমাণে আবাদ করিতে পারিলে কৃষক যথেষ্ট লাভবান হয়েন, তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম দেশেই শণের অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার রজ্জু বিলাতে অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শণের আবাদও অতি সহজ। কার্ত্তিক মাসে ভূমিতে কিছু রস থাকিতে ৭।৮ বার চাষ দিতে হয়, তৎপর প্রতি বিঘায় ২৮ সেরের হিসাবে শণবীজ ছড়াইয়া দিয়া একবার চাষ ও দুইবার মৈ দিতে হয়। শণ নদীর ধারের কিছু বালুকাযুক্ত মাটিতে ভাল জন্মে। তদ্ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার ভূমিতেই সার দিলে শণ জন্মিয়া থাকে। শণের গাছ অতিশয় ঘন হওয়া ভাল, গাছগুলি বিরল হইলে শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি দ্বারা গাছ বিস্তৃত হয় এবং লম্বা অধিক হয় না, সুতরাং ভাল শণ জন্মে না।

মাঘ মাসে যদি ভূমি শুষ্ক হইয়া শণের অনিষ্ট হয় তবে ক্ষেত্রে জল সেচন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ফাল্গুণ মাসের শেষে অথবা চৈত্রের প্রথমে শণ বীজগুলি পরিপক্ক হইয়াছে জানিয়া গাছগুলি উঠাইয়া অগ্রভাগের বীজযুক্ত শাখাগুলি কাটিয়া লইয়া গাছগুলি জলে পাটের ন্যায় পচান দিতে হয়। সপ্তাহ পচানের পরই কাচিয়া লইতে হয়। শণ পচাইবার সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত উহা প্রত্যহ দেখিতে হয় যেন বেশী পচান না হয়। প্রত্যেক বিঘায় সাধারণতঃ ৩/০ মোণ শণ জন্মিয়া থাকে। ইহার মূল্য পূর্ব্বে কম ছিল। বৎসরে ১০।১১।১২ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। ন্যূনকল্পে ৯৲ টাকা মোণ বিক্রয় হইলেও ২৭৲ টাকা এক বিঘা ভূমির শণ দ্বারা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ইহার ব্যয় বীজ ২৲, সার ॥০, চাষে ১॥০, ভূমির খাজনা ১৲, শণ উঠান ও কাচান খরচ ৪৲, মোট ৯৲। বাকী লাভ ১৮৲ টাকা। এরূপ লাভের দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি একেবারে শূন্য হইয়া নানাবিধ কষ্টে জীবন যাপন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

শ্রীমধুসূদন আচার্য্য।

মেষ্টা।

পাটের ন্যায় মেষ্টাও এক প্রকার রজ্জু উৎপাদক উদ্ভিদ্। পাট ও মেষ্টা প্রায় এক আকারের গাছ। পাটের ন্যায় মেষ্টারও আঁশে দড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। এজন্য মেষ্টাও একটী আদরের ফসল। বাঙ্গালা দেশের সকল জেলাতে মেষ্টা ভালরূপ জন্মে না। বঙ্গ দেশের মধ্যে পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে ঢাকা, পাবনা এবং ফরিদপুরে অধিক পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে।

মেষ্টার চাষ করিলে সকল প্রকার মাটিতেই আবাদ চলিতে পারে। তবে দোঁয়াস এবং পলি মাটিতেই ভালরূপ জন্মে। বর্ষাকালে যে ভূমিতে জল দাঁড়ায় এরূপ ক্ষেত্রে মেষ্টা চাষ করা ভাল নহে, কারণ জলে ডুবিয়া গেলে চারা সকল মরিয়া যায়। মেষ্টার জমিতে গোবর এবং মহিষের বিষ্ঠার সার দিলে ফসল অধিক হইয়া থাকে।

সচরাচর মাঘ মাসের শেষ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মেষ্টা বুনিয়া থাকে। যে বৎসর চৈত্র মাসে ভালরূপ বৃষ্টি না হয়, সে বৎসর বৈশাখ মাসেও বুনিতে চলিতে পারে। বিঘা প্রতি প্রায় চারি সের বীজ হইলেই বুনানি কার্য্য শেষ হয়। মেষ্টার জমিতে বীজ বুনিবার পূর্ব্বে লাঙ্গল ও মই দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। জমিতে নিয়মিত সার প্রদান এবং উপযুক্ত পরিমাণে পাইট করিতে পারিলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেষ্টার চারা অন্যূন ৪।৫ আঙ্গুল বড় হইবার পূর্ব্বে মই দ্বারা জাউনী দিতে হয়। জাউনী দেওয়ার তিন চারি দিন পরে একবার ভূমিতে বিদা দেওয়া আবশ্যক। বিদা দেওয়ার সময় যদি বৃষ্টি হয় তবে ক্ষেত্রের মাটী শুকাইলে বিদায় কাজ চলিতে পারে। সময় সময় আবার এরূপও দেখা যায় যে, অত্যন্ত বৃষ্টিতে চারাসমূহ বেশ সতেজ হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। এরূপ ঘটনা হইলে বিদা না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত চারা তিন চারি ফুট বড় না হয়, ততদিন দুই একবার নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্ষেত নিড়াইয়া না দিলে চারার অবস্থায় অধিক ঘাস জন্মিয়া তাহা বাড়িতে দেয় না। এজন্য ক্ষেত পরিষ্কার রাখা উচিত।

পাট, শোণ এবং মেষ্টার গাছ যত লম্বা হয় ততই আঁশের পক্ষে ভাল। কারণ লম্বা গাছে লম্বা আঁশ হইয়া থাকে। লম্বা আঁশের মূল্য অধিক। এজন্য যে সকল গাছে অধিক ডাল পালা হয় তাহাতে ভালরূপ আঁশ হয় না। মেষ্টার গাছ পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন আর কোন প্রকার পাইট করিতে হয় না। মেষ্টার ফুল এবং ফল হইবার পূর্ব্বে গাছ কাটা উচিত। গাছে ফুল ও ফল ধরিলে আঁশ ভাল হয় না।

সকল স্থানে এক সময়ে গাছ কাটিবার উপযুক্ত হয় না। কারণ বীজ বুনানির অগ্রপশ্চাৎ অনুসারে আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইয়া থাকে। গাছের গোড়া কাটিয়া একস্থানে জমা করিতে হয় এবং প্রত্যেক গাছের মাথার সরু অংশ আন্দাজ এক হাত প্রমাণ কাটিয়া ফেলিতে হয়। গাছের মাথা কাটিয়া বাদ দেওয়ার কারণ এই যে ঐ সরু অংশ হইতে ভালরূপ আঁশ বাহির হয় না। গাছের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া অন্যূন বিশ আটি এক সঙ্গে বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। জলে ফেলিবার সময় ঐ আটির মধ্যস্থলে এবং অগ্রভাগে তিনটী বাঁশ প্রবেশ করাইয়া দিয়া ভেলার মত করিতে হইবে। এই ভেলার উপর কতকগুলি কর্ত্তিত অগ্রভাগ বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর মাটি কিম্বা কলাগাছ চাপা দিতে হইবে। মেষ্টার আটি এরূপ ভাবে চাপা দিতে হইবে তাহার উপর যেন পাঁচ ছয় ইঞ্চি জল দাঁড়াইতে না পারে। এই নিয়মে মেষ্টা পচানকে "মেষ্টা জাগ দেওয়া" কহে। স্রোতের জল অপেক্ষা বদ্ধ জলে পচাইলে আঁশের পক্ষে ভাল হয়।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মেষ্টা জাগে রাখিয়া ১০.১১ দিন পরে ঐ আটি হইতে একটী গাছ তুলিয়া লইয়া আঁশ টানিয়া দেখিবে যখন গাছের মাথা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত একটানে সহজে আঁশ উঠিয়া আসিবে তখন জানিতে হইবে যে জাগ দেওয়া শেষ হইয়াছে। ঠিক এই অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থায় মেষ্টা তুলিয়া আঁশ বাহির করিলে ভালরূপ সূতা উঠিবে না।

মেষ্টার ছাল তুলিবার প্রণালী অতি সহজ। আটি হইতে ১০।১২টা গাছ এক সঙ্গে লইয়া হাতে ধরিয়া গোড়ার দিকে এক হাত পরিমাণ রাখিয়া উরুদেশে ঠেস দিয়া—ভাঙ্গিতে হইবে। অনন্তর গোড়ার ছাল গাছ হইতে

পৃথক্ করিলে দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া জলে আছড়াইতে হইবে। এইরূপ ভাবে আছড়াইবে তাহাতে ছাল ও মাটি পৃথক হইয়া পড়িবে। ছাল পৃথক হইলে তাহা পরিষ্কার করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। মেষ্টা শুকাইতে হইলে বাঁশের আড় বাঁধিতে হয় সেই আড়ে উহা তিন চারি দিন ঝুলাইয়া রাখিলে উত্তমরূপ শুষ্ক হইয়া উঠে। এই অবস্থায় বৃষ্টির জল লাগিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য বৃষ্টির সম্ভব দেখিলে তাহা ঘরে বিছাইয়া রাখিতে হয়। মেষ্টা উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে তাহা বস্তাবন্দী করিতে হয়।

পাটের ন্যায় মেষ্টাও বিঘা প্রতি ১৫ মণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু যত্ন করিলে ফলন অধিক হইতে পারে। মেষ্টার আবাদের সময় কোন গোলযোগ নাই, কিন্তু গাছ কাটা, পচান এবং ছাল তুলিবার সময় অনেকগুলি লোকের আবশ্যক হইয়া থাকে। এজন্য বিবেচনা করিয়া মেষ্টার চাষ করিলে ভাল হয়।

বাঁশ।

বাঁশের উপকারিতা পাঠক সমাজে অবিদিত নাই। গৃহী মাত্রেরই বাঁশের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। ইষ্টকালয় সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, উহা প্রচুর ব্যয় সাধ্য বলিয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত নহে। খড়ের ঘর প্রস্তুত করিতে হইলে বাঁশ একটী বিশেষ উপাদান। বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে বাঁশ জন্মে না। দেশ ভেদে নানাবিধ বাঁশ দৃষ্টিগোচর হয়, রঙ্গপুর জেলায় বিশেষতঃ তৎপূর্ব্ব ভাগে, তুষাপাহাড়, কড়াই বাড়ী ও মহেন্দ্রগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে কয়েক প্রকার বাঁশ বিশেষ বিখ্যাত। আথলা ও বিশ বাঁশ প্রভৃতি কয়েক প্রকারের বাঁশ রঙ্গপুর ভিন্ন অন্যত্র অনেক কম, এমন কি অনেক স্থানে সেরূপ বাঁশ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাঁশ নানা প্রকার; তন্মধ্যে বড় বাঁশ ও মাথলাই সর্ব্বপ্রধান। তদ্ব্যতীত, তারাই, তরলা, নলবাঁশ, বিশ বাঁশ ও বেক প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকারের

বাঁশ আছে। বড় বাঁশ সিলা অল্প, ফাঁপা, ভারী এবং ঘন গাঁইট হইয়া থাকে, অধিকাংশ লোকেরাই কাঠের পরিবর্ত্তে এই বাঁশ ঘরে ঘরে লাগাইয়া থাকেন। আখলা বাঁশ দ্বারা ঘরের চাল প্রস্তুত অতি উত্তমরূপে হইয়া থাকে ইহাকে ইচ্ছা মত সহজে চিরিয়া অনেক কার্য্য করিতে পারা যায়, ইহা চিরিয়া চেপ্‌টা আকারে তারের মত সুন্দর সূং তুলিয়া চাটাই বা ধাড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, এই চাটাই দ্বারা ঘরের বেড়া অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন ডোম জাতীয়েরা এই বাঁশের দ্বারা ডালা, চালা, পাখা ইত্যাদি অতি নিপুণতা সহিত নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বড় বাঁশ, আখলার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা নিতান্ত দুরূহ, যেহেতু বড় বাঁশকে আখলার ন্যায় সহজে যথেচ্ছ চিরিয়া পাতলা ও মিহি সূং প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। সুতরাং বাঁশের সূক্ষ্মতম সুদৃশ্য কারুকার্য্যে উহা ব্যবহার হয় না, এই জন্যেই অনেকে আখলা বাঁশের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। নল বাঁশ দ্বারা ফরসীর নল প্রস্তুত হয় এই বাঁশের আকার যে ক্ষুদ্র হয় তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না, এই বাঁশের ঝাড় অতি সুন্দর, এ জন্য অনেক স্থানের পথের ধারে ধারে ঐ বাঁশের ঝাড় রাখিতে দেখা যায়। বিশ বাঁশ, এই বাঁশ পাহাড়ের স্থানেই অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই বাঁশ বড় বাঁশের আকার অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র কিন্তু গঠনে প্রায় একরূপ এবং অপেক্ষাকৃত সিলা অধিক। এই বাঁশ দ্বারা চালের রুয়া অতি উত্তম হইতে পারে এবং মধ্যকার ছিদ্র অতি সূক্ষ্ম ইহার অতি উত্তম যষ্টি হয়। বড় বাঁশের মধ্যেও এই প্রকার আর এক গঠনের বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা ছাতির ডাঁটী প্রস্তুত হয়। অনেক "বড় বাঁশ" এই সংজ্ঞাতে মনে করিতে পারেন, বাঁশ বড় ও মোটা হইলেই, বুঝি বড় বাঁশ নাম হয়, বাস্তবিক তাহা নহে; যাহার ফাঁপ অল্প, সিলা ও ঘন গাঁইট শক্ত এবং পুরু, গুণে বড় তাহাকেই সাধারণতঃ বড় বাঁশ কহা যায়। তাহাতে সরু, মোটা, লম্বা, খাট ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। তারাই বাঁশ সরু, পাতলা, বেশী ফাঁপা এই বাঁশের বাঁশী প্রস্তুত হয়। তরলা বাঁশ খুব ফাঁপা, মোটা এবং গাঁইট ঘন বটে কিন্তু সিলা ও পুরু নয় বলিয়া ইহা দ্বারা বড় বাঁশের কাজ চলিতে পারে না। ইহার

চোঙা খুব উত্তম হয় এবং ছেঁচিয়া ঘরের টাটী দিতে পারা যায়, বেরু বাঁশের যষ্টি অতি প্রসিদ্ধ এই বাঁশের কঞ্চিতে কাঁটার সদৃশ খোঁচা থাকে, বাঁশ আকারে বৃহৎ নহে এবং প্রায় সরল হয় না, সেক দিয়া ইহার লম্বা লাটি তৈয়ার হয় এবং ছড়ি ও মাছ ধরা ছিপ খুব উত্তম হয়। অনেক স্থানে এই বেরু বাঁশের যষ্টি নবোপনীত ব্রহ্মচারীর দণ্ড স্বরূপে ব্যবহৃত হওয়ার নিয়ম আছে। যে কয়েক প্রকার প্রসিদ্ধ বাঁশের বিষয় লিখিত হইল তৎভিন্ন যৎসামান্য বৈলক্ষণ্য বিশিষ্ট যে কয়েক প্রকার বাঁশ আছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা বাহুল্য। বাঁশ সংসারের একটী মহোপকারী সামগ্রী, গৃহস্থ মাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে অন্ততঃ ৫।৭ ঝাড় করিয়া বাটীর কিয়দ্দূরে ইহা রাখা কর্ত্তব্য। বাটীর একেবারে সন্নিকটে বাঁশ রাখা নিতান্ত অবৈধ; বাঁশ ঝাড়ের সমীপবর্ত্তী স্থান সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে সুতরাং স্বাস্থ্যের উহা বিশেষ হানিকারক। বিশেষ বাঁশঝাড় পরিষ্কার রাখা দুরূহ; বাঁশপাতা পচা ও নানাবিধ কারণে উহার বায়ু অতীব দূষনীয় হইয়া উঠে। আবার বাটীর সম্মুখে রাখা ত আরও অবৈধ। রংপুর জেলার অধিকাংশ স্থানে যে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, বাটীর ঘরের পার্শ্বে সম্মুখে বাঁশ ঝাড় বাঁধিয়া রাখা তাহার একটী অন্যতর কারণ বলিতে হইবে। বাটীর পার্শ্বে সম্মুখে বাঁশ ঝাড় রাখিলে চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দর্শনে একেবারে বঞ্চিত হইতে হয়। বাঁশ পুঁতিবার সময় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পুঁতিতে পারিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। অনেকে বলেন যে "বাটীর পশ্চিমে বাঁশ পূবে হাঁস (পুষ্করিণী) উত্তরে গুয়া দক্ষিণে ধূয়া" সেই বাড়ী উত্তম। গৃহস্থ মাত্রেরই এই নীতির অনুসরণ করা বিধেয়, বাটীর পশ্চিমে কিয়দ্দূরে বাঁশ রাখা মন্দ যুক্তি নয় ইহাতে রৌদ্র পাওয়ার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত থাকে না।

বাঁশ রোপণের কোন কষ্ট নাই, বর্ষাকালে বাঁশের ঝাড় হইতে কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া বড় একটা মূলের চাপ সহ একটা বাঁশ ৩।৪ হাত পরিমাণে রাখিয়া কাটিয়া উঠাইয়া লইয়া উপযুক্ত স্থানে পুঁতিতে হয়, যে বাঁশটী পুঁতিতে হয়, তাহার কর্ত্তিত মুখ কোন একটা বস্তু দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া উচিত, নচেৎ কর্ত্তিত মুখ শুষ্ক হইতে হইতে গোড়া পর্য্যন্ত শুকাইলে

উহা বাঁচিবার পক্ষে ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভব। বাঁশ পুঁতিয়া ২।০-২॥০ হাত উঁচু করিয়া গোড়ায় মাটি দিতে হয়, বাঁশ বাঁচিয়া উঠিলে বৎসর বৎসর গোড়ায় কিছু কিছু নূতন মাটি দিলে বাঁশের চরম যত্ন করা হয়। ছেঁয়ে মাটির বাঁশ ভাল হয় না এবং শুধু বালুকাতেও ইহা ভাল হইতে দেখা যায় না, দোঁ-আশা মাটিই বাঁশের পক্ষে বিশেষ উপকারক। ঝাড়ের বাঁশ বিবেচনা পূর্ব্বক কাটিতে হয়, কমপোক্তা বাঁশ কাটা উচিত নয় এবং যে বাঁশের গোড়া দিয়া তেউড় বাহির হইয়া তেউড় বড় হয় নাই, তাহাকে "পোয়াতি বাঁশ" কহে এ বাঁশ কাটাও নিতান্ত অবৈধ, অনেকে বাঁশ টানা-টানির ভয়ে সম্মুখে বিনাশ্রমে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই কাটিয়া থাকে, ইহাতে ঝাড় শীঘ্র উচ্ছিন্ন যায়, পাকা বাঁশ ঝাড়ে রাখাও উচিত নহে, তাহাতে বাঁশের বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হয়। বাঁশ বাগান গৃহস্থের যৎসামান্য লাভকর নহে, গৃহস্থ পাঠকগণ নিজ নিজ সাংসারিক অবস্থা ভাবিয়া দেখুন, ঘর দরজা করিতে গেলে বাঁশে কত টাকা লাগে, প্রত্যেক গৃহস্থের ৫।৭টী বাঁশ ঝাড় থাকিলেই বৎসরের কাজ চলিয়া ১০।১৫ টাকার বিক্রয়ও করা যাইতে পারে, কিন্তু বাঁশ বিক্রয় করিতে গৃহস্থের সাবধান হওয়া উচিত বেশী বাঁশ কাটিলে ঝাড় নষ্ট হয়, একথা তাঁহাদের অজ্ঞাত নাই, "দাতার নারিকেল বকিলের বাঁশ" একথা অনেকেই জানেন। ঝাড়ের পোতা বাঁশ ভিন্ন কাটা একেবারেই ক্ষান্ত থাকা উচিত। সকল বাঁশ অপেক্ষা বড় বাঁশের মূল্য অধিক, কোন কোন স্থানে ঐ বাঁশের ৬।৭ টা এবং রঙ্গপুরে ১৬।১৭ টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে।

কোন কোন বাঁশের ভিতরে চা-খড়িবৎ শ্বেতবর্ণ এক প্রকার পদার্থ জন্মে তাহাকে বংশলোচন কহে। উহা চিকিৎসকগণ ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করেন, কাশ রোগে বংশলোচন একটী প্রধান মুষ্টিযোগ ও ধাতু দৌর্ব্বল্যাদিতে বংশলোচন অতি উত্তম ঔষধ, ইহা অতি মূল্যবান জিনিস। কলিকাতায় উহার তোলা ॥০ দরে বিক্রয় হয়। বাঁশের ভিতরকার জল রক্তোদোষের একটী অমোঘ ঔষধ।

কোন কোন স্থানে বাঁশের ফুল হইতে দেখা গিয়াছে উহা গৃহস্থের

অমঙ্গলের পূর্ব্ব সূচনায় হইয়া থাকে সাধারণের এরূপ কিম্বদন্তী আছে, কিন্তু ইহা কতদূর প্রামাণিক তাহা বলা বাহুল্য। বাঁশের ফুল কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধক বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই. কেবল বিগতবর্ষে দিনাজ-পুর অঞ্চলে বাঁশের ফুল প্রচুরপরিমাণে যাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ঐ সকল ফুল হইতে তণ্ডুল সদৃশ এক প্রকার পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল, শুনাগিয়াছে তৎপ্রদেশীয় লোকে ঐ সকল ফুল হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া ব্যবহার করিয়াছিল। বোধ হয়, বাঁশের ফুল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে উহা অবশ্যই কোন প্রয়োজন সাধক হইত। কোন কোন স্থানে খড় অভাবে বাঁশের পাতায় সুন্দর পরিপাটিরূপে ঘরের ছাড়নীতে ব্যবহার হইতে দেখা যায়, বাঁশের গায়ের খোলটী দ্বারা কৃষকগণ বৃষ্টি নিবারণের জন্য ঝাঁপি প্রস্তুত করে। কোন কোন স্থানে আবার নিম্নলিখিত প্রকারে বাঁশের তরকারী ব্যবহৃত হয়।

বাঁশের তেউড় ফুটিয়া বাহির হইবার সময় একটা হাঁড়ী বা পাতিল ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়, কতকদিন পর যখন তেউড় পাতিলের মধ্যে ব্যাপিয়া পাতিলকে উঁচু করিয়া তুলিবে, তখনই পাতিল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহার মধ্যে বাঁধা কপি সদৃশ কোমল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে, উহার তর-কারী পাক করিয়া অনেকেই সুখাদ্য বলিয়া সাদরে ব্যবহার করিয়া থাকেন, অপেক্ষাকৃত ছোট জাতের বাঁশেরই উহা করা যাইতে পারে। অনেক পাঠক বোধ করেন বাঁশের তরকারী নূতন কথা শুনিলেন, পাঠকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন ইহা আমাদের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার।

দেশীয় কুল গাছে বিলাতী কুল ফলাইবার উপায় ।

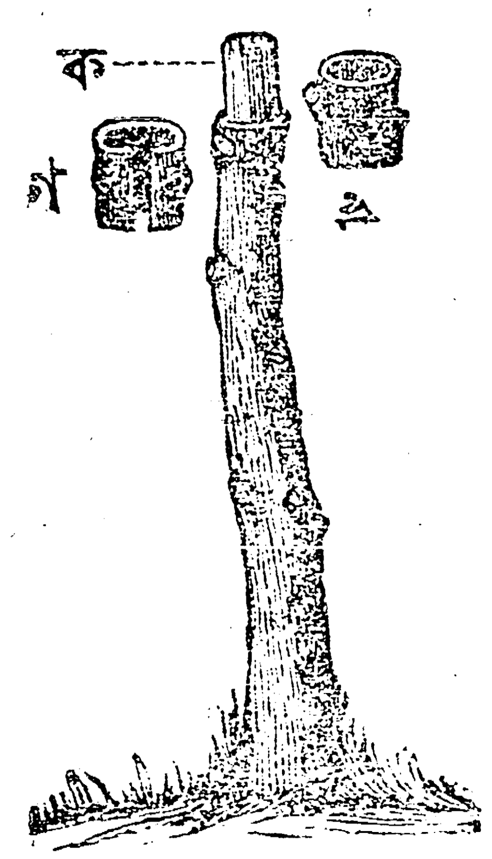

এক প্রকার গাছে অন্য প্রকার ফুল বা ফল হইতে দেখিলে সকলেরই মনে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কি প্রকার উপায়ে তাহা হইয়া থাকে, তাহা জানা থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই ঐরূপ করিতে পারেন। সকল প্রকার ফুল বা ফলের গাছে যে ঐরূপ হইতে পারে তাহা নহে। অন্যান্য গাছ অপেক্ষা কুল গাছে অতি সহজ উপায়ে ভিন্নরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারা যায়।

দেশীয় কুলগাছে বিলাতী বা অন্য জাতীয় কুল ফলাইতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত রূপ প্রক্রিয়া করিতে হয়।

মনে কর একটী বড় রকমের দেশী কুলের গাছ আছে, সেই গাছে প্রতি বৎসর কুল ফলিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ গাছে বিলাতী কুল ফলাইতে হইবে। যত বড় কেন কুলের গাছ হউক না তাহাতেই ঐরূপ নিয়ম খাটিতে পারে। যে গাছে বিলাতী কুল ফলাইতে হইবে। প্রথমে সেই গাছের গোড়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। গাছের কি চারার অবস্থা কি প্রবীণ অবস্থা সকল অবস্থায়ই ঐরূপ ফলাইতে পারা যায়। কুল গাছের গোড়া কাটিয়া দিলে সেই কর্ত্তিত স্থান হইতে নূতন নূতন হুক বা অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। সেই হুকে চুঙ্গি কলম করিতে হয়। কুলের যে নূতন হুক বাহির হইবে, সেই হুকের মাথায় চুঙ্গি কলম করিবার নিয়ম; চুঙ্গি কলম করিতে হইলে

অন্য আর একটী গাছের ডাল হইতে চোক তুলিয়া ঐ নূতন হুকে বসাইতে হয়। এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে চোক যে গাছে বসাইতে হইবে উভয়েরই যেন অবস্থায় মিল থাকে। এজন্য দেশী ও বিলাতী কুলের এক সময়ে ডাল কাটিয়া দেওয়া উচিত নহে। কারণ বিলাতী কুলের ডাল কাটিয়া দিলে পুনরায় ডাল পালা বাহির হইতে যে পরিমাণে সময় লাগে, দেশী কুলের ডাল কাটিলে নূতন ডাল হইতে সে পরিমাণে সময় লাগে না। বৎসরের মধ্যে সকল সময়ে ডাল কাটিয়া চুঙ্গি কলম প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। সকল কাজের পক্ষেই এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সেই সময়ে অনুষ্ঠিত হইলে প্রায় বিফল হইতে হয় না। ফাল্গুন চৈত্র মাসেই কুলের চুঙ্গি কলম করিবার প্রশস্ত সময়। বর্ষাকালে কুলের কলম ভাল হয় না। এজন্য ফাল্গুন মাসে বিলাতী কুলের ডাল কাটিতে হইবে এবং তাহার ১৫ দিন অন্তর দেশী কুলের গোড়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ অগ্র পশ্চাৎ করিয়া ডাল কাটিলে উভয় গাছের নূতন হুক ঠিক চুঙ্গি কলম করিবার অবস্থায় উপস্থিত হইবে। এ সম্বন্ধে অনেক স্থানের মালীদিগের মনে একটী সংস্কার আছে, তাহারা সকল দিন ডাল কাটে না। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের দিন বিলাতী কুলের ডাল কাটিয়া থাকে এবং তদ্‌পরবর্ত্তী শুক্লপক্ষের প্রতিপদে আবার দেশী কুলের গাছ কাটিয়া থাকে। এইরূপ অগ্র পশ্চাৎ করিয়া কাটিবার কারণ তাহারা আদৌ অবগত নহে। উভয় গাছের ডাল কাটিলে এক সময়ে যে কলম প্রস্তুতের উপযুক্ত হয় না তাহা তাহারা জানে না। উভয় ডাল এক সময়ে কাটিয়া দিলে এই দোষ হয় যে, আগে যে ডাল বাহির হয় অর্থাৎ দেশী কুলের নূতন ডাল কিছু শক্ত হইয়া উঠে। আর বিলাতী কুলের ডাল খুব নূতন অবস্থায় থাকায় তাহা অত্যন্ত নরম থাকে; সুতরাং কঠিন ও নরমের সঙ্গে সহজে ভালরূপ মিল হয় না। সমান অবস্থায় পরস্পর যেমন মিল হয়, অবস্থার বিসদৃশ হইলে সেরূপ হয় না।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অগ্রে দেশী কুল গাছের গোড়া কাটিয়া দিতে হইবে, গোড়া কাটিলে তাহা হইতে অনেকগুলি হুক বাহির হয়।

সেই হুকের মাথায় চড়ক গাছের মাথার ন্যায় মোচ তুলিতে হয়। অর্থাৎ মাথার উপর তিন চারি আঙুল পরিমাণ স্থানের নীচে গোল করিয়া একটী দাগ দিতে হইবে, তাহার পর উপর হইতে সেই দাগ পর্য্যন্ত লম্বা ভাবে চিরিতে হইবে এবং ছুরীর মাথায় করিয়া আস্তে আস্তে সেই ছাল তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ছাল তুলিবার সময় অতি সাবধান হইয়া আস্তে আস্তে উহা তুলিতে হইবে অর্থাৎ কোন রকমে যেন কাষ্ঠে আঘাত লাগিতে না পায়। দেশী কুলের ঐরূপ করা হইলে, বিলাতী কুলের ডালের মাথা হইতে সেই পরিমাণে ডাল কাটিয়া লইতে হইবে এবং অতি সাবধানে সেই কর্ত্তিত ডালের মধ্য হইতে কাষ্ঠভাগ তুলিয়া ফেলিতে হইবে, ভিতরের কাঠ তুলিলে সেই কাষ্ঠের আবরক ছাল একটী চুঙ্গির ন্যায় হইবে। সেই চুঙ্গি অতি সাবধানে পূর্ব্বোক্ত দেশী কুলের সেই ছাল তুলা স্থানে বেশ করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। চুঙ্গিটী এরূপভাবে বসাইতে হইবে, যেন ভিতরের কোন দিকে কোনরূপ ফাক না থাকে। এই প্রস্তাবের প্রথমে যে একটী ছবি আঁকা আছে, সেইটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলেই চুঙ্গি কলমের নিয়ম বুঝিতে পারিবেন। যে গাছটী দাঁড়াইয়া আছে, তাহা কর্ত্তিত স্থান হইতে নূতন হুক বাহির হইয়াছে। ঐ হুকের ক নামক স্থান হইতে ছাল তুলিয়া চড়ক গাছের ন্যায় করা হইয়াছে। আর খ নামক বিলাতী কুলের চোক তুলিয়া দেখান হইতেছে। ডালের যে অংশে যে পাতা কিম্বা সরু ফেকড়ী থাকে, তাহা কাটিয়া কিম্বা ছিঁড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কারণ তাহা কাটিয়া দিলে চোকে আঘাত লাগিবার সম্ভব এবং হয় ত সেই আঘাতে তাহা নষ্টও হইতে পারে। এজন্য তাহা অমনি রাখিতে হয়। আর দেশী কুলের হুকের গায়ে যে পাতা প্রভৃতি থাকে, তাহা ভাঙ্গিয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না। এজন্য এই চিত্রে দেশী হুকে কোনরূপ পত্রাদি দেওয়া হয় নাই।

এই প্রস্তাবে যে চিত্র দেখান হইয়াছে, তাহাতে দুইটী চোক তুলিয়া রাখা হইল। খ নামক চোকটী কলমের ঠিক উপযুক্ত। আর গ নামক চোকটী অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, কারণ তাহার মধ্যস্থল চিরিয়া যাওয়াতে

তাহা লইয়া কলম বাঁধিলে কোন ফল হইবে না। এজন্য বিশেষ সাবধানের সহিত চুঙ্গি প্রস্তুত করিতে হয়। কাষ্ঠাংশ কঠিন হইলে ডাল তুলিতে অসুবিধা হইয়া থাকে। ডালের কিরূপ অবস্থায় চোক তুলিতে হয় তাহা বোধ হয় সকলে বুঝিতে পারিলেন। চুঙ্গি বসাইবার সময় আর একটী বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। চুঙ্গির চোক পূর্ব্বদিকে থাকিলে রৌদ্রের ভাগ অল্প লাগিয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রবল রৌদ্র লাগিলে চোক নষ্ট হইবার সম্ভব। যে দিন চুঙ্গি কলম করা হয়, তাহার অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাতার চোঙ্গা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

কুল গাছে চুঙ্গি কলম করিলে তাহাতে জল দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। জল দিলে বরং তাহা নষ্ট হইবার সম্ভব। কুলের এই কলমের অবস্থায় অধিক বৃষ্টি হইলে বরং অনিষ্ট হইয়া থাকে। যে বৎসর বেশ রৌদ্র পড়িতে থাকে এবং দক্ষিণদিক হইতে বাতাস বহে, সেই বৎসর এই কলম উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। চুঙ্গি বসাইবার প্রায় ১০।১২ দিনের মধ্যে কলম লাগিয়া যায়। কলম লাগিলে চুঙ্গির চোক হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে। এই অঙ্কুর ক্রমে ক্রমে মোটা হইয়া গাছের আকারে পরিণত হইলে তাহাতে বিলাতী কুল ফলিয়া থাকে। ফলন্ত এবং বড় গাছের গোড়া কাটিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মে কলম প্রস্তুত করিতে পারিলে এক বৎসরের মধ্যেই আবার সেই গাছ হইতে ফল পাওয়া যাইতে পারে। মূল গাছের গোড়া হইতে যদি অনেকগুলি হুক বাহির হয় তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে কয়েকটী সতেজ তদ্‌গমুদায় রাখিয়া অন্যান্য কম তেজী হুক কাটিয়া ফেলা উচিত। কারণ অধিক হুক থাকিলে এবং বেশী কলম বাঁধা হইলে রসের অল্পতা বশতঃ সকলগুলি সমান পুষ্ট হইতে পারে না। এজন্য একটী হুকে কলম বাঁধিয়া অপরগুলি কাটিয়া দিলে ভাল হয়।

বড় গাছ কাটিয়া ঐরূপ কলম প্রস্তুত হইলে তাহা আর অন্য স্থানে তুলিয়া পুঁতিবার আবশ্যকতা হয় না। লিখিত রূপ নিয়মে কলম বাঁধিলে

যে গাছ হইবে, সেই গাছে বিলাতী কুল ফলিতে থাকিবে। সকল স্থলেই যে দেশী কুলের বড় এবং ফলন্ত গাছ কাটিয়া ঐরূপ করিতে হইবে তাহা নহে। কুলের চারার অবস্থাতেও ঐরূপ করা যাইতে পারে। সচরাচর মালীরা যে সকল বিলাতী কুলের কলমের চারা বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমে দেশী কুলের আঁটিতে চারা তৈয়ার করিয়া এবং চারার বয়স এক বৎসর হইলে সেই চারার গোড়া অর্থাৎ মাটির উপর কিছু অংশ রাখিয়া অবশিষ্ট কাটিয়া ফেলে এবং সেই কর্ত্তিত স্থান হইতে অঙ্কুর বাহির হইলে সেই অঙ্কুরের মাথার চাল তুলিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে বিলাতী কুলের ডাল হইতে চুঙ্গি তুলিয়া তাহাতে বসাইয়া দেয়। এইরূপ নিয়মে তাহারা প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে কলমের চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। দেশী কুল যেরূপ গুণেরই হউক না কেন তাহাতে বিলাতী কুলের চোক বসাইলে, পূর্ব্বোক্ত গুণ পরিত্যাগ করিয়া বিলাতী কুলেরই গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে একটী কথা আছে, অত্যন্ত খারাপ কুলের সহিত ভাল কুলের কলম বাঁধিলে ক্রমে সেই ভাল কুলের গুণান্তর হইবার সম্ভব। কারণ যে গাছের চোক তুলিয়া কলম বাঁধিতে হয়, সেই গাছের সামান্য অংশ মাত্র থাকে, কিন্তু তাহার দেহ পোষণ, পত্র, মুকুল এবং ফলে রসাদি সঞ্চার মূল দেশী গাছ হইতেই হইয়া থাকে। সুতরাং মন্দ গাছের রস যোগে তাহার গুণান্তর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব। এজন্য একটু ভাল অবস্থায় অর্থাৎ যাহার ফল ভাল সেইরূপ দেশী কুল গাছের সহিত বিলাতী কুলের কলম বাঁধা উচিত।

কলম প্রস্তুত হইলে তখন তাহা তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিতে চলিতে পারে।

সকল প্রকার মাটিতে কুল ভাল হয় না। এঁটেল মাটিতে কুল ভাল হইয়া থাকে। অনেক সময় আবার এরূপও দেখা গিয়াছে যে চারার অবস্থায় পোকা লাগিয়া পাতা নষ্ট করিয়া দেয়। ঐরূপ পোকা লাগিলে পাতা কাটিয়া ক্রমে ক্রমে গাছ মারিয়া ফেলে। যে স্থানে ভালরূপ রৌদ্র না লাগিতে পায়, সেই স্থানে চারায় পোকা লাগিয়া থাকে। ভাল রকম

রৌদ্র লাগিলে প্রায় পোকা ধরে না। গাছে পোকা লাগিলে গোবর গুলিয়া দেওয়া উচিত, গোবর গুলিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

চুঙ্গি কলম করিবার নিয়ম অতি সহজ, চেষ্টা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি উহা প্রস্তুত করিতে পারেন। কুলের কলম প্রস্তুত করিবার নিয়ম জানা থাকিলে সকলেই আপন আপন বাড়ীতে কলমের চারা প্রস্তুত করিয়া ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।

আম্র সম্বন্ধে কএকটী কথা।

আম্র যেরূপ উৎকৃষ্ট ফল ইহার উন্নতি সম্বন্ধে যতই আলোচনা হয় তাহাই ভাল। সচরাচর যে সকল আম্র দেখিতে পাওয়া যায়, উন্নতি করিতে পারিলে তৎসমুদায়ের আকারগত এবং আস্বাদনের যে বিস্তর উন্নতি হইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা দেশ মধ্যে আম্র রোপণ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা হইতেছে এজন্য অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আম্র ফলিতে দেখা যাইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র আঁটির চারার উপর গাছ প্রস্তুত করার নিয়ম প্রচলিত ছিল, ততদিন বিশেষ উন্নতি দেখা যাইত না। কারণ আঁটির চারায় মূল গাছের অনেকটা গুণের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। আমরা দেখিতেছি দেশমধ্যে কলমের চারা প্রস্তুত আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিস্তর উপকার হইতেছে। প্রতি বৎসর যে পরিমাণে কলমের চারা হইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে আর কিছু দিন পরে দেশ মধ্যে আঁটির গাছ আর হইবে না। কারণ আঁটি পুঁতিলে অধিক দিন বিলম্বে গাছে ফল ধরিয়া থাকে, আবার সেই ফল যে মূল গাছের ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণ প্রাপ্ত হইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই এই জন্য লোকে আহ্লাদের সহিত কলমের গাছ রোপণ করিয়া থাকে।

এদেশের অনেককেই দেখা যায় তাঁহারা আম্র খাইতে ভাল বাসেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান রাখেন না। যাহা সকলে ভাল বাসিয়া থাকে, তাহার উন্নতি করিতে যদি আবার সকলের চেষ্টা ও যত্ন হয় তাহা

হইলে যে কি পর্য্যন্ত উন্নতি সাধিত হয় তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। ধনী লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা অধিক মূল্য দিয়া আম্র খরিদ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা প্রতি বৎসর যে পরিমাণে অর্থ আম্র খরিদ করিতে ব্যয় করেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ অর্থ দ্বারা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র নানা স্থান হইতে আনাইয়া দেশমধ্যে কলম উৎপাদন করাইলে আম্রের স্থায়ী উন্নতি করিতে সমর্থ হইতে পারেন। উত্তরপাড়া নিবাসী জমীদার বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আম্র সম্বন্ধে বিস্তর অনুসন্ধান লইয়া উহার কলম প্রস্তুত করাইতেন ; তিনি কেবল মাত্র কলম প্রস্তুত করাইয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। এই সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব লিখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা সাধারণের উপকারার্থে সেই প্রস্তাবের আবশ্যকীয় অংশ এস্থলে গ্রহণ করিলাম।

১। বিশেষ যত্ন করিলেও আঁটি জাত বৃক্ষ হইতে প্রায়ই পূর্ব্ব সদৃশ অর্থাৎ আসল আম্রের ন্যায় ফল উৎপন্ন হয় না বরং অনেক অংশে মিষ্টতাদি গুণের অভাব হইয়া থাকে, এজন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যোড় কলমের সৃষ্টি করিয়া সেই অভাবের দূরীকরণ করিয়াছেন। যে বৃক্ষে যোড় কলম বাঁধা যায় তাহার ফল তত্তুল্য হইয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় না।

২। আঁটি পুঁতিলে বৃক্ষ জন্মে এবং কেহ কেহ আম্রের দুই পার্শ্ব হইতে দুই চাকলা তুলিয়া অবশিষ্ট আঁটির সহিত অংশ পুঁতিয়া থাকেন কিন্তু উক্ত উভয়বিধ বৃক্ষেরই ফল আসল আম্রের ন্যায় হয় না।

৩। উত্তম হউক বা অধমই হউক সকল প্রকার আম্রের আঁটি জাত চারা হইতেই যোড় কলম হইতে পারে ইহা চারার গুণ ধারণ না করিয়া, যে বৃক্ষে কলম বাঁধা যায় তাহারই গুণ আশ্রয় করে। যে চারা দ্বারা উক্ত কলম প্রস্তুত হয় তাহা দেড় বা দুই বৎসরের হওয়া আবশ্যক নতুবা উত্তম কলম হয় না।

৪। প্রথমতঃ আঁটির চারা ২ বা ৩ মাসের হইলে মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া তাহার মূল শিকড় অনুমান ৬ ছয় ইঞ্চি হইতে ৯ ইঞ্চি রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ উন্নমন করিয়া অর্থাৎ উপরিভাগে মুচিড়িয়া তুলিয়া দিতে হয়,

তদনন্তর ঐ অবস্থায় পুনর্ব্বার মাটিতে পুঁতিয়া কলম বাঁধিবার এক মাস পূর্ব্বে ঐ চারা তুলিয়া মাটির টবে পুরাতন গোময়ের সার সংযুক্ত মৃত্তিকা পুরিয়া তাহাতে বসাইবে। উক্ত মূল শীকড় মুচিড়িয়া দিবার কারণ এই যে টবে বসাইবার সময় মূল শীকড় ৯ ইঞ্চির অধিক থাকিলে চারা মরিয়া যায়। টবে চারা ১৫ দিবস রাখিয়া কলম বাঁধিতে হয়।

৫। যে গাছের ডালে যোড় কলম বাঁধিবে তাহার অর্থাৎ সেই ডালের নিকট ভারা বান্ধা আবশ্যক ; কিন্তু ডাল মৃত্তিকার অতি নিকটে থাকিলে ভারার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ যে কোন রূপে টব থাকিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। চারা সরু বা মোটাই হউক বৃক্ষের ডাল তদ্রূপ অর্থাৎ সরু চারা হইলে সরু ডাল, মোটা চারা হইলে মোটা ডালের আবশ্যক। উভয়ে এক রূপ না হইলে ভাল রূপ কলম হয় না। সুধার ইংরাজি ছুরী দ্বারা টব স্থিত চারার অনুমান ৬ বুরুল নাং এক ফুটের উপরে আন্দাজী তিন বুরুল ঐ চারার অর্দ্ধ পরিমাণ চাঁচিয়া ফেলিতে হয় এবং যে ডালে কলম বাঁধিবে তাহারও ঐরূপ তিন বুরুল অর্দ্ধেক চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে, পরে ঐ দুইটী একত্র সংযোগ করিয়া শণের টুইল গুতলী দ্বারা উপর নীচে ও মধ্য স্থান তিনটী বন্ধন দিতে হয়।

৬। এক বৃক্ষে এক জাতীয় বিবিধ ফলের উৎপত্তি অতিশয় আমোদকর, এজন্য উক্ত রূপে একটী চারায় ক্রমান্বয়ে তিন বা চারিটী বৃক্ষের ডাল বাঁধিলে এক বৃক্ষেই তিন চারি প্রকার আম্র ফল জন্মে ; কিন্তু সচরাচর একটী ডাল বাঁধাই রীতি, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে উত্তম ফল ফলিয়া থাকে।

৭। ১৫ দিনের পরে ৩ মাসের মধ্যে যোড় কলম প্রস্তুত হয় পশ্চাৎ ঐ যোড় কলমের চারার উর্দ্ধ অংশ এবং ডালের নিম্ন ভাগ কাটিয়া তদবস্থায় ১০ বা ১৫ দিবস টবে রাখিয়া ২৫ ফুট অন্তর চারি চৌকা ১ হাত গর্ত্তে কিঞ্চিৎ পুরাতন গোময় যুক্ত মৃত্তিকা স্থাপন পূর্ব্বক টব ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ব মৃত্তিকার সহিত কলম বসাইতে হয় এবং কলমের যোড় মৃত্তিকা হইতে অন্যূন অর্দ্ধ হাত উপরে রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপে কলমের চারা বসান হইলে যদি অতিশয় রৌদ্র লাগে তবে তাহাতে ১০।১৫ দিন কোন প্রকার আচ্ছাদন

দেওয়া উচিত। যে ভূমিতে চারা বসান যায়, তাহা উত্তম রূপে কর্ষিত অর্থাৎ চসা গোঁড়া হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা বৃক্ষ সতেজ হয় না, ভিটায় অর্থাৎ যেখানে পূর্ব্বে ঘর ছিল তথায় চারা পুঁতিলে মরিয়া যায়, এবং যথাযোগ্য স্থানে পুঁতিয়াও যদি গোড়ায় দেওয়ালের মাটী সংযোগে হয় তবে তাহাও বিনষ্ট হয়।

৮। সকল ঋতুতেই কলম প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে বর্ষাই উত্তম কাল। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে প্রত্যহ জল সেচন করিলেও অপেক্ষাকৃত কাল বিলম্ব হয়। সুযোগ্য মালী কর্ত্তৃক উত্তম রূপে প্রস্তুত হইলে কাল বিলম্বের সম্ভব থাকে না এবং যোড় কলমও রীতি মত হইয়া থাকে।

৯। যোড় কলম বর্ষাকালে মৃত্তিকাতে বসাইলে জল দিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, অথচ কলমও মারা যায় না; কিন্তু শীত বা অন্য কোন কালে বসাইলে প্রত্যহ টিনের ঝরণা দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে জল সেচন করিতে হইবে. এইরূপে তিন চারি বৎসর জল সেচন করিলে এবং মধ্যে মধ্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা কোঁড় দ্বারা কিম্বা অন্য কোন রূপে অল্প পরিমাণে খুঁড়িয়া দিলে চারা সতেজ হইয়া বাড়িয়া উঠে। সরিষার খইল এক মাস কাল মাটির ভিতর পচাইয়া তাহার সহিত খুর মাটী মিশাইয়া অল্প পরিমাণে তিন বা চারি মাস অন্তর ঐ চারার চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। যোড় কলম এক বৎসর কাল মৃত্তিকায় পোতা হইলেই মুকুল অর্থাৎ বউল বহির্গত হয়. এই মুকুল না ভাঙ্গিয়া দিলে উহা হইতে ফল জন্মে, কিন্তু এই প্রকারে অর্থাৎ অল্প কালের মধ্যে ফল হইলে বৃক্ষ রীতি মত বাড়ে না; এজন্য অনেকেই পোঁতার পর ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত বউল ভাঙ্গিয়া দেন। বৃক্ষ ৩ বা ৪ হাত উচ্চ হইলে বউল ভাঙ্গিবার আবশ্যক নাই।

১০। যদি বর্ষাকালে বাগানে জল না বসান যায়, তবে আঁটির বৃক্ষ কিম্বা যোড় কলম প্রচুর পরিমান ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না, এজন্য সমুদায় বাগানে আলুর বা বেগুনের ভূমির ন্যায় মাটির জুলি কাটাইলে তাহাতে

সমুদায় বৃষ্টির জল ক্রমশঃ বসিয়া যায়, অপর স্থানে বহির্গত হইতে পারে না। জুলি কাটার সময় শিকড়ে আঘাত লাগিলে বৃক্ষের তেজ হানির সম্ভাবনা; এ নিমিত্ত ঐ সময়ে যাহাতে শিকড় কাটা না যায় তদ্বিষয়ে সযত্ন হইবে। বৃক্ষের গোড়ায় অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা না থাকে অর্থাৎ বাগানের অন্য মৃত্তিকার সহিত বৃক্ষ মূলের মৃত্তিকা সমান ভাবে থাকাই আবশ্যক।

১১। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে কড়ায়া ধরিলে বৃক্ষের মূলে জল সেচন না করিলে রৌদ্রের উত্তাপে ঐ সকল কড়ায়া পড়িয়া যায়, এ জন্য ঐ সময়ে জল সেচন কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাসে বাগানের সমুদয় ভূমি কোদাল দিয়া বা অন্য কোন মতে খুঁড়িয়া তৃণাদি শূন্য করত মৃত্তিকা সমান করিয়া দিতে হয়।

১২। পাড়িবার দোষে উত্তম আম্রও বিস্বাদ হয় এ জন্য আম্রের পক্বাবস্থায় জাল আঁকশী দিয়া নাড়া চাড়া করিলে যদি সহজেই আম্র ঐ আঁকশীর ভিতরে পড়ে তবে তাহা গ্রহণপূর্ব্বক বিবেচনা মত ২।১ দিন ঘরে রাখিয়া ভক্ষণ করিলে অমৃত তুল্য সুস্বাদ বোধ হয়।

১৩। যে সকল আম্র আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে পাকিয়া থাকে, তাহা জাল দ্বারা বেষ্টিত না করিলে পক্ষী এবং কাটবিড়ালী প্রভৃতিতে খাইয়া ফেলে। অতএব উক্ত রূপে ঘেরিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

১৪। কলমের বৃক্ষের মূল শিকড় স্বভাবতই ছোট হওয়ায় বৃক্ষের বল আঁটির বৃক্ষ অপেক্ষা অল্প হয় এ জন্য অতিশয় ঝড় হইলে অনেক বৃক্ষই মৃত্তিকায় পতিত হইয়া যায়; কিন্তু ঐ পতিতাবস্থায় ক্রমশঃ বৃক্ষ বাড়িতে থাকে এবং তাহাতে বহুকালাবধি যথেষ্ট ফল ফলে।

১৫। যোড় কলম ব্যতীত গুল কলম নামক আর এক রূপ কলম প্রস্তুত হয়, তাহা হইতে পরিশ্রমের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং ঐ বৃক্ষও শীঘ্র বাড়ে না ও অধিকাংশ মরিয়া যায়, এ জন্য উহার ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে।

নানা প্রকার আম্রের বিবরণ।

১। সকল আম্রের মধ্যে বোম্বাই আম্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মিষ্ট রসে এ প্রকার সুস্বাদ আম্র আর কোন আম্র নাই।

২। ন্যাংড়া আম্র বানারস প্রভৃতি হিন্দুস্থানেতে হয়। কলিকাতায় ঐ আম্র বিক্রয় হইতে আইসে, ইং ১লা নাং ৩০ এ, আষাঢ় পাওয়া যায়, দাম ইং ৬৲ টাকা নাং ২৫৲ টাকা শত আম্র বিক্রয় হয়, মধ্যমাকার, এই আম্রের কলম কেহ কেহ বঙ্গ দেশে আনাইয়া বসাইয়াছেন।

৩। বোম্বাই আম্র সাত প্রকার তাহার কলম বোম্বাইয়ের এগ্রিকলচরেল সোসাইটী হইতে কলিকাতার এগ্রিকলচরেল সোসাইটিতে পাঠাইয়া দেয়, সেখান হইতে কলম লইয়া ক্রমশঃ সকলে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে। নিজ বোম্বাই সহরে সমুদ্রের ধারে এ পর্য্যন্ত প্রথম আঁটির কালু বোম্বাই বৃক্ষ জীবিত আছে কিন্তু তাহার ডাল পালা অনেক ভগ্ন হইয়াছে, সেই গাছের কলম হইতেই এক্ষণে সকল কাল বোম্বাই উৎপন্ন হইতেছে। বোম্বাই আম্রের রং কাল ও মধ্যমকার, দর ৬৲ টাকা নাং ২৫৲ টাকা শত আম্র বিক্রয় হয় এবং ইং ১লা নাং ৩০ এ, জ্যৈষ্ঠ ঐ আম্র বঙ্গদেশে পাওয়া যায় এবং আষাঢ় মাসাতে হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়; ঐ সাত প্রকার বোম্বাই আম্রের মধ্যে ছয় প্রকার আম্র প্রায় একই সময়ে হয় এবং মিষ্টতা ও আস্বাদন প্রায় তুল্য হয়, রঙের কিঞ্চিৎ প্রভেদ হয়, অতি সামান্য ইতর বিশেষ কিন্তু বাকী এক প্রকার ছোট খাজা বোম্বাই আম্র হয় এবং বৈশাখ মাসের ২০ শে, হইতে পাকিতে সুরু হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের ২০ শে পর্য্যন্ত থাকে এবং কাঁচার সময় এক প্রকার কাঁচা মিটা বলা হয়, এই আম্র শক্ত প্রযুক্ত জল খাইবার পক্ষে ভাল হয় এবং এই আম বাজারে বিক্রয় হয় না।

৪। ফজলি আম্র শ্রাবণ মাসে হইয়া থাকে ঐ আম অতি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎকায় এবং বাজারে ৩০৲ টাকা নাং ৫০৲ টাকা দরে এক শত আম্র বিক্রয় হয় ঐ আম্রের বৃক্ষ শ্রীরামপুরের রঘুনাথ গোস্বামী মহাশয়ের জমীদারীর ভিতর মালদহ জেলাতে আছে সেই স্থান হইতে কলম

আনাইয়া এক্ষণে কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম সকলেতে ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া আম্র ফলিতেছে।

৫। গোপালে ধোপা নামক এক প্রসিদ্ধ উত্তম আম্র জ্যৈষ্ঠ মাসে পাওয়া যায় রঙ্গদার হয় এবং বৃহৎকায় ও বাজারে ১৫৲ টাকা নাং ২৫৲ টাকা দরে এক শত আম্র বিক্রয় হয়। এই আম্রের আঁটির বৃক্ষ কলিকাতার দক্ষিণ বারুইপুর গ্রামে গোপালে ধোপা নামক এক ব্যক্তির বাটীতে হইয়াছিল সেই স্থানের মহাত্মা ৺রাজবল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় তাহার কলম তৈয়ার করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

৬। অন্যান্য আম্র নানা প্রকার আছে কিন্তু এক এক নামের কোন আম্র নানা স্থানে নানা প্রকার মিষ্টতা ও নানা প্রকার হইয়া স্বাদ হইয়া থাকে যেমন গোপালভোগ নামক আম্র কোন স্থানে ক্ষীরের মত স্বাদ হয় কোন স্থানে পাকা তালের মত স্বাদ হয় ও কোন স্থানে টক হয়; হিমসাগর আম্রও ঐরূপ হইয়া থাকে।

৭। যে সকল আম্র এ প্রদেশে অর্থাৎ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নামজাদা এবং উত্তম তাহার ফর্দ্দ লিখিত হইল। ইহার মধ্যে সকল আম্রই মিষ্টরসবিশিষ্ট এবং নানা প্রকার সুস্বাদু ও আঁশ নাই, কেবল মাত্র বড় বৈশাখী আম্রেতে কিছু আঁশ আছে এবং মিষ্টতা কিছু কম কিন্তু ঐ আম্র বৈশাখ মাসে অসময়ে পাকিয়া থাকে এজন্য বাজারে তাহার ১০৲ টাকা শতকরা দর, আর বৃন্দাবনি আম্রে অল্প আঁশ আছে তাহা আষাঢ় মাসে পাকিয়া থাকে, এই আম্র গৃহস্থপোষা যেহেতু তাহার বিস্তর ফলন হয়। এমন কি একটী বৃক্ষ বাড়ী থাকিলে তাহাতে ইং ফাল্গুন নাং আষাঢ় ৫ পাঁচ মাস আমসী, কাসুন্দী, অম্ল, মোরব্বা, পাকা আম্র সংসারে পরিপূর্ণ হয় এবং দিব্য সুস্বাদু ও মিষ্ট এবং প্রকাণ্ড বড় আম্র, বক্রী সমুদায় আম্রই উত্তম এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এই তিন মাসেতেই পক্ক হয়।

আম্রের বাগান করিতে হইলে অগ্রে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার চারিদিকে পগার দেওয়া উচিত। ক্ষেতের মাটি যদি ভাল না হয় তবে অন্য স্থান হইতে ভাল মাটি আনিয়া সমুদায় ক্ষেতে ছড়াইয়া দিতে হয়। চারা

রোপণের পূর্ব্বে সমুদায় ক্ষেত্রের মাটি সমান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। চারা পুঁতিবার সময় ক্ষেতে সমুদায় চারা শ্রেণী করিয়া রোপণ করিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রের মাটি ভাল না হইলে কেবলমাত্র যে ভূমির উপর কতক পরিমাণে মাটি ছড়াইয়া দিলে উপকার হয় তাহা বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ উপরিকার সামান্য মাটিতে গাছের পক্ষে বিশেষ উপকার হইতে পারে না। যেরূপ মাটিতে গাছ রোপিত হইয়া থাকে সেই মাটির গুণানুসারে ফলের উৎকর্ষ সাধিত হয়। কারণ মৃত্তিকা হইতে রস লইয়া বৃক্ষাদি বর্দ্ধিত এবং ফল পুষ্প পরিণত হইয়া থাকে। এজন্য অগ্রে মৃত্তিকার প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। মাঘ মাসে বাগানে এক একটী বড় বড় গর্ত্ত করিতে হইবে অর্থাৎ আন্দাজ ৩.৪ হাত গভীর এবং দুই তিন হাত প্রশস্ত গর্ত্ত করিয়া অন্য স্থানের ভাল মাটি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। যে মাটি দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিতে হইবে তাহাতে এক ভাগ দগ্ধ মাটি মিশাইতে হইবে। এইরূপ মৃত্তিকায় গর্ত্ত পূর্ণ হইলে তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে সেই মৃত্তিকাপূর্ণ গর্ত্তে আম্রের আঁটি বা চারা রোপণ করিলে অল্প দিনের মধ্যে গাছে অত্যন্ত তেজ হইয়া উঠিবে। বাগানের গাছ তেজাল হইলেই ভাল হয়। কারণ হীন তেজের গাছ ভালরূপ পরিপুষ্ট বা বড় আকারের ফল ধরে না। পিতা মাতা বলিষ্ঠ এবং নীরোগী হইলে সন্তান যেমন সুস্থকায় এবং উপযুক্ত আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্গণও সতেজ হইলে তজ্জাত ফল ও পুষ্প ইত্যাদি সম্যক আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। আম্রাদির উন্নতি করিতে হইলে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রের সতেজ বৃক্ষজাত ভালের আঁটি ও কলমের চারা রোপণ করা উচিত। কলমের গাছে ভালরূপ আম্র হয় বলিয়া তাহার পাইটাদি না করিলে ফলের আকারগত ও আস্বাদনের বিস্তর প্রভেদ হইতে দেখা যায়। এজন্য বাগান উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখিতে হয়। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া এবং বৎসরান্তে সার দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

নাম।	আদিতে কোন স্থানে হয়।	কোন সময়ে পক্ক হয়
১ নং, সুন্দর সাহা,	এগ্রীকলচরেল সো-সাইটী, কলিকাতা।	ইং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ নাং ১৫ আষাঢ়।
২ " ফিরোজাবলী,	"	জ্যৈষ্ঠ।
৩ " ক্ষীরসপাতি,	"	"
৪ " লার্জ্জ মালদহ,	"	"
৫ " গোপালভোগ,	"	ইং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, নাং ১৫ই আষাঢ়।
৬ " গোয়া,	এ, সো, কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
৭ " চকচকিয়া,	"	"
৮ " আগাবেগ,	"	"
৯ " ডিকুরুজ,	"	"
১০ " ভাদরিয়া,	"	
১১ নং, কপাট ভাঙ্গা.	[illegible]	

২০ ” গোপালে ধোপা,	বারুইপুর ২৪ পরগণা।	জ্যৈষ্ঠ।
২১ ” ফজলী,	মালদাহ জেলা।	শ্রাবণ।
২২ ” গোল বোম্বাই,	এ, শো, কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
২৩ ” থলো বোম্বাই,	”	”
২৪ ” শাদা বোম্বাই,	”	”
২৫ ” বড় বৈশাখী,	হুগলি জেলা।	ইং ১৫ই বৈশাখ নাং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ। আষাঢ়
২৬ ” বাটাবোড়া,	”	”
২৭ ” শাদাসিঁদুর,	”	”
২৮ ” কালো খাজা	”	”
২৯ ” রাঙ্গা খাজা,	”	জ্যৈষ্ঠ।
৩০ ” পরাণ কলে,	”	শ্রাবণ।
৩১ ” শ্রীরামপুর ফজলী,	মালদহ জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
৩২ ” সাহানশা,	হুগলী জেলা।	”
...ল প্রতাপপুর,	”	ভাদ্র।

...শ্রীরামপুর. ঠিকানা পাওয়া যায় না।

৪৫ ” গোলাপী শুঁড়	কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
৪৬ ” মৎছবা শুঁড়,	”	”
৪৭ ” গোয়া শুঁড়,	এ, শো, কলিকাতা।	”
৪৮ ” গোপাল ভোগ আলম বাজার,	” ২৪ পরগণা।	”
৪৯ ” হিম সাগর আলমবাজার,	”	”
৫০ ” ক্ষেতু বাবু আলম বাজার, ২৪ পরগণা।		”
৫১ ” বোম্বাই আলম বাজার, এ, শো, কলিকাতা।		”
৫২ ” বার মেসে আলম বাজার, ২৪ পরগণা।		”
৫৩ ” সাপসন,	হুগলী জেলা।	”
৫৪ ” আসমান তারা,	”	”
৫৫ ” ডালভাঙ্গা,	”	”
৫৬ ” পেটের আষাঢ়ে,	”	”
৫৭ ” বড় ক্ষীরে,	”	”
৫৮ ” ছোট ক্ষীরে	”	”
৫৯ ” সরিখাস,	”	

৬০ নং, ভাব...

৭১ "	এরবথনাট,	বোটেনিকেল গার্ডেন কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
৭২ "	বিষমটকো,	ত্রিবেণী বিষপাড়া হুগলী জেলা।	"
৭৩ "	মোচাবতী	আন্দুল অঞ্চলে পাওয়া যায়।	

রসুন।

ইহাকে কোন কোন স্থানে লসুনও কহিয়া থাকে। রসুন ব্রাহ্মণের অব্যবহার্য্য। পিয়াজ ও রসুন প্রায়ই এক প্রকার উদ্ভিদ্। বঙ্গ দেশের সকল স্থানেই রসুন জন্মিয়া থাকে। প্রতি বিঘায় প্রায় পঁচিশ মণ রসুন উৎপন্ন হয়। ক্ষেতে রসুনের ডাঁটা শুষ্ক হইলে বুঝিতে হইবে উহা তুলিবার উপযুক্ত হইয়াছে। মাটি হইতে রসুন তুলিয়া শিকড় কাটিয়া ফেলিতে হয়। ডাঁটা সমুদায় আটি বাঁধিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। অনন্তর ঐ ডাঁটা সমেত রসুন ঘরের আড়ায় সারি সারি করিয়া রাখিতে হয়। রন্ধনশালায় উহা রাখা উচিত নহে, কারণ ধূম লাগিলে রসুন নষ্ট হইবার সম্ভব।

...নের কোষ রোপণ করিলে তাহা হইতে চারা জন্মিয়া থাকে। পূ

...জন্য রাখিতে হয়। প্রত্যেক কোষ বা কোয়া পৃ

...নর সময়।

মাটির নীচে চাপা পড়িলে অঙ্কুর বাহির হয় না। আর মাটির উপর মুখ বাহির হইয়া থাকিলে রৌদ্রে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভব। এজন্য এই উভয় অবস্থার মাঝামাঝি নিয়মে রোপণ করা উচিত।

রসুন অঙ্কুরিত হইয়া ক্ষেতে অর্দ্ধ ইঞ্চি বড় হইলে একবার নিড়াইয়া দিতে হয়। পরে ক্ষেতের অবস্থা বুঝিয়া আর একবার নিড়াইয়া দিলেই চলিতে পারে। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে ক্ষেতে একবার জল সেচন করা আবশ্যক।

রসুন আবাদ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম লিখিত হইল, পিয়াজ আবাদেও প্রায় সেইরূপ নিয়ম। পিয়াজ ও রসুন রন্ধন মসলার কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। পিয়াজ অপেক্ষা রসুনে অতিশয় দুর্গন্ধ। বোধ হয় এই দুর্গন্ধের জন্যই হিন্দুদিগের মধ্যে উহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ জাতিতেই পিয়াজ রসুন ব্যবহার করিয়া থাকে। আজ কাল পিয়াজ ও রসুনের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে আবার মূল্যেরও হার বাড়িয়া উঠিয়াছে। রসুন চাষে লাভ নিতান্ত মন্দ নহে। রীতিমত চাষ আবাদ করিতে পারিলে কিছুতেই লোকসান হইবার কথা নহে।

আমরা দেখিয়াছি যাহারা পিয়াজ ও রসুন ব্যবহার করিয়া থাকে তাহারা স্ব স্ব বাড়ীতে কিয়ৎ পরিমাণ জমিতে পিয়াজ রসুন বুনিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য রসুনের অভাব পূর্ণ হইতে দেখা যায়। হিন্দুদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস যে তাহারা রসুন অখাদ্য বোধে উহার চাষ আবাদ করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহে। চাষ সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত উন্মত্ততার লক্ষণ বলিতে হইবে। ধর্ম্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধই নাই। যাহা লাভজনক তাহার চাষে উদাসীন থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

যই।

যই ঘোড়ার খাদ্যের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। এই শস্য বঙ্গ দেশ অপেক্ষা বিহার অঞ্চলে অধিক চাষ হয়। ইহার চাষে বেশ লাভ আছে। বিঘা প্রতি প্রায় আট মণ শস্য জন্মিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে যই বুনিতে হয়। বিঘা করা আন্দাজ পাঁচসের বীজ হইলেই এক বিঘা ভূমির আবাদ চলিতে পারে।

পলিযুক্ত জমিতেই যই উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। আউশ ধানের পক্ষে যেরূপ জমি প্রয়োজন, যই চাষের পক্ষে ঠিক সেইরূপ ভূমি হইলেই ভাল হয়।

যই চাষ করিতে হইলে অগ্রে ভূমিতে ৪।৫ বার চাষ দিতে হয়। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে একবার লাঙ্গল দিয়া উহা বুনিতে হইবে এবং বপনের পর মই দিয়া মাটি সমান করিয়া দিতে হইবে। বীজ হইতে যখন চারা আন্দাজ পাঁচ ছয় ইঞ্চি বড় হইয়া উঠিবে, সেই সময় একবার নিড়ান আবশ্যক। ক্ষেতে চারা ঘন হইলে ফলন অধিক হয় না। এজন্য অন্ততঃ এক এক ফুট অন্তর এক একটী চারা রাখিয়া অপর চারা এবং ঘাস মুথা প্রভৃতি নিড়াইয়া দিতে হইবে।

যই চাষ সম্বন্ধে আর কোনরূপ পাইট করিতে হয় না। চৈত্র মাসে ক্ষেতে শস্য পাকিয়া উঠে। ধান্যাদি পাকিলে যেরূপ করিয়া কর্ত্তন ও মর্দ্দন করিতে হয়, যই চাষ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ নিয়ম। যই কাটিবার সময় বৃষ্টি হইলে শস্য পচিয়া যাইবার সম্ভব এজন্য কাটা ও মাড়ার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। যই পাকিয়া উঠিলে তাহা রৌদ্রে ভাল করিয়া শুষ্ক করিতে হয়। কারণ ভালরূপ শুষ্ক না হইলে শস্য পৃথক করিতে ব্যাঘাত জন্মে।

ঘোড়ার খাদ্যের জন্য যে পরিমাণে যই ব্যবহার হইতেছে, তাহাতে বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র উহার চাষ আবাদ হইলে কৃষকদিগের একটী লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে। বিহার প্রদেশে প্রতি বৎসর বহুল পরিমাণে যই চাষ হওয়াতে তত্রত্য কৃষকদিগের বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে।

আঢ়কী বা অড়র।

অড়র দাউল আমাদের দেশের অন্নের একটী প্রধান উপকরণ সামগ্রী, ইহা অনায়াসে বলিতে পারা যায়; এবং দাউলায় যে, মনুষ্য শরীরের পুষ্টিসাধক বস্তু, এটিও প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমাকে অধিক কিছু বলিতে হইবে না। এরূপ প্রায় নিত্য আহারীয় দ্রব্যের আবাদ প্রণালী ও লাভালাভের বিষয় সকল, পাঠকবর্গকে অবগত করাই, আমার চাষীলেখ্যনীর প্রধানতম উদ্দেশ্য।

বাণচড়া ভিন্ন, প্রায় সকল প্রকার উচ্চ লাল ভূমিতে অড়হর উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। তবে আবাদের গতিকে ফসলোৎপন্নের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পৃথকরূপে উহার আবাদ করিতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। একটা না একটা অপর ফসলের সঙ্গেই অড়রের আবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায়, আউশ ধান্য, ভুরা, কৃষ্ণতিল ও সাঁখীতিলের সহিত অড়রের আবাদ হইয়া থাকে। বেহার প্রদেশে পাটনা, দানাপুর, জাহানাবাদ প্রভৃতি স্থান গুলিতেও ভাদুই ফসলের সঙ্গে উহার আবাদ হয়। প্রধানতঃ অড়হর দুই প্রকার; প্রথম মাঘী, দ্বিতীয় চৈতিলী, এই দুয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত চৈতিলীর ফলন কিছু বেশী এবং দানা পুষ্টল হয়, স্বাদের ও গুণের ইতর বিশেষ আছে। ধান্য যেমন নানা বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়, অড়রও তেমনি শ্বেত, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি বহু রঙ্গের দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান বিশেষে ঐ কৃষ্ণ অড়রকে "শনি আইরী" বলিয়া অভিহিত করে। এতদ্ভিন্ন মুর্শিদাবাদ মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি স্থান সকলে, তুত ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে আর এক প্রকার অড়র জন্মে; তাহা মাঘী বা চৈতিলীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে, বার মাসই প্রস্তুত হয়; এই অড়রকে টোঞর বলে। ইহার আকৃতিতে মাঘী ও চৈতিলী হইতে দানা এক একটী প্রায় তিন গুণ বড়, আকৃতি কেন, আবাদগত, বর্ণগত অনেক বিভিন্নতা আছে তাহা আবাদ সময়ে বিশেষ করিয়া বলিব।

উপরোক্ত লাল ভূমিকে আশুধান্যের আবাদের মত করিয়া, উত্তমরূপ

সাময়িক চাষ ও মই দ্বারা জমী প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। নূতন জমী হইলে সার দিবার প্রয়োজন হয় না; বৈশাখী যোয়ে পুনর্ব্বার দোয়ার চাষ দিয়া, ধানের বীজ বিঘা প্রতি।৫ পোনর সের, মাষী চৈতিলী যে অড়র বপনের ইচ্ছা হয়; তাহার বীজ প্রতি বিঘায় ৷৷০ অর্দ্ধ সের হিসাবে চাষে প্রস্তুত জমীতে ঐ দুই বীজ এক সঙ্গে বপন করিয়া মই দ্বারা ধান্যড়র বপিত জমী সমান করিয়া দিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে জাওলা * বহির্গত হইলে; মই, বিদা, নিড়ানী দ্বারা ক্রমে আউশ ধানের সমস্ত কারাকিত শেষ করিয়া দিলে, "এগড়" † বুনান হইলে শ্রাবণের শেষ বা ভাদ্রের প্রথমেই ধান্য পাকিয়া উঠে, যদি "নাম্‌লা" ‡ বুনন হয় তবে ভাদ্রের শেষ হইতে আশ্বিনের প্রথমেই সুপক্ক হইয়া থাকে, ক্ষেত্রের সমস্ত অড়র গাছগুলিকে রাখিয়া, কাস্তে দ্বারা ধান কাটিয়া প্রণালীমত মাড়িয়া তাহার শস্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল। ধানের পোয়ালগুলিকে গো মহিষাদির খাদ্য জন্য রাখিয়া দিবে। এখন ক্ষেত্রের রক্ষিত অড়র গাছগুলি, গো মহিষাদিতে কোন মতে নষ্ট করিতে না পারে, ইহাই এখনকার প্রধান লক্ষ্য, নচেৎ আর কোন ইহার কারাকিত নাই।

যদি বৈশাখী যো না পাওয়া যায়, তবে পূর্ব্ব-কর্ষিত শুষ্ক ক্ষেত্রে, আর একবার চাষ দিয়া পূর্ব্ব পরিমাণানুসারে উভয় প্রকার বীজ একত্রে ছড়াইয়া, মই দ্বারা জমী সমান করিয়া রাখিতে হয়। কিছুদিন পরে বৃষ্টি হইলে জাওলা বাহির হয়; সময় বুঝিয়া পূর্ব্বমত প্রণালীতে মই, বিদা, নিড়ানী দ্বারা সমস্ত কারাকিত শেষ করিয়া দিলে ধান ও অড়রের উৎপন্নের বিশেষ কিছু হানি হয় না। এরূপ প্রকারের আবাদকে স্থান বিশেষে "কাঁকড়ী" ¶ যোয়ের আবাদ বলিয়া থাকে; যদি ভূমিতে কিছু রস থাকে তাহা হইলে

* শস্যের গাছকে জাওলা বলিয়া থাকে।

† অগ্রের নাম এগড় কহে।

‡ শেষের নাম নাম্‌লা।

¶ বৃষ্টি হইবার আশয়ে শুষ্ক ক্ষেত্রে বীজ বপন।

তাহাকে "রস-কাঁকড়ী" বলে, রস-কাঁকড়ী আবাদে শস্যোৎপন্নের অনেক হানিকর হয়। আবার কোন কোন স্থানে অগ্রে যো মত আউশ ধান্য বুনান করিয়া জাওলা বাহির হইলে বিদা দিবার সময় পৃথকরূপে অড়র বীজ জাওলা ক্ষেতে ছড়াইয়া ও অড়র উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে উৎপন্নের বিশেষ কোন হানি হয় না।

ভুরার সহিত অড়র প্রস্তুত করিতে হইলে, যো মত লাল জমীতে দোয়ার তেয়ার চাষ করিয়া, বিঘা প্রতি দুই সের ভুরার বীজ ও তিন পোয়া মাষী অড়রের বীজ একত্রে বপন করিয়া মই দ্বারা জমী সমান করিয়া দিতে হইবে। ৭।৮ দিন পরে উভয় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইলে, যো বুঝিয়া বিদা, নিড়ানী দ্বারা কারাকিত করিয়া দিলেই উভয় ফসল জন্মাইতে পারে। শ্রাবণ মাসের মধ্যে ভুরা পক্ক হইলে, অড়র গাছগুলিকে রাখিয়া উহা কাটিয়া মাড়িয়া সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। যদি "সেটে" ভুরা বুনন হইয়া থাকে তবে আষাঢ় মাসেই পাকিয়া থাকে। সেটে ভুরা অর্থাৎ যে জাতীয় ভুরা বপন কাল হইতে সাইট দিনে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শস্যহীন ভুরার গাছগুলিও গো মহিষাদির উত্তম খাদ্য।

কৃষ্ণতিল কিম্বা শাঁখীতিলের * সহিত যে অড়র আবাদ করিয়া থাকে; তাহাকে "গুড়ুলে" অড়র বলে। এ অড়র চৈতিলী অড়রের জাতীয়; শ্রাবণ মাসের শেষে কিম্বা ভাদ্র মাসের প্রথম পক্ষে পচান জমীতে আবশ্যক মত চাষ করিয়া, উক্ত দুই তিলের বীজের মধ্যে যে বীজ বুনন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা বিঘা প্রতি অর্দ্ধ সের এবং গুড়ুলে অড়রের বীজ এক সের পরিমাণ এই দুই প্রকার বীজ একত্রে বপন করিয়া, মই দ্বারা বপিত ক্ষেত্র সমান করিয়া দিলেই ইহার কারাকিত শেষ হইয়া গেল। ধান ভুরার মত বিদা নিড়ানি দ্বারা অন্য কোন প্রকার কারাকিতের আবশ্যক হয় না। তিলের পরম শত্রু আটাকীট, আটাকীটকে স্থান বিশেষে শোয়া বা শুঁয়ো পোকা বলিয়া থাকে।

* স্থান বিশেষে শাঁখী তিলকে সাহেবতিলও বলিয়া থাকে।

এই কীট কচি তিল পত্র খাইতে বড় ভালবাসে, যে তিলের জমীতে আঁচা ধরে তাহার শস্য হয় না। গাছগুলিকে এককালে নষ্ট করিয়া ফেলে। যেমন মনুষ্য মাত্রেরই সাময়িক সাংক্রামক রোগ অপরিহার্য্য; তেমনি উদ্ভিজ্জ জগতে নৈসর্গীক নিয়মে সাময়িক রোগ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বারান্তরে আমি এই বিষয়টি পাঠকবর্গকে বিশেষরূপে অবগত করাইব। অগ্রহায়ণ ও পৌষের মধ্যে তিল পক্ক হইবার প্রকৃত সময়, যদি বৎসর গতিকে তিল ভাল জন্মায়, তবে অড়র গাছগুলিকে রাখিয়া তিল কাটিয়া তাহার যাগ ও শুষ্কাদি ক্রিয়া দ্বারা শস্য সংগ্রহ করিতে হয়। তিলের শস্য হীন গাছ ও অবশিষ্টাংশ যাহা থাকে, তাহা পোড়াইয়া কৃষকের বস্ত্র পরিষ্কার জন্য ক্ষার প্রস্তুত করিয়া লয়।

প্রিয় পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন না, এবার টৌঞের অড়রের আবাদ অতি সংক্ষেপেই বলিব। ইহার আবাদের নিমিত্ত বিশেষ কোন জমী নির্ব্বাচন করিয়া আবাদ করিতে দেখি নাই। নূতন বাগান পুষ্করিণীর এবং তুঁতক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে; চারি পাঁচ হাত অন্তর, সারি বান্ধিয়া দেড় ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি মাটির নীচে প্রত্যেক স্থানে দুইটী তিনটী করিয়া, উহার বীজ কার্ত্তিক মাসের মধ্যে রোপণ করিয়া দিলেই, আবাদ শেষ হইয়া গেল। ক্রমে টৌঞের গাছ সকল পরিবর্দ্ধিত হইয়া, শস্যশালী হইবার সময় প্রাপ্ত হইলে; বার মাস শস্য প্রদান করিতে থাকিবে। এই অড়রের গাছ উর্দ্ধে ৫.৬ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, পত্র মাঘী চৈতিলী অড়রের অপেক্ষা বড়, শুঁটীগুলিও বড় হয়। একবারের রোপিত বৃক্ষে, দুই তিন বৎসর শস্য জন্মে। ইহার শস্য সংগ্রহ বিষয়ে এইরূপ নিয়ম দেখিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে গাছ সকল হইতে সুপক্ক শুঁটীগুলি নির্ব্বাচন করিয়া তুলিয়া, প্রাতঃসময় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত যে স্থানে রৌদ্র লাগিতে পায়, এরূপ স্থানে শুঁটী শুষ্ক করিতে দেয়। শুষ্ক হইলে সহজেই শুঁটীগুলি ফাটিয়া উহার শস্য বাহির হয়। এইরূপে এক মাসের সংগ্রহ হইলে, শস্যের পরিমাণ অধিক হইবে তখন সংসার ব্যয়ের নিমিত্ত দাউল প্রস্তুত ও ক্রমে বিক্রয় করিয়া থাকে। সদ্য গাওয়া ঘৃত সংযোগে ইহার দাউল অতি সুখাদ্য হয়। প্রত্যেক গাছে বৎসরে চারি সের হইতে

ছয় সের পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে। পাঠক মহাশয়গণ! এই হিসাবে তুঁতক্ষেত্রে বাগানের ও পুষ্করিণীর চারি ধারে কত গাছ হইতে পারে এবং কত পরিমাণে টৌঞের জন্মিতে পারে, একটা অনুমান করিয়া বুঝিবেন। ইহার আবাদে সমুদায়ই লাভ আছে, কোন ব্যয় নাই; সময়ে গাছ সকল শুষ্ক হইলেও রন্ধন কাষ্ঠের কার্য্য করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে সকল অড়রের আবাদ শেষ হইয়া গিয়াছে, উক্ত রক্ষিত অড়রগাছগুলি সময়ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ফুল ফলে সেই সেই ক্ষেত্রসমূহে একপ্রকার শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসের বিশেষ ঝড় এবং শীত সময়ের দক্ষিণে হাওয়া ও সুন্দররূপ শিশির না পাইলে তদানুসঙ্গিক উৎপাত হইতে রক্ষা পাইলেই অড়র উত্তম জন্মিল। মাঘী অড়র যেগুলি, মাঘ মাসের মধ্যে গাছের পত্র সকল শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। শুঁটীগুলি শুষ্কপ্রায় হইতে লাগিল। গাছে উহার দুই চারিটী শিম্বী ফাটিয়াছে পরিলক্ষিত হইলেই, অড়হুর সুপক্ক হইল। ক্ষেত্রে অধিক শুঁটী শুষ্ক হইলে, উহা চটিয়া শস্যের অপচয় সম্ভাবনা আছে। এইরূপ সুপক্ক অড়র গাছ সকল কাস্তে দ্বারা ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া, শস্য সংগ্রহ স্থানে এই ভাবে মান্দি * দিতে হইবে যে, কর্ত্তিত গাছের গোড়াগুলি নীচের দিকে রাখিয়া খাড়া করিয়া রাখিতে হইবে। উহা ভালরূপ শুষ্ক হইলে, ক্রমে মান্দিস্থিত প্রত্যেক শুষ্ক গাছ লইয়া, তাহার নীচের দিকে দুই হস্তে ধরিয়া শস্য সংগ্রহ স্থানে, সজোরে বারম্বার আছড়াইতে হইবে। দেখিতে পাওয়া যাইবে, যখন গাছ হইতে কতক শুঁটী ফাটিয়া শস্য বাহির হইতেছে, কতক শুঁটী না কাটিয়া কেবল ছিমিগুলি পড়িতেছে, এইরূপ এককালে সকল শুঁটি পতিত হইলে, তখন শুঁটি হীন গাছটীকে কিছু দূরে নিঃক্ষেপ করিতে হইল। এই প্রকারে সকল শিম্বী সংগ্রহ হইলে, তাহা পুনরায় নব, গোম মর্দ্দনের ন্যায় করিয়া, মলন †

* কর্ত্তিত অড়র গাছগুলিকে গোলাকারে এক স্থানে রাখাকে মান্দি দেওয়া বলে।

† গো মহিষাদির পায়ের দ্বারা শস্য বহিষ্করণের নাম মলন।

মাড়িয়া, যখন দেখা যাইবে, সকল শুঁটি হইতে অড়র সকল বাহির হইয়াছে, তখন শিম্বীর পার্শ্বদ্বয়ের খোলা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটো কাটা হইতে বায়ু সংযোগে পরিষ্কৃত করিয়া লইলেই অড়র শস্য প্রস্তুত হইয়া গেল। শুঁটি হীন গাছগুলি রন্ধন কার্য্যের নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া গেল। খোলাগুলি গো মহিষাদির খাদ্য হইল। শেষ বক্তব্য এই শস্য সংগ্রহ কালে কোন মতে বৃষ্টিতে উহা ভিজিতে না পায়, ভিজিলে বিশেষ ক্ষতি আছে।

চৈতিলী অড়রের শস্য সংগ্রহ পক্ষে সকলই ঐ প্রকার, কেবল পক্কতার কাল চৈত্র মাস। ইহার আবাদে ব্যয় যৎসামান্য, তাহাও আউশ ধান, ভুরা ও তিলের আয় ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হয়, তবে বিঘা প্রতি ফসলের হার নির্ণয় করিলেই পাঠকবর্গের লাভালাভের হিসাব যথার্থ উপলব্ধি হইতে পারিবে।

বিঘাপ্রতি ফসলের দর।	মণ।	দর।	মূল্য।
মাঘী অড়র	৮/০	১৷৵০	১৩৲
চৈতিলী	১০/০	১৸০	১৭৷০
গুড়ুলে	৬/০	১৷৵০	৮৷০

শ্রীপ্যারীমোহন গোস্বামী।

এরণ্ড বা ভেরাণ্ডা।

আজ কাল ইয়োরোপীয় মহাত্মাগণের প্রসাদে এতদ্দেশ মধ্যে এরণ্ড (Castor oil বা রেড়ীর তেল) প্রয়োজনীয়তার যতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, বোধ করি পূর্ব্বকালে এই তৈল, এদেশে এরূপ নিত্য ব্যবহারীয় ছিল কি না তাহা সন্দেহ স্থল। এমন কি, এখন ইহার উপকারীতার বিষয়ে, এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই অপরিজ্ঞাত নহেন বলিলেও হয়। তবে ইহার যতদূর উপকারীতা সর্ব্বসাধারণের বোধাধিকার জন্মিয়াছে; আবাদগত

বিষয়ে অনেকের ততদূর জ্ঞানের সামান্যতঃ অভাব থাকিতে পারে। আমি আজি সেই যৎসামান্য অভাব দূর করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইব।

একটু উচ্চাংশের ছালীপাতলা * জমী, এরণ্ড আবাদের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া, আষাঢ় মাস হইতে সেই ভূমি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিতে হয়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রের প্রথম পক্ষ পর্য্যন্ত চাষ দিবার উপযুক্ত সময়, এই সময়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে, ছয় সাতবার উত্তম করিয়া লাঙ্গল চষিয়া, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। রেড়ীর জমীতে কোন প্রকারের সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, সহজেই প্রচুর পরিমাণে রেড়ী উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি। ভাদ্র মাসের ১৫ই হইতে, আশ্বিন মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত, রেড়ী রোপণের প্রকৃত সময়, এই কাল মধ্যে রোপণ শেষ না হইলে, নামলা পড়ে। যো বুঝিয়া অর্থাৎ যখন জমীর কর্ষিত-মৃত্তিকা এরূপ হইবে যে, তাহাতে রস আছে, চাষ দিবার কালে লাঙ্গলে মাটী জড়াইয়া না লাগে; মাটীর তাদৃশী অবস্থায়, আর একবার দোয়ার তেয়ার চাষ করিয়া বিঘা প্রতি পাঁচ সের বা সাড়ে পাঁচ সের এরণ্ড-বীজ লইয়া, কর্ষিত ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে, দুই হাত আড়াই হাত হিসাবে অন্তর অন্তর করিয়া সারি বান্ধিয়া একটী একটী বীজ, সমস্ত জমীতে ফেলিতে হইবে। বীজ ফেলিয়া আর একবার একখান রোপীত বীজ থাকিবার উপায় মত চাষ দিলেই, রোপণ কার্য্য শেষ হইয়া গেল।

রেড়ীর মুখে শাদা শাদা এক প্রকার অতি কোমল পদার্থ সংযুক্ত থাকে, রোপণের পূর্ব্বে তাহা বীজের মুখ হইতে নখ বা অন্য কিছু দ্বারা ভাঙ্গিয়া পরিষ্কৃত করিয়া রোপণ করাই ভাল; কারণ তাহাতে সত্বর বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং গাছ বেশ তেজোবান হইতে থাকে। ক্ষেত্রে রোপিত বীজ, সময়ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া, ভেরাণ্ডা গাছ সকল যখন দেড় হাত বা দুই হাত উর্দ্ধে বাড়িয়া উঠিল, তখন দেখিতে হইবে যে, আবাদী ক্ষেত আঁটিয়া গিয়াছে কি না, যদি

---

* যে মৃত্তিকার উপরে ৪।৬ অঙ্গুল হাল্‌কী মাটি, নীচে এঁটেল মাটি থাকে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন।

আঁটিয়া থাকে, তবে সতর্কতা পূর্ব্বক নিড়ানী বা আর একখান লাঙ্গল চাষ দিয়া, সমস্ত জমীর মাটী আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে। যেন গাছের গোড়ায় চাড় না পায়। কার্ত্তিক মাসের শেষে বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে, আর একবার দেখিতে হইবে ক্ষেত্রস্থ গাছ সকল ঝাড়াল হইতেছে, কি সড়াল হইয়া উর্দ্ধে বাড়িতে থাকে, বেশী ডাল পালা না হয়, তবে একবার ডগা কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তাহাতে ক্রমে ডাল পালা গজাইয়া গাছ সকল ঝাড়াল হইয়া উঠিবে। মাঘ মাসের শেষাংশে কিম্বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে, ডগায় ডগায় থকা থকা ফুল, ক্রমে ফল ধরিয়া, এক প্রকার অতি সুদৃশ্য হইয়া, কেবল কৃষকগণের কেন দর্শকমাত্রেরই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিস্তার করিতে থাকে।

ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে ও চৈত্রমাসের প্রথমেই রেড়ী সুপক্ব হইতে আরম্ভ হয়; এই প্রকার উহার ফলের অবস্থা দৃষ্ট হইলে, রেড়ী পাকিয়াছে, বিশ্বাস করিতে হইবে এবং দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রত্যেক গাছের প্রতি থাকায়, দুই একটী করিয়া রেড়ীর পাড়া * সহজেই শুষ্ক হইয়া, ফাটিয়া রেড়ী বাহির হইয়াছে। তখন থকা সকল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া একটু নীচু ভূমিতে তাহা স্তূপাকারে, সর্ব্ব স্থানে গোবর-জল ছিটাইয়া, পাঁচ ছয় দিন রাখিতে হইবে। এরণ্ড ফলরাশির নিম্নস্থ ফল সকল হাজিয়াছে কি না; যদি হাজিয়া থাকে তবে আর একবার ঐ কাঁড়ি উল্‌টাইয়া অর্থাৎ উপরিস্থ ফল সকল নীচে, নীচস্থ ফল সকল উপরে করিয়া পুনরায় সেই স্থানে কাঁড়ি দিতে হইবে। দ্বিতীয় বার কাঁড়ি দিয়া চারি পাঁচ দিন পরে দেখিতে হইবে যে, সমস্ত কাঁড়ির এরণ্ড ফল হাজা হইয়াছে কি না; যদি সমস্ত হাজিয়া থাকে, তবে সেই কাঁড়ি ভাঙ্গিয়া শস্য সংগ্রহ ক্ষেত্রে তাবত হাজা ফল, পাত্‌লা করিয়া রৌদ্রে ছড়াইয়া দিতে হয়। রৌদ্রের তাপে ক্রমে ফলের পাড়া ফাটিয়া ফাটিয়া রেড়ী শস্য সকল সহজেই বাহির হইয়া শস্য সংগ্রহ স্থানে পড়িবে। দৈবাৎ দুই একটী ফল আপনি না ফাটিলে, লাঠির অল্প

* এরণ্ড ফলের বীজ কোষের সন্ধিস্থানকে পাড়া বলে।

আঘাত দ্বারা তাহা ফাটাইয়া শস্য বাহির করিয়া লইতে হয়। এই প্রকারে সকল ফলের পাড়া ফাটিয়া, সকল রেড়ীশস্য বাহির হইলে, ফলের খোলা হইতে শস্য পৃথক করিবার নিমিত্ত তাহা বায়ু সংযোগে উড়াইয়া লইলেই রেড়ী প্রস্তুত হইয়া যায়। বৎসর গতিকে প্রতি বিঘায়, অন্যূন দশ মণ হইতে বিশ মণ পর্য্যন্ত রেড়ী উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেড়ীর মূল্যও নিতান্ত কম নহে; সচরাচর প্রত্যেক মণ এগার সিকি হইতে চারি টাকা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে, ইহার তেলের গলন ও তিসি, রাই, সর্ষপাপেক্ষা কম নহে, প্রতি তিন মণ রেড়ীতে, এক মণ সাড়ে সাত সের হইতে এক মণ সাড়ে নয় সের পর্য্যন্ত তৈল নির্গত হয়। অতএব ইহার আবাদটী লাভজনক কি না, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে ক্ষমবান হইবেন, তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই।

দেখিয়াছি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, দ্বারভাঙ্গা, মান্দ্রাজ, পাটনা, রিবিনগঞ্জ, মোকামা প্রভৃতি স্থান সকলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রচুর পরিমাণে রেড়ী জন্মাইয়া থাকে এবং ভাগলপুর, ঘোষা, মুঙ্গের, খাগড়িয়া প্রভৃতি স্থানেও রেড়ী নিতান্ত কম উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ধারে, সাহেবগঞ্জ, পৈঁতি, কহালগাঁ প্রভৃতির উৎপন্ন রেড়ী, ব্যবসায়ীদিগের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণনীয়। এই স্থানের রেড়ী হইতে প্রথম নম্বরের অতি পরিষ্কৃত তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপরাপর ঠিকানার রেড়ী হইতে ঐখানকার রেড়ী মণ করা এক আনা দেড় আনা উচ্চ দরে, গৌরবের সহিত ইহা বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের এই পূর্ব্ব বঙ্গ-বাসী কৃষকগণ, এরূপ সহজোৎপন্ন ও যথেষ্ট লাভজনক শস্যের আবাদ কেন না করে? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এ প্রদেশেও রেড়ী উত্তম জন্মিবে। সাদরে অনুরোধ করিতেছি যে সকলেই উহার উপরোক্ত স্থানীয় উৎকৃষ্ট বীজ আনাইয়া, এতদ্দেশ মধ্যে প্রথমে অল্প আবাদ প্রথা প্রচলিত করিলে, কোন দোষ দেখা যায় না, অনায়াসে ব্যয় কম রেড়ীর আবাদে যথেষ্ট লাভ থাকিতে পারে। একবার আবাদ করিয়া দেখ, যদি লাভ না হয়, তবে আর কেহ উহার নিমিত্ত, এদেশীয় নীল আবাদের মত পেয়াদা দিবে না।

শ্রীপ্যারীমোহন গোস্বামী।

কাঁটাল সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের খাদ্যের জন্য পৃথিবীতে যে কত প্রকার সুস্বাদু উপাদেয় নানাবিধ রস যুক্ত ফল মূল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে কাহার হৃদয়ে না তাঁহার প্রতি অকপট ভক্তিভাবের উদয় হয়? অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি, আবার সেই বৃক্ষে মনোহর ফলপুষ্পাদির সম্ভব, ফলে মিষ্টত্বাদি রসের আবির্ভাব। তিনি ভূমিতে এবম্বিধ দ্রব্য সংযোগ করিয়া কি অদ্ভুত মহিমাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা অদ্যকার প্রস্তাবে কাঁটালের বিষয় পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। সকলেই অবগত আছেন, কাঁটাল অত্যুৎকৃষ্ট সুখাদ্য ফল। আম্রের ন্যায় ইহার গাঢ় রস অতিশয় উপাদেয়, তাহার সন্দেহ নাই, কাঁটাল যে কেবল সুখাদ্য তাহা নহে, ইহা পুষ্টিকর গুণবিশিষ্ট। কাঁটাল প্রধানতঃ দুই প্রকার, খাজা ও মেরো। খাজা কাঁটাল আনারস প্রভৃতির ন্যায় শক্ত, ইহার রস হয় না বলিয়া ইহা জলপানীতে খাইবার উপযুক্ত। মেরো কাঁটালই প্রসংশনীয়। ইহার রস টিপিয়া লইয়া আঁশগুলি সমেত খাইলে উহা পরিপাক হয় না। মেরোজাতীয় কাঁটালের মধ্যে বহুবিধ কাঁটাল আছে, তন্মধ্যে যাহার কোষগুলি বড় বড় হয় এবং সৌগন্ধিবিশিষ্ট ও গাঢ় রসযুক্ত, অতিশয় সুমিষ্ট ও কোমল অর্থাৎ টিপিলে সমস্ত রস বহির্গত হইয়া আঁশগুলি পৃথক হইয়া যায় এবম্বিধ মেরো কাঁটালই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ কাঁটাল একটী উপাদেয় ফল। ইহার সকল অংশই কাযে লাগে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাঁটালের কচি অবস্থায় উৎকৃষ্ট তরকারি হইয়া থাকে এবং পক্ক হইলে বীজও তরকারীতে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার মধ্যস্থ মুদ্নি দ্বারাও অনেক স্থানে সুখাদ্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা দগ্ধ করিলে অত্যন্ত ক্ষার হয়। ঐ ক্ষার এক মটর পরিমিত শরীরের কোন স্থানে ১ ঘণ্টাকাল রাখিলে ঐ স্থান ক্ষত হইয়া যায়। অনেকে ঘায়ের মুখ সহজ উপায়ে করিবার জন্য ঐ ক্ষার ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাঁটালের পত্র পশু মেষ ছাগ প্রভৃতির পুষ্টিকর খাদ্য। অনেকে কাঁটালের ডালপালা ক্রয়

করিয়া হস্তীকে খাওয়াইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা হস্তীর বিলক্ষণ পুষ্টি হয়। কাঁটালের কাষ্ঠে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তক্তা হয়, কাঁটালের তক্তায় আলমারি, বাক্স, ডেক্স, প্রভৃতি করিবার জন্য লোকে অধিক মূল্যে উহা লইয়া থাকে। ইহার ফলের উপরিস্থ কণ্টকাবৃত আবরণভাগও সম্পূর্ণ ত্যাজ্য নহে, কারণ তৎসংলগ্ন মিষ্টত্ব যাহা কিছু থাকে, তাহা গরুতে খাইয়া থাকে।

এই উৎকৃষ্ট ফল ইচ্ছা করিলে গৃহস্থ মাত্রেই উপভোগ করিতে পারেন। বাড়ীতে ২।১টী গাছ লাগাইলে, ৪।৫ বৎসরান্তে স্বচ্ছন্দে ফল ভোগ করিতে পারা যায়। ইহার বীজের গাছ ভিন্ন কলমের গাছ হয় না। কলমের গাছ হইলেও তাহাতে সুবিধা নাই। কারণ কাঁটালের অধিক ভারত্ব হেতু গাছ বিলক্ষণ মোটা ও মজবুত না হইলে ফল রাখিতে পারা যায় না। কলমের ডাল ফলভারসহ হইতে ৫।৬ বৎসরের কমে হয় না। তাহাতেও আবার জোড়ের স্থানে অধিক ভার পাইলে ভাঙ্গিবার বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকে। কিন্তু চারার গাছে একটু যত্ন ও পাইট করিলে তৃতীয় বৎসরের পর চতুর্থ বৎসর হইতেই ২।৪টা করিয়া ফল থাকিতে পারে। গাছ যেমন ক্রমে বৃদ্ধি হয় ফলও তেমনি ক্রমে অধিক রাখিতে পারা যায়। এমন কি রঙপুর ও দিনাজপুর প্রদেশে এক একটী অতি বৃহৎ বৃক্ষে ২৫০।৩০০ শত বড় বড় কাঁটাল হইয়া থাকে। ইহা ওজনে এক একটী এক মোণ দেড় মণের কম নহে। হাজারী নামে একরূপ কাঁটাল আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। এই কাঁটাল এক একটী গাছে ১০০০।১২০০ শত ফলিয়া থাকে। ইহার এক একটী থোকায় ১০।১২টা করিয়া একত্র হয়। অনেক গাছে এমন দেখা যায় যে বৃক্ষের মূলদেশ হইতে শিরোভাগের ভারসহ শাখা পর্য্যন্ত কণ্টকী ফল শ্রেণী শোভমান রহিয়াছে। বৃক্ষের নিম্নস্থ মূলগুলিতেও মাটীর নীচে কোন কোন গাছে কাঁটাল ফলিয়া থাকে, মাটী কাটিয়া ঐ সমস্ত কাঁটাল বাহির করিতে হয়। আম্রের মত কাঁটালেরও ভৈরবী, হাজারী, কালীভোগ, বড় কোষা, মধুমুখী ইত্যাদি নাম আছে। দিনাজপুর প্রদেশের অনেক স্থানে বারমেসে কাঁটালও দৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা বৎসরের মধ্যে ৩।৪ সময়ে পাকা পাওয়া যায়।

কাঁটালের আয় মন্দ নহে। ইহার গাছ লাগাইতে ব্যয় কিছুমাত্রই নাই, অথচ লাভ বিলক্ষণ। অতি বৃহৎ কাঁটালগুলি সচরাচর ৵০ আনার কমে বিক্রয় হয় না। আর ছোটগুলি পয়সায় ২টা বা ১টা করিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। একটা পুরাতন বৃহৎ বৃক্ষে ৩০০ শত বড় কাঁটাল জন্মিলে ছোট বড় গড়ে /১০ দরে পড়িলেও মোট ২৮৵০ আনা লাভ হইবে। আমরা রঙপুর ও দিনাজপুরের দরে হিসাব ধরিলাম কিন্তু যে সকল স্থানে এত প্রচুর পরিমাণে কাঁটাল হয় না, তথায় লইয়া বিক্রয় করিতে পারিলে অবাধে ইহার ত্রিগুণ লাভ হইতে পারিবেক।

উত্তমরূপ যত্ন করিলে সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রচুর কাঁটাল ফলিতে পারে। বাড়ীতে ৪টী গাছ রাখিলে বার্ষিক ১০০৲ শত টাকা আয়ের পথ হয় এবং ইহার ফল স্বচ্ছন্দরূপে উপভোগ করিতে পারা যায়। এরূপ অনায়াসলভ্য সুখেও আমরা নিজের অলসতায় বঞ্চিত রহিয়াছি।

এক্ষণে কাঁটাল গাছ প্রস্তুতের প্রণালী লিখিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। কাঁটালের গাছ তৈয়ার করিতে হইলে নিম্নলিখিত মত পাইট করিলে অল্পদিন মধ্যে গাছ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। পলি স্থানে কাঁটাল অধিক ফলন হয়। সুতরাং পলি মৃত্তিকাই কাঁটাল রোপণের পক্ষে উপযোগী। বৈশাখ মাসে একটি দুই হস্ত গভীর গর্ত্ত খননপূর্ব্বক তাহাতে ৪।৫ শের পুঁটি মৎস্য ফেলিয়া দিতে হইবে। তৎপর পলি বা দোঁয়াশ মৃত্তিকা দ্বারা ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিতে হইবে। আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে ঐ গর্ত্তের উপরে একটু মাটী আল্‌গাইয়া কাঁটালের কোষ সমেত বীজ পুঁতিলে কাঁটাল সুস্বাদু হয়। যে গাছের বীজ লইতে হইবে, তাহার উপরিস্থ শাখার কাঁটালের বীজ লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ প্রবাদ আছে যে যত বড় মোটা শাখার কাঁটাল হইতে বীজ লইয়া গাছ প্রস্তুত করা যায়, গাছটি তত বড় মোটা না হইলে ফল ধরে না। বিধায় গাছের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম শাখার কাঁটালের বীজ গ্রহণ করা উচিত। বীজ বপনের পর মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইলে, জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না। কিন্তু বৃষ্টি না হইলে, বীজ অঙ্কুরিত ও ৪।৫টী

পত্র না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে জল সেচন করিতে হয়। অধিক জল দিলে বীজ পচিয়া যায়।

কাঁটাল গাছের ছোট অবস্থায় সার দিতে হইলে পুঁটী মৎস্য তাহার গোড়ায় না দিয়া অন্য একটী পাত্রে পুঁটী মৎস্য দিয়া তাহাতে কিছু খৈল এবং মেথি ও মাটী মিশাইয়া ঐ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া মাটীর নীচে অন্যূন ২ মাস পুঁতিয়া রাখিতে হয়। তৎপর ঐ পুঁটী মৎস্য পচিয়া মাটীর আকার হইলে উহা গাছের গোড়ায় গর্ত্ত করিয়া দিতে হয়। বড় গাছে আস্ত পুঁটী মৎস্য দিলেই হইতে পারে। কিন্তু ছোট গাছে এইরূপ প্রস্তুত সার দেওয়া কর্ত্তব্য। কাঁটালের গাছ রোপণ সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ আছে। আষাঢ় মাসের ৩ দিন অবশিষ্ট থাকিতে উহা রোপণ করিলে ৩ বৎসরান্তে কাঁটাল ফলিয়া থাকে, কিন্তু আমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই।

অনেকের ভ্রম আছে যে, কাঁটাল গাছ এক স্থানে চারা করিয়া অন্য স্থানে স্থায়ীরূপে রোপণ করিলে তাহাতে ফল হয় না। ইহা নিতান্ত অলীক। আমরা বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে এক স্থানে চারা প্রস্তুত করতঃ উহা তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিয়া সেই গাছে রীতিমত যথেষ্ট ফল হইয়াছে। ফলতঃ এক স্থানে অনেকগুলি চারা প্রস্তুত করিলে সুবিধা হয় না। কারণ ঐ ঘন চারা উঠাইবার সময় উহার নীচের মাটী সমেত উঠান যায় না। আর চারার চতুষ্পার্শ্ব খনন করিতে অসুবিধা হওয়ায় উহার মূল কাটিয়া যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভব। কাজেই গাছ মরিয়া যাইতে পারে। অতএব পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে বা স্থানে এক একটী করিয়া গাছ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়ার মাটী তুলিয়া চতুষ্পার্শ্বে ২।৩ শের পুঁটী মৎস্যের সার দিয়া পুনরায় সার মাটী দ্বারা মূলদেশে পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। বাড়ীতে গাছ হইলে প্রাত্যাহিক আহারের মৎস্যাদির আঁশ ও নাড়ী প্রভৃতি গাছের নীচে মাটী আল্‌গা করিয়া দিলে, উহা পচিয়া যে উৎকৃষ্ট সার হয় তাহা কাঁটাল গাছের বৃদ্ধির পক্ষে বড়ই উত্তম। প্রতি মাসে গাছের গোড়ার মাটী খুসিয়া দিতে হয়, ঘাস মুথা যেন কখনই থাকে না, ইহা সর্ব্বদা দেখা উচিত, কারণ আগাছার রস শোষণ করিলে শীঘ্র শীঘ্র

গাছের বৃদ্ধি হয় না। চৈত্র মাসে প্রত্যহ সায়ংকালে গাছে জল দেওয়া উচিত। ৩ বৎসর এইরূপ পাইট করিলে কাঁঠাল গাছ বিলক্ষণ বড় হইয়া চতুর্থ বৎসরে নিশ্চয়ই ফল রাখিতে পারে।

কাঁটাল গাছ ৩।৪ বৎসরের হইলে কোন কোন স্থানে দেখা যায় গাছের একরূপ পোকা লাগিয়া গাছের বড় অনিষ্ট করে, যদি প্রথমাবস্থায় তাহাতে মনোযোগ না করা যায় তাহা হইলে, গাছটি ক্ষত করিয়া ক্রমে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ ২।৩ বৎসরের মধ্যে গাছটী একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে গাছে এইরূপ পোকা লাগিলে যে স্থানে পোকা লাগে, সেই স্থান ছুরি প্রভৃতি দ্বারা ভালরূপে কাটিয়া লইতে হয়, তৎপর ছিদ্র মধ্যে পোকার থাকিবার স্থান অনুভব করিয়া টিনের পিচ্‌কারি দ্বারা কেরাসিন তৈলের পীচ্‌কারি দিতে হয়। আর যদি পোকা ক্রমে গাছের ভিতরে ভিতরে ছিদ্র করিয়া বহুদূর উপর পর্য্যন্ত গিয়া থাকে, আর ছুরি দ্বারা কর্ত্তিত মুখ দিয়া তথায় পিচ্‌কারি দিবার সুবিধা না হয়, তবে সেই স্থান হইতে যতদূর পোকা থাকিবার সম্ভাবনা হয় ততদূর পর্য্যন্ত কোন অস্ত্র দ্বারা গাছটীর লম্বাভাগে চিরিয়া দিতে হইবে এবং পোকার থাকিবার স্থান বিবেচনা করিয়া পিচ্‌কারি দিতে হইবে। ক্রমে ৪।৫ দিন এইরূপ কেরাসিন তৈলের পিচ্‌কারি দিলে পোকা মরিয়া যাইবে। তৎপর গাছের ঐ ক্ষত স্থানে নূতন রাই সরিষার খৈল দ্বারা বন্ধ করিয়া বিচালি পাকাইয়া মূল হইতে শাখা বাহির হইবার নিম্ন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যতদূর বাঁধা যায়, পেচিয়া গাছের কাষ্ঠ ঢাকাইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। গাছের মূলদেশে এইরূপ পোকা হইলে মূলদেশ খনন করিয়া উপরোক্ত মত প্রক্রিয়া করতঃ কিছুদিন রৌদ্র লাগাইয়া পশ্চাৎ ভাল মাটী দ্বারা মূল ঢাকাইয়া দিতে হইবে। সদ্য গোময়ের সার দিলে এই সমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে, কোন গাছেই সদ্য গোময়ের সার দেওয়া উচিত নহে।

কাঁটালের গাছ পুরাতন হইলে গাছে একরূপ রোগ জন্মে। সমস্ত বৃক্ষের শরীরে আবের মত গ্লোটা গোটা হইয়া গাছে অধিক ফল ধরে না এবং ফলগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া যায়। ইহাকে

লোকে "দাঁতধরা" বলে। এইগুলি কাটিয়া দিলেই পূর্ব্বমত ফল ধরিতে থাকে।

শ্রীমধুসূদন আচার্য্য।
চা ভট্ট কৃষিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা।

বীজ-শূন্য অলাবু।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, এই যৎসামান্য বিষয়ের পর্য্যালোচনায় মনোমধ্যে প্রীতির পরিবর্ত্তে বিরক্তিরই আবির্ভাব হইতে থাকিবে। কিন্তু যে সকল ধৈর্য্যশীল মহানুভব ব্যক্তি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখিবেন, তাঁহারাই অপার আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইবেন। জগতে যখন যৎসামান্য কীটেরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় বৃহদাকার দ্বীপ সকল অবলীলাক্রমে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইতেছে এবং ঐ অতি ক্ষুদ্র কীটের প্রতি দৃষ্টি করিতেও যখন মানব মন প্রধাবিত হয় না। কিন্তু ঐ সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য দ্বীপগুলি দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হন, তখন বোধ হয় আমার এই যৎসামান্য প্রবন্ধটী তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবে। তাহাত একবারও মনে মনে অনুধাবন করিতে পারিতেছি না। তবে ইহাতে এই মাত্র প্রতীতি জন্মিতেছে যে, শীর্ষোক্ত "বীজশূন্য অলাবু" একটী দেখিয়াই অধ্যয়ন আরম্ভ করিবেন। অবশেষে শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যই পাঠ করিবেন। আমাদিগের দেশে নানাবিধ অলাবু দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ইহার বর্ণ প্রায় স্বভাবতঃ দুই প্রকার শ্বেত ও কৃষ্ণ। এতদুভয়ের মধ্যে পুনরায় গোল খুপি এবং লম্বাকৃতি সচরাচর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং সর্ব্বত্রই (কিবাস্তু কি মাঠ) প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই গাছ যদি একটু বড় হইয়া লতাইতে আরম্ভ করে তবে অবিলম্বে পুষ্পিত ও ফলবান হয়। অলাবু দুই ঋতুতেই জন্মে, একবার গ্রীষ্মে (যাহাকে তিৎলাউ বলে) অপর বর্ষাতেই জন্মিয়া থাকে। শেষোক্ত

গুলি শরৎ হইতে আরম্ভ করিয়া শীত পর্য্যন্ত ফল প্রদান করিতে থাকে। প্রথমোক্তগুলি নদী তীরবর্ত্তী স্থানেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

যাহার যেরূপ অভিরুচি হইবে তিনি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসারে সেইরূপ গাছই প্রস্তুত করিতে পারিবেন একটী অলাবুর বীজ হইতে দুই প্রকার লাউ হইয়া থাকে, নিয়মটী এইরূপ—যদি ঐ অলাবুর বৃন্তের নিকটবর্ত্তী বীজ লইয়া মৃত্তিকায় রোপণ করা যায় তাহা হইলে অনতিবিলম্বে অঙ্কুরোৎপত্তি হইবে। পরে গাছটী ক্রমে লতাকার ধারন করতঃ ১ হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ হইলেই অমনি শানিত কাঁচী দ্বারা নিম্নভাগে একটী গিরা রাখিয়া কর্ত্তণ করিয়া ফেলিবে। অনন্তর ৫।৬ রোজ মধ্যেই আবার কর্ত্তিত স্থান হইতে একটী ডগ বহির্গত হইবে। তখন পুনরায় ডগটী কাটীয়া ফেলিবে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তবার কর্ত্তিত হইলে যে ডগ বহির্গত হইবে, তাহা উচ্চ মাচার উপর কিম্বা অন্য কোন স্থানে তুলিয়া দিবে। লতা সকল ক্রমে পুষ্পিত, পরে ফলবতী হইতে চলিল। যথাকালে বৃহদাকার লম্বা লাউগুলি পরিলক্ষিত হইবে, তখন উহা চিরিয়া দেখিলে একটীও বীজ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। গোল থুপি লাউ প্রস্তুত করিবার প্রণালী সকলই উল্লিখিত রূপ, কেবল প্রভেদ এই—অলাবুর তল দেশের বীজ লইয়া রোপণ কর পূর্ব্বোক্তরূপে ডগ কাটিয়া দিলেই যখন গাছটী প্রস্তুত হইয়া উঠিবে এবং ফল ধরিবে যথাকালে পূর্ব্ববৎ ছেদন করিয়া চিরিয়া ফেলিলেই ইহাও বীজশূন্য পরিলক্ষিত হইবে।

অলাবু আমাদের দেশে তরকারী রূপে ব্যবহৃত হয়। উহা খাইতে সুস্বাদু, কিন্তু বড় গুরুপাক। সুতরাং উদরাময়ে নিষিদ্ধ পিত্তনাশক ও কফ বৃদ্ধি কারক সুতরাং শৈত্যগুণও অধিক কিন্তু তিৎ লাউয়ের গুন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যথা—কৃমিনাশক, কফ বৃদ্ধিকারক ও পিত্তনাশক। ইহার শৈত্যগুন অধিক।

অত্যন্ত পরিপক্ক অলাবুর খোলায় নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্র হয় এবং মোহন্ত সন্ন্যাসীগন ইহার খোলে জলপাত্রের কার্য্য সমাপন করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

জোড় কলা গাছ
ও
এক গাছে ৩।৪ প্রকার কদলী ফল।

বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতে হয়। বৃক্ষ লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ সকল নিষ্প্রয়োজনে সৃজিত হয় নাই। পরম পিতা পরমেশ্বর ইহাদিগের দ্বারা জগতে অনির্ব্বচনীয় কৌশল এবং মহিমা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মানবগণকে প্রবল বুদ্ধিবল প্রদান পুরঃসর তাহাদের কার্য্যোপযোগী কত প্রকার পদার্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। প্রতিভাশালী নরগণ ঐ সকল ঈশ্বর সৃজিত দ্রব্য হইতে পুনরায় অভিনব কৃত্রিম পদার্থ উৎপন্ন করিয়া ভূমণ্ডলে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্ব্বক, জনগণকে বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত করিতেছে। অনন্তর ঐ সমুদায় অভিনব দৃশ্যাবলী যতই নয়ন পথের পথিক হইতেছে; ততই সেই অবনীপতির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিতেছে। ইত্যবসরে যাবতীয় পদার্থ নবীভূত হইয়া নয়নপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। তদনন্তর সেই ভূতভাবন জগৎপতির প্রতি কোটি কোটি প্রণামপূর্ব্বক একটী সংসামান্য বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। মানবগণ বুদ্ধি ও শক্তি প্রভাবে অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড সমূহ অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিতে সক্ষম। বুদ্ধির অসাধ্য কিছুই নাই।

একটী দৃষ্টান্ত।

এক প্রকার বৃক্ষে তিন চারি প্রকার রম্ভার উৎপত্তি। বৃক্ষটী প্রস্তুত করিবার নিয়ম এইরূপ—অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনপুয়া আন্দাজ চারিজাতীয় চারিটী কলার তেউড় এটে সমেত উত্তোলন করতঃ উহাদিগের প্রত্যেকেরই এটে সকল এরূপভাবে কর্ত্তন করিবে, যেন প্রত্যেকটীরই আকার বৃত্তের এক চতুর্থাংশের ন্যায় হয়। পরে তেউড়ের গা যোগ করিয়া শানিত ছুরিকা দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিবে। তৎপরে পাট দ্বারা (ঐ চারিটী অংশ গায়ে গায়ে মিলাইয়া) অতি সতর্কতার সহিত, সজোরে বন্ধন করিয়া, একটী ১ ফুট

প্রমাণ গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে ঐ গাছটী পুঁতিয়া ফেলিবে; অনন্তর একটী তেজস্কর গাছ মাটী ভেদ করিয়া উঠিতে থাকিবে। কালক্রমে গাছটী চারিটী মোচা ক্রমে ক্রমে প্রসব করিবে। পরে যে যে জাতীয় তেউড় লইয়া গাছ প্রস্তুত করা গিয়াছিল, অনতিবিলম্বে উহার রম্ভা সকল পরিপুষ্ট হইলে বিভিন্ন জাতীয় কি না অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে। কলা প্রায় সুপক্ক হইতে পায় না, একে কলা গাছ, তায় আবার কলম করা, সুতরাং পবনদেবের উপদ্রবে অনেক গাছ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে বৃক্ষটীর চতুর্দ্দিকে অতি শক্ত রকম বাঁশের ফিক্ প্রস্তুত করিয়া দিলে অনায়াসে সুপক্ক ফল লাভের সম্ভাবনা। অহো! বিশ্বপতির কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!

কদলী বৃক্ষ চাষের নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, এতদ্দেশে একটী কিম্বদন্তী আছে, "ডাকদিয়ে বল্‌ছে রাবণ, কলাগাছ আজ্‌জাবে আষাঢ় শ্রাবণ।" ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে উহার আবাদের প্রকৃত সময় আষাঢ় শ্রাবণ। মৃত্তিকা যত সরস হইবে, ততই কদলী বৃক্ষ সতেজ থাকিবে। ফলতঃ একথা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ নিম্ন বঙ্গভূমিতে যত কলাগাছ জন্মে, ভারতের আর কুত্রাপি এত প্রচুর জন্মে না। প্রথমে উহা রোপণ করিতে হইলে বেশ ফাঁপা করিয়া চষিয়া ফেলিবে। অনন্তর যৎকালে দেখিতে পাওয়া যাইবে, মৃত্তিকা বেশ সরস হইয়াছে, অমনি গাছ সকল এটে সমেত উত্তোলন করতঃ এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গাছগুলি বসাইয়া দিলে ৪।৭ দিন মধ্যেই ধরিয়া যাইবে। অর্থাৎ আর মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকিবে। এইরূপে বৎসর মধ্যেই গাছগুলি ফলবান হইয়া থাকে। অনন্তর রম্ভা পক্ক হইবার উপক্রম দেখিলেই গাছ সমেত কাটিয়া আনে। পরে উহার এটে সকল কোদাল দিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। আবার বর্ষাকালে ঝাড়ে অধিক তেউড় হইলে অন্য স্থানে উহাদিগকে রোপণ করে, নতুবা আবশ্যক মত ৩।৪টী রাখিয়া অনাবশ্যকগুলিকে এটে সমেত কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে সার মাটী এবং ঐ গোড়ার মাটী লইয়া গাছ দিয়া গোড়া বান্ধিয়া দেয়, কদলী চাষে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না।

রম্ভা নানা প্রকার আছে, তন্মধ্যে এই কয়েকটীই সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা মর্ত্তমান, চাঁপা, চিনেকাঁটালী, গঁদী, কাবেলী ও বোম্বাই এবং কাঁচকলা ইত্যাদি। কাঁটালীকলা অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। ইহা সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়, মর্ত্তমান রম্ভা বড় ঠাণ্ডা, চাঁপা, গঁদীও মন্দ নহে। সকলেই রম্ভা অতি আদরপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং দেব পূজায় উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দেশ প্রবাসী ইংরেজগণ বড় সমাদরপূর্ব্বক টিফিনের সময় উহা ভক্ষণ করিতে সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এলাইচ।

ভারত মহাসাগরীয় কতিপয় দ্বীপে এবং ভারতবর্ষীয় মালাবার উপকূলে আদার সজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ জন্মে। অন্যূন এক বৎসর পরেই উক্ত গাছ সকল পুষ্পিত হইয়া ফল ধারণ করে। উহার পুষ্পগুলি বিকাশ উন্মুখ হইলে, তৎক্ষণাৎ পবনদেব আগমনপূর্ব্বক প্রস্ফুটিত করণানন্তর সুরভি গ্রহণ করিয়া দিগদিগন্তে সমগ্র দ্বীপে, বহন করিতে প্রবৃত্ত হন। উহার পুষ্প এবং শিম্বী (যাহার ভিতর এলাচদানা থাকে) উভয়েরই সৌগন্ধ প্রায় একরূপ, এ নিমিত্ত এদেশীয় সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, উহার মূল আনয়নপূর্ব্বক স্ব স্ব উদ্যানে সাতিশয় আগ্রহ সহকারে রোপিত করাইয়া থাকেন। কিয়দ্দিনান্তে পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এদেশে আসিয়া পুষ্পিতই হইয়া থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ফল প্রদানে সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে এতাবন্মাত্র উপলব্ধি জন্মিতেছে, এখানকার জল বায়ু উহার শিম্বী উৎপাদনে সমূহ প্রতি কুলাচরণ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত দ্বীপ সমূহে দুই প্রকার এলাচ জন্মিয়া থাকে। এক প্রকার বৃহৎ—ইহাকে বড় এলাচ কহে, অপর ছোট ইহাকে গুজরাটী এলাচ কহিয়া থাকে। প্রথমের ভিতরে সচরাচর ৫০টী এবং দ্বিতীয়ের ভিতর ১০টী দানা দৃষ্ট হয়। বড় এলাচ অপেক্ষা ছোট এলাচের গুণ অধিক, এজন্য শেষোক্তগুলিও অপেক্ষাকৃত মূল্যবান। বড় এলাচদানার বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং ছোট এলাচের রঙ ঈষৎ ধূসর বর্ণ। উহার বীজে বৃক্ষ জন্মে না আদা

বা হরিদ্রার মত মূল আনয়ন করিয়া ভূমিতে রোপণ করে। এইরূপে ক্রমে যত পাট করিতে থাকিবে ততই গাছ সতেজ হইবে। এই চাষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ আছে দেখিয়া এতদ্দেশীয়েরা উহার আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কেবল উল্লিখিত প্রতিবন্ধক দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে।

অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ পান এবং অপরাপর খাদ্য দ্রব্যের সহিত এলাচ ভক্ষণ করেন দেখিয়া অনভিজ্ঞ লোকে মনে করে, যে কেবল উহা সৌরভের জন্য এবং খাদ্য দ্রব্য সুস্বাদু করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহার পুষ্টিকারিতা, উত্তেজকতা, অগ্নের বমন প্রতিসেধক প্রভৃতি নানা প্রকার গুণ আছে। উহা কীট নাশক। কোন কোন দ্রব্যাদির সহিত উহা রক্ষিত হইলে আর তাহা শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে না। উহার এই শক্তিকে "পরিরক্ষণ" শক্তি কহা গিয়া থাকে। উহা হইতে এক প্রকার সুবাসিত উত্তল প্রস্তুত হয় তাহা দ্বারা এদেশীয় কবিরাজগণ পাক তৈল প্রস্তুত করেন। পাক তৈলের গন্ধ অতি মনোহর।

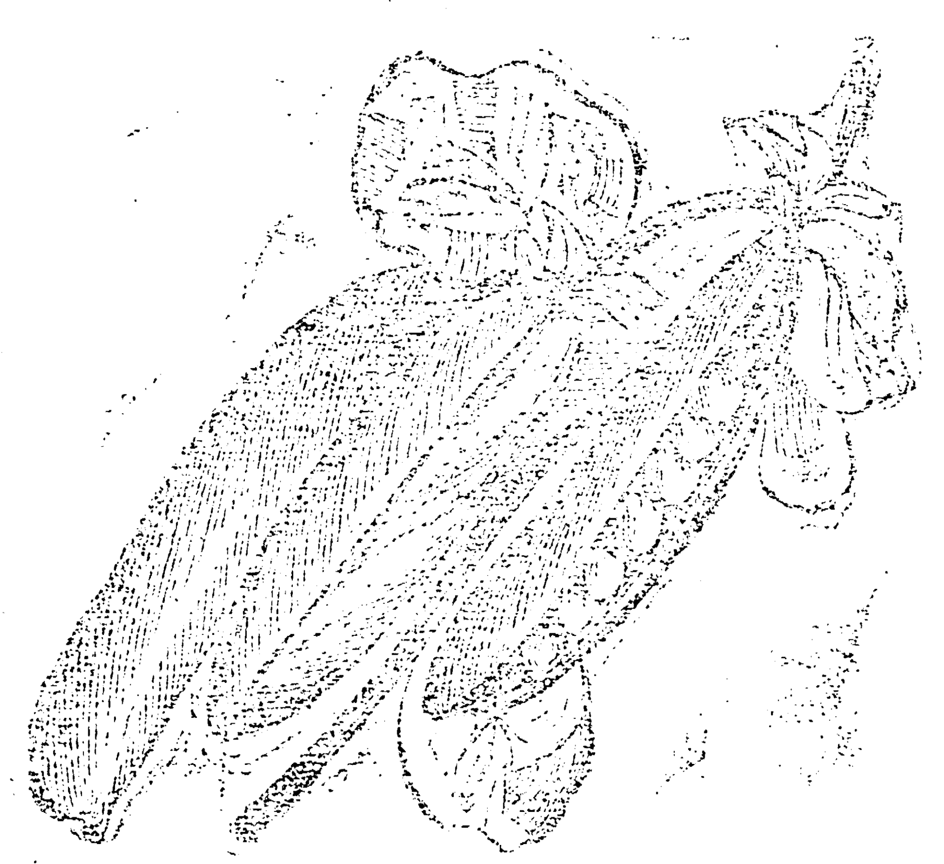

PEA. মটর।

যে স্বাস্থ্যের উপর আমাদের শারীরিক মানসিক উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে, যে স্বাস্থ্য রক্ষা না হইলে আমরা সম্যকরূপ ধন, মান এবং জ্ঞান লাভ করিতে পারি না, সেই স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের আহারাদির অতি

নিকট সম্বন্ধ। ভালরূপ আহারাদি না হইলে স্বাস্থ্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা না হইলে আমরা জগতে কোনরূপ আশাই করিতে পারি না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং কি উপায়ে অল্পায়াসে আমরা ভাল খাদ্য দ্রব্য খাইতে পারি তদ্বিষয় আমাদের জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

ডাল, ভাত বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য; সুতরাং কি রকমে আমরা প্রচুর পরিমাণে উত্তম ডাল খাইতে পারি তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত।

উপরে যে Pea (মটরের) প্রতিরূপ দর্শিত হইল, ইহা আমেরিকাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজিতে ব্লুপিটার (Blue-Peter) বলে। ইহার ছড়া দৈর্ঘ্যে প্রায় এক বিঘতেরও অধিক হয় এবং ইহার মধ্যস্থিত মটর (Seed) আমাদের এতদ্দেশীয় মটর অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ হইবে। আমাদের দেশীয় মটর অপেক্ষা যে ইহা কেবল আকারে বৃহৎ এমত নহে, ইহা গুণেও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিকারক। ইহা আমাদের দেশীয় মটর অপেক্ষা অধিক পরিষ্কার এবং অল্পে উত্তমরূপ সিদ্ধ হয়। ইহা ছয় প্রকার। যথা, (১) ল্যাণ্ড্রেত্স একষ্ট্রা আরলি (Landreth's extra early) (২) এমেরিকান ওয়ানডার (American wonder) (৩) মেক লিনস্ লিটিল জেম (Mc. lean's little gem) (৪) আরলি ফ্রেম (Early frame) (৫) ইউজিন (Eugenie) (৬) চ্যাম্পীয়ন অব ইংলণ্ড (Champion of England) এস্থলে যাহার বিষয় লিখিত হইল, ইহাই সর্ব্বোত্তম। ইহার চাষ প্রণালীও সহজ। বালুকাময় স্থানেই ইহা ভালরূপ জন্মে। সমস্ত দিন যেখানে অত্যন্ত রৌদ্রের উত্তাপ লাগে এমত স্থানে ইহা উত্তমরূপ বাড়িতে পারে না। সুতরাং ইহার চাষের জন্য ছায়াবিশিষ্ট কোন বালুকাময় স্থানই বাছিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। চাষের জন্য যে স্থান প্রথমত বাছিয়া লইবে তাহা প্রথমতঃ ভালরূপ কোদলাইয়া লইতে হইবে এবং তৎপর পাট করিয়া আন্দাজ ১ ফুট গভীর দুই পার্শ্বে পগারের ন্যায় জুলী করিয়া ১।০ ফুট উচ্চ বাঁধের ন্যায় করিতে হইবে এবং তদুপরি অনুমান আধ হাত অন্তর বীজ রোপণ করিয়া যাইবে এবং তাহাতে গোবরের সার

দিবে। বীজ হইতে চারা নির্গত হইয়া কিছু বড় হইলে ইহার চতুঃপার্শ্বের মৃত্তিকা আনিয়া চারার মূলে দিবে।

ইহার চারা সমূহ ৯।১০ ফুটেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসেই ইহা বুনিবার উত্তম সময় এবং মাঘ মাসে ইহা পাকিয়া থাকে। এবং ক্রমে ক্রমে চারা যত বাড়িবে তত ইহার চারিধারের মৃত্তিকা আনিয়া ইহার মূলে দিবে এবং রৌদ্রের উত্তাপ অতিশয় প্রখর হইলে সূর্য্যোত্তাপ হইতে চারাগুলি রক্ষা করিবার জন্য উপরে কোনরূপ মাচা বাঁধিয়া দিতে হইবে।

পাট।

পাটের ভালরূপ আবাদ করিতে পারিলে, পাট হইতে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আজি কালি বিলাতি কলের প্রসাদে ও ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুগ্রহে পাট বড় আদরের জিনিশ হইয়াছে। পূর্ব্বে পাটের এত অধিক প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এক্ষণে পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতিতে কার্পাসের পরীবর্ত্তে পাট, মেষ্টা ইত্যাদিই অধিক ব্যবহার হইতেছে। এই জন্যই পাটের আদর বাড়িয়াছে।

পাট দুই প্রকার। ভূমির উচ্চনীচতানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক পাটের আবাদ করিতে হয়। ভাদরে নামক পাট নিম্ন ভূমিতে হইয়া থাকে, এবং হেমতি নামক অপর প্রকার পাট উচ্চ ভূমিতে আবাদ করিতে হয়। এই দুই প্রকার পাটের আবাদ প্রণালী একইরূপ। কিন্তু ভাদরে পাট চৈত্র বা বৈশাখে বপন করিতে হয় এবং শ্রাবণের শেষ হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত ইহার কাটা শেষ হইয়া যায়। এই ভাদরে পাট দ্বিবিধ। এক প্রকার ভাদরে পাটের নাম ধামনী, অপর প্রকারের নাম মেষলাল, বা পর্ব্বতিয়া। ধামনী পাটের বর্ণশ্বেত, স্বাদতিক্ত। ইহার পাতা শুষ্ক করিয়া শুক্তা পাতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা অতিশয় লম্বা হইয়া থাকে। মেষলাল পাটের রজ্জু বিলক্ষণ শক্ত হয় ইহার বর্ণ লাল। এই পাট অপেক্ষাকৃত কম লম্বা হইয়া থাকে।

ভাদরে পাট অপেক্ষা হেমতি পাটেরই অধিক আবাদ হইয়া থাকে, এই পাটের নাম মারুয়া। ইহার বর্ণ লাল। এই পাট বিলক্ষণ লম্বা হইয়া থাকে। কএক বৎসর অতীত হইল দিনাজপুরে তত্রত্য মহারাজার সাহায্যে একটী কৃষি শিল্প প্রদর্শনী মেলা হয়, তথায় এই পাট ১৪ হাত পর্য্যন্ত লম্বা দেখা গিয়াছে। এই জাতীয় পাটের মূল্যও অন্যান্য পাট অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ইহার চাষের ভূমি উচ্চ হওয়া আবশ্যক। কারণ ইহার গোড়ায় জল লাগিয়া থাকিলে বিলক্ষণ অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যে ভূমিতে বানের জল যায় এবং বৃষ্টির জল আট্‌কায় তাদৃশ ভূমিতে ইহার আবাদ করিবে না।

পাটের ভূমিতে মাঘ ফাল্গুণ দুই মাস চাষ ও মই দিয়া ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় চাষ ও মই দিয়া ৪।৫ দিন বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ চৈত্রের প্রথম বৃষ্টির রসে পাট প্রভৃতি কোন শস্যই আবাদ করিতে হয় না। ক্রমাগত কয়েক মাসের রৌদ্রে ভূমি অত্যন্ত গরম হইয়া থাকে, প্রথমবার বৃষ্টি হইলে ভূমির ভিতর হইতে উত্তাপ উঠিতে থাকে। এই উত্তাপে বীজ হয় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, নয় গাছ ভালরূপ হয় না। কৃষকেরা ইহাকে “বাজি মারিয়া যাওয়া” কহে। ক্ষেত্রের উত্তাপ বহির্গত হইয়া গেলেও দ্বিতীয়বার বৃষ্টি হইলে পাটের বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে চাষ এবং মৈ দিতে হয় এবং পরেও এক ফেরা চাষ ও মই দ্বারা বীজগুলি কিছু মাটীর নীচে করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিঘায় ২ শেরের দরে বীজ ছড়াইতে হয়। চারাগুলি ৫।৬ অঙ্গুলি পরিমিত হইলে একবার বিদা ও একবার নিড়ানী দিলেই পাট বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। চৈত্রে পাট বুনানী শেষ হইলেই ভাল হয়। নিতান্ত তাহা না হইলে বৈশাখের প্রথমভাগেও পাট বুনানী হইতে পারে। পাটের চারা পাতলা হওয়া ভাল নহে, কারণ তাহা হইলে গাছ সরলভাবে লম্বা না হইয়া শাখা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে আঁশ ভাল হয় না। পলিমাটিই পাটের উপযুক্ত ভূমি। পাট অতিশয় ঘন হওয়াও ভাল নহে।

ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে পাটে ফুল হইবার পূর্ব্বে পাট কাটিয়া ফেলিতে হয়। সমস্ত পাট কাটা হইলে পাটগুলির অগ্রভাগ একত্রিত করিয়া বিচালি

বা অন্য কোন দ্রব্যদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়। এইরূপে ৩ দিন রাখিলে পাতাগুলি পচিয়া বা শুকাইয়া যায়। তৎপরে গাছগুলি ঝাড়িয়া আটি বাঁধিতে হয় এবং ২ দিন রৌদ্রে উহা শুষ্ক করিয়া ২৫।৩০ আটি একত্র বাঁধিয়া জলে ফেলিতে হয় এবং সমস্ত বোঝা একত্র করিয়া ভেলার মত বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। তদুপরি মাটির চাপ ও খড় প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়, ইহাকে "পাট জাগ দেওয়া" কহে। ১০।১২ দিন পচানি হইলে পাট কাচিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। পাটগাছ হইতে সহজে আঁশ খুলিলেই পাট কাচিবার যোগ্য হইয়াছে জানিয়া উহা মেষ্টা কাচার ন্যায় কাচিয়া লইয়া, ২।৩ দিন সিক্ত ভাবে রাখিয়া পশ্চাৎ বাঁশে লটকাইয়া ৫।৭ দিন শুকাইতে হয়। ২।৩ দিন সিক্ত রাখিবার কারণ এই যে তদ্দ্বারা পাট বিলক্ষণ শক্ত হয়।

উৎকৃষ্টরূপ পাইট ও ভূমিতে ভাল সার দিলে প্রত্যেক বিঘায় ১০।১২ মোণ পাট জন্মিয়া থাকে।

"বৌমুচকী" নামক এক প্রকার পাট আছে, তাহার আবাদ সচরাচর হয় না, কিন্তু এই পাটের রজ্জু বিলক্ষণ দৃঢ় হইয়া থাকে। ইহার পাতা দ্বারা উত্তম অম্ল রন্ধন করিয়া লোকে ব্যবহার করে। এই পাট ১৪/ মোণ পর্য্যন্ত হইতে শুনা গিয়াছে। পাট আবাদে ব্যয় যেরূপ তাহাতে লাভ অনেক। আমরা "চাতটু কৃষিশিক্ষা প্রদায়িনী সভার জনৈক কৃষকের নিকট যেরূপ আয় ব্যয়ের বিবরণ পাইয়াছি, তাহা পাঠক মহোদয়গণের জ্ঞাতার্থ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

আয়		ব্যয়	
		সার	।০
১০/ মোণ পাটের		পাটবীজ	./০
মূল্য ৪৲ টাকা দরে ৪০৲		চাষ	১॥০
		নিড়ানী	২৲
		পাট কাটিবার জনের	
		বেতন ৬ জনে	৸০
		ঝাড়ানী ২ জনে	।০
		জাগ দেওয়া ৪ জনে	॥০
		কাচিবার খরচ	৪৲
		শুকানি ও বস্তাবন্দী	॥০
			৯৸/০

শ্রীমধুসূদন আচার্য্য।

কাঁকুড় বা ফুট (Casaba Citron)

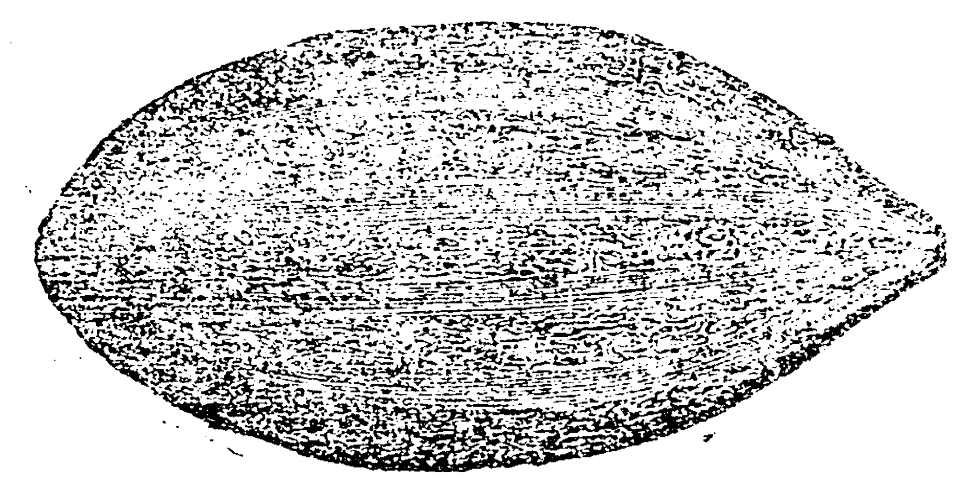

এই কাঁকুড় (Casaba Citron) এমেরিকাতে জন্মে। সামান্য যত্ন করিলেই এই উৎকৃষ্ট ফল এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

ইহা অত্যন্ত সুখাদ্য; এবং ইহা অস্মদ্দেশীয় কাঁকুড় অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং ঠাণ্ডাগুণ বিশিষ্ট। ইহা কাঁচা কালেও খাইতে মিষ্ট লাগে। ইহা ছয় প্রকার। যথা জেনি লিণ্ড (Jenny Lind) পাইন য়্যাপল (Pine Apple) ক্যাসেবা (Casaba) টারকস ক্যাপ (Turk's Cap) ক্যালি ফর্ণিয়া (California) বে ভিউ ((Bay View) বলা বাহুল্য যে ইহার সকল গুলিই এতদ্দেশীয় কাঁকুড় অপেক্ষা উত্তম।

চাষ প্রনালী:—নদীর চড়াতে অথবা কোন বালুকাময় স্থানেই ইহা উত্তমরূপ জন্মায়। ভাল করিয়া লাঙ্গল দ্বারা ২।৩ বার চাষ করিয়া জমীর মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত আলগা করিয়া দিলে অন্যরূপ মৃত্তিকাতেও জন্মিতে পারে।

মঘের প্রারম্ভে জমীতে ২।৩ বার লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিয়া ক্ষেত্রের মৃত্তিকা এরূপ আলগা করিয়া দিবে যে, ইহার কোমল শিকড় গুলী তন্মধ্যে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ চাষ করা হইলে, মই টানিয়া মৃত্তিকা সমতল করতঃ ২।৩ হাত অন্তর এক এক মাদা করিয়া তন্মধ্যে ৩।৪টী বীজ পুতিবে; এবং তদনন্তর যাহাতে বীজগুলি না দেখা যায় এরূপ ভাবে ইহার উপর গুড়া মাটী চাপা দিয়া ইহাতে অল্প অল্প জল সিঞ্চন করিবে। চারা গুলি বড় হইয়া লতাইবার উপক্রম হইলে জমীতে ঝেঁচা জল দিবে। মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত সতর্ক

তার সহিত অর্থাৎ যাহাতে ইহার শিকড় গুলি নষ্ট না হয়, এরূপ ভাবে ইহার মৃত্তিকা কিছু খুড়িয়া দিবে। চারা গুলি লতাইয়া জড়াইয়া গেলে, অধিক ফল জন্মানের পক্ষে বিশেষ বাধা জন্মায় অতএব যাহাতে চারা গুলি লতাইয়া পরস্পর জড়াইয়া না যাইতে পারে তন্নিমিত্ত ডগাগুলি এদিগ ও দিগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পুরাতন গোময়ের সারই ইহার পক্ষে বিশেষ উত্তম।

একেবারে সমুদয় বীজ না পুতিয়া, পরীক্ষার নিমিত্ত অৰ্দ্ধেক অৰ্দ্ধেক করিয়া রোপণ করা উচিত। রোপণ করিবার ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে বীজগুলি কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে রোপণ করিলে, বীজ হইতে শীঘ্র শীঘ্র চারা নির্গত হইয়া থাকে।

এক প্রকার লাল লাল পোকা ও পতঙ্গ সকল, কাঁকুড় এবং তরমুজের ডগা ও কোমল পাতা খাইয়া গাছগুলিকে একেবারে নষ্ট করিয়া কৃষকদিগের সমুদয় যত্ন ও পরিশ্রম একরূপ ব্যর্থ করিয়া ফেলে; সুতরাং এই সমুদয় পোকার উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য গাছের পাতার উপর কাষ্ঠের ছাই অথবা তামাকের গুড়া কিম্বা গন্ধকের ধুঁয়া দিবে। তাহা হইলে পোকাগুলি আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইবে।

পোকায় ধরিলে অথবা সূর্য্যের উত্তাপ অধিক লাগিলে, ফল ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা, অতএব তন্নিবারণ জন্য ফলের নীচে গর্ত্ত করিয়া খড় কিম্বা বিছালি পাতিয়া দিবে এবং ফলের উপরেও ঐরূপ খড় কিম্বা বিছালি দ্বারা আবৃত করিয়া দিবে. তাহা হইলে আর ফল ফাটিবার আশঙ্কা থাকিবেক না অথচ ইহাতে ফলও অনেক বড় ও অধিক সুস্বাদু হইবে।

ফল কাটিবার সময়, যাহাতে গাছগুলি নড়িয়া না যায় এ নিমিত্ত সাবধান হইবে. কেননা গাছ নড়িয়া গেলে, ছোট ছোট ফলের হানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

রজনীগন্ধফুল।

আমাদের প্রাচীন উদ্ভিজ্জ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ, এই পুষ্পের যে রূপ নামকরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিবেচনা হয়; রজনী গন্ধা যে এই দেশীয় ফুল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সকলকেই ইহাস্বীকার করিতে হইবে, "রজনীগন্ধ" নামের প্রকৃত শব্দার্থ পক্ষে, কোন অংশেই ভ্রম পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহার নামেতেও যাহা, কর্য্যেতেও তাহাই বিদ্যমান আছে। রজনীযোগে ইহার প্রাণমুগ্ধকর সুরভি, বায়ুসংযোগে সঞ্চালিত হইয়া কাহার না হৃদয়ে অনুপম প্রীতির সঞ্চার করে? রজনীগন্ধা এই ক্ষুদ্র ফুলের দৃশ্যসৌন্দর্য্যাপেক্ষা, দূরব্যাপক সৌগন্ধিতাগুণে, অনেক পুষ্প হইতে ইহা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কে না বলিবেন? এই ফুল যে কেবল আমাদের দেবোপাসনায় ও সুগন্ধিপ্রদানে নাসিকার তৃপ্তি সাধন করিয়া ক্ষান্তআছে এমত নহে। রজনীগন্ধ ফুল, মানব রসনা তৃপ্তিকর ও অতি পুষ্টিকর আহারীয় দ্রব্য, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। এতদ্ভিন্ন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গাজীপুর অঞ্চলের কৃষকেরা, আপনাপন আবাদের মত ইহার আবাদ করিয়া, বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। বোধকরি এ প্রদেশ বাসী অনেক কৃষক; ইহার নাম পর্য্যন্ত জ্ঞাত আছেন কিনা, তাহার সংশয় হয়। অতএব এই চির পরিচিত লাভজনক দেশীয় পুষ্পের নিকট, এপর্য্যন্ত কেহই গমন করেন নাই। আজ আমি ইহার আবাদ ও ব্যবহার গত বিষয় লইয়া, সংক্ষেপে প্রিয়পাঠক মণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পরি সমাপ্ত করিব।

নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় ও পঙ্কিলময় ভূমি ভিন্ন, প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতে রজনীগন্ধা ফুল উত্তম জন্মিতে পারে। অন্যান্য আবাদের মত, ইহার আবাদে বিশেষ পরিশ্রম বা ব্যয় বাহুল্য নাই; অতি সহজ উপায়েই, ইহা প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারে; প্রথম রোপণ করিতে হইলে, ফাল্গুন মাসে উপরি

উক্ত অতি শুষ্ক মৃত্তিকাতে, চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধহস্ত অন্তর অন্তর সারি বান্ধিয়া, তিন চারি অঙ্গুল গভীর করিয়া খুপি কাটিতে হয়। এবং প্রত্যেক খনিত স্থানে, তিন চারিটী করিয়া আকৃতিতে প্রায় পলাণ্ডু তুল্য, রজনীগন্ধের মূল, ঊর্দ্ধ দিকে মুখ রাখিয়া রোপণ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল। চৈত্র বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলে, রোপিত গেঁড় হইতে নূতন পত্র বহির্গত হইতে থাকে। পত্র সকল ভূমিতল হইতে, ঊর্দ্ধে একহস্ত পরিমিত বৃদ্ধি পাইয়া, শাখা প্রশাখাহীন রজনীগন্ধ গাছ, ক্রমে ঝাড়াল হইয়া একরূপ শোভাধারণ করে। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখাহইয়াছে। ইহার বীজ প্রস্তুত করিয়া নূতন গাছের সৃষ্টি করিতে হইলে, অধিক আয়াসাধ্য, ফলতঃ বীযোৎপন্ন গাছে ফুল ভাল হয় না আবার একস্থানে বহুকাল গাছ রাখিলে, ফুল অনেক ছোট হয়। গাছের মূল নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এক একপ্রকার কীট জন্মাইয়া ; সমস্ত মূল খাইয়া ফেলে। এই নিমিত্ত প্রতি দুই তিন বৎসরান্তর, স্থানান্তর করিয়া উল্লিখিত প্রণালীতে গাছ প্রস্তুত করা আবশ্যক। ইহার সাময়িক কারাকিত আর কিছুই করিতে হয় না ; বর্ষাকালে মধ্যে মধ্যে গাছগুলিকে নিড়াইয়া পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

আষাঢ় শ্রাবণ মাস হইতে রজনীগন্ধ গাছের প্রত্যেক মূলের মধ্যেদেশ হইতে, একটী একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লম্বাকৃতি কলিকা সংযুক্ত, অতি কোমল কাণ্ড উদ্ভিন্ন হইয়া, ক্রমশ ঊর্দ্ধদিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন গাছের পূর্ব্বপত্র সকল প্রায় ভূমি সাত হইয়া পড়ে। সময় ক্রমে সকোরক কাণ্ড গাত্রস্থ যুগ্ম যুগ্ম কলিকা, বিকাসোম্মুখ হইলে, তাহার বৃন্ত ঈষৎ বক্র হইয়া প্রস্ফুটিত হয়। প্রস্ফুটিত শুভ্রবর্ণের পুষ্পগুলির সৌরভের ত কথাই নাই ; দৃশ্যশোভা ও মন্দ নহে। ইহার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার নিয়ম সহজ, অগ্রে কোরক শীর্ষক কাণ্ডের নিম্নদিক হইতে পুষ্প বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়া, দিন দিন ঊর্দ্ধদিকে, কাণ্ড গাছের প্রতিস্থান হইতে, তিন অঙ্গুল দুই অঙ্গুল অন্তর অন্তর, থাকে থাকে জোড়া জোড়া ফুল ফুটিয়া থাকে। এই রূপে একটী একটী কাণ্ড, মাসাধিক কাল পর্যান্ত পুষ্প প্রদান করিয়া, কোরক শূন্য হইয়া পড়ে। গাছের পাইট ভাল হইলে, এক একটী কাণ্ডে পঞ্চাশটী হইতে এক শতাধিক পুষ্প

পর্য্যন্ত বিকাশ পাইতে দেখাগিয়াছে। কোন কোন উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, এই গাছকে "অপরি শঙ্ককন্দের" উদাহরণ দর্শাইয়া থাকেন।

সচরাচর দেশীয় রজনীগন্ধ ফুল দুই প্রকার তন্মধ্যে এক থাকি শ্বেত বর্ণের ফুল আহারীয়, পূর্ব্ব রজনী প্রস্ফুটিত. এই ফুল গুলিকে, পুষ্প কাণ্ড হইতে তুলিয়া, তাহার অপেক্ষা কৃত বৃন্তের কঠিনাংশটুকু পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত ফুল গুলিকে বাছিয়া, ফুলের পরিমান বিবেচনা করিয়া লবণ মাখাইয়া নটেশাক ভাজার মত তৈলে বা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে ; সঙ্গেতে ভর্জ্জিত ফুল, অন্ন-রুটীর বা লুচীর উত্তমোপকরণ প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন উচ্চপাক ব্যাবস্থা মতে, যেমন পটল—গোলালুর এবং ফুলকপি প্রভৃতির নিরামিষ কালিয়া পোলাও প্রস্তুত করাহয় ; সেই রূপ রজনীগন্ধ ফুলের কালিয়া পোলাও প্রস্তুত করিলে অতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইবে তাহার কোন সংশয় নাই। যেমন নির্ব্বিঘ্নে শজিনাফুল, এদেশে খাদ্য রূপে প্রায় সকলেই ব্যবহার করিয়া আসিতে ছেন আবার রজনীগন্ধ ফুল সকলেই কথিত প্রকারে, ভোজন করিয়া দেখিবেন ; শজিনাফুল অপেক্ষা রজনীগন্ধ ফুল, কতদূর সুখাদ্য দ্রব্য তাহা সহজেই অনুভব হইতে পারিবে। এবং উহা অপেক্ষা কত অংশে পুষ্টিকর সামগ্রী, তাহাও অপ্রকাশ থাকিবেনা। এস্থলে বলা বাহুল্য. গোল আলু, কপি, পূর্ব্ব প্রচলিত খাদ্যান্তর বলিয়া এখনও আমাদের প্রাচীনা বিধবা হিন্দুরমণীরা, এপর্য্যন্ত অনেকে ব্যবহার করেন নাই। আশা করা যায়, রজনীগন্ধ ফুল যে সর্ব্ব সাধারণের আপত্তি রহিত ভোজ্যবস্তু হইবে, তাহার আর সংশয় দেখিতেছিনা। যদ্যপি রজনীগন্ধ ফুল, সর্ব্বলোক রসনায় স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাহইলে ইহার কতদূর উপকারিতা বৃদ্ধি পাইবে, তদ্বিষয় বলিবার আবশ্যক বোধ করিনা।

গাজীপুর প্রদেশীয় কৃষকেরা, রজনীগন্ধ ফুলের অন্যান্য আবাদের মত আবাদ করিয়া, আষাঢ় শ্রাবণ মাস হইতে, পৌষ মাঘ মাসপর্য্যন্ত, দিন দিন উহার ফুল সংগ্রহ করিয়া, আতর গোলাপ প্রস্তুতি কারখানায়, সেরকরা তিন চারি আনা দরে, ফুল বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করে। হাকিমী চিকিৎসকেরা বলেন, "রজনীগন্ধ পুষ্পজাত আতর ও পুষ্পকজল, চোক উঠা

বা চোক্ ঝামরাণ পীড়ার অতি সুন্দর ঔষধ; উহা পায়রার পালক দ্বারা, দুই তিন দিন চারিপাঁচবার করিয়া চক্ষুমধ্যে দিলে, এবং ঐ জল অতি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া, বারম্বার চক্ষে ব্যবহার করিলে, শীঘ্র চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। সেই জন্য এই আতর পুষ্পকজল অন্যান্য আতর অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক, এপ্রদেশে আতর প্রস্তুত নাহইতে পারে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপে ব্যবহৃত হইলে, অবশ্যই ক্রমে ক্রমে ইহার আবাদ ও চলিতে পারে। এবং আবাদে যে কিছু লাভ হইবে না; ইহাবলিতে পারা যায় না। রজনীগন্ধ ফুল কেবল পুষ্পপ্রিয় দেব দেবী উপাসনায় একাল পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল, এখন উদরোপাসনায় সর্ব্বত্রেই খ্যাতি লাভ করিতে পারিবে ইহা ভরসা স্থল।

শ্রীপ্যারিমোহন গোস্বামী
মণিখালী কৃষি পাঠশালা

মানকচু।

পূর্ব্ব বাঙ্গলায় অধিক পরিমাণে মানকচুর চাষ হইয়া থাকে; কিন্তু মধ্যবাঙ্গলায় ইহার প্রতি তাদৃশ কেহ যত্ন করেন না। ইহাএকটী লাভের সামগ্রী। তরকারীর জন্য ইহাআদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্থান এবং চাষের দোষেতে দুই একটী কচু এত অপকৃষ্ট হয় যে, খাইবামাত্র গলাচুলকাইতে থাকে। কিন্তু ভাল যায়গায় উত্তমরূপ চাষ করিয়া যে কচু জন্মান যায়, তাহাঅপেক্ষাকৃত অনেক বড় ও অত্যন্ত উত্তম হয় এবং তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কোন দোষই থাকেনা।

ইহার চাষ দুইপ্রকার। প্রথমতঃ যে স্থানে কচুরোপণ করিতেহইবে তাহা ভালরূপ আবাদ করতঃ কার্ত্তীক মাসের প্রথমে একবার ও শেষে একবার এই দুইবার উক্ত জমীতে চাষ দিবে। এইরূপ অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসেও দুই

দুই বার চাষকরিয়া, মৃত্তিকা চূর্ণবৎ করিতে হইবে। ঘাস জঙ্গল প্রভৃতি বাছিয়া মইদিয়া সমতল করিবে। তদনন্তর দুইহস্ত পরিমিত বর্গক্ষেত্র জমির চারিপার্শ্বে চারিটী ২ দুইহাত গভীর করিয়া সমুদায় ক্ষেত্রে এইরূপ গর্ত্ত করিবে অর্থাৎ দুই দুই হাত অন্তর এক এক শ্রেণি রোপণ করিবে এবং প্রতিশ্রেণিতে দুই দুই হাত অন্তর এক একটী চারা রোপণ করিবে। ছোট ও বড় সকলপ্রকার চারাই রোপণকরা যাইতে পারে।

রোপণের পূর্ব্বদিবস কচুর মাথা হইতে উপরের দুইটী চক্ষু সহিত আধহাত কাটিয়া উক্ত কর্ত্তীত স্থানে কিঞ্চিৎ ছাইমাখাইয়া রাখিবে এবং পরদিবস উল্লিখিত রূপে প্রত্যেক গর্ত্তে এক একটী রোপণকরিয়া যাইবে।

রোপণের পরদিবস যদিবৃষ্টিনা হয় তবে তৎপরদিবস অর্থাৎ রোপণের দুইদিবস পরে প্রেত্যেক চারারমূলে এক একটু জল সিঞ্চনকরিবে। ফাল্গুণমাসের মধ্যে আরবৃষ্টি নাহইলে উক্ত মাসের শেষেও সমুদায় চারার মূলে একদিন জলদিবে। অতঃপর দেখাযাইবে যে প্রেত্যেক চারাহইতে দুইটী ২ সাদা পাতা নির্গত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক চারার মূলে কিঞ্চিত ছাই ও তদুপরে কিঞ্চিত মৃত্তিকা চাপা দিবে। ক্রমে গাছ যত বাড়িবে, তত ইহার মুলে ছাই ও মৃত্তিকা দিতে হইবেক।

ক্ষেত্রে কোনরূপ জঙ্গল কিম্বা আগাছা হইলে, তাহা ভালরূপ নিড়াইয়া দেওয়া এবং মধ্যে মধ্যে জমী কোদলাইয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

বর্ষার জল কচুতে লাগিলে, তাহা অত্যন্ত অপকৃষ্ট হয় এবং তাহাতে মুখ লাগা দোষ জন্মে অতএব যাহাতে কচুর গায়ে বর্ষার জল না লাগিতে পারে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কচুর ফুল হওয়া অনেকে দোষের বিষয় বিবেচনা করেন, অতএব তন্নিবারণ জন্য কোরক অর্থাৎ প্রথম যে দুইটী পাতা বাহির হয়, তাহার ঠিক মধ্য স্থানে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিলেই আর ফুল হওয়ার আশঙ্কা থাকিবেক না। দোয়াঁস মৃত্তিকাই ইহার চাষের উপযুক্ত স্থান। এঁটেল মৃত্তিকা অপেক্ষা বালুকাময় মৃত্তিকাতে ভাল হয় বটে, কিন্তু কচু অত্যন্ত সরু এবং অধিক সিট্টরস বিশিষ্ট হয়।

দ্বিতীয় প্রকারে প্রথমের ন্যায় কচুর মাথা কাটীয়া রোপণ করিতে হয় না। গাছ উঠাইয়া লইলে সেই স্থানে যে সকল শিকড় থাকে তাহা হইতে চারা উৎপন্ন হয়। গাছ উত্তোলন করিয়া না লইলে, সেখানে অধিক চারা জন্মে না। উক্ত শিকড় হইতে যেসমুদয় চারা জন্মে সেই সকল উঠাইয়া রোপণ করিতে হয়। এই শেষোক্ত কচু প্রথম বৎসর অত্যন্ত অপকৃষ্ট থাকে অধিক বৃদ্ধিও হয় না। দ্বিতীয় বৎসর ইহা অপেক্ষাকৃত উত্তম এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কচু রোপণ করিয়াই ক্ষেত্রের চারি ধারে উত্তম রূপ বেড়া দিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কেননা শুকর একং সজারু একবার ক্ষেত্রের মধ্যে যাইতে পারিলে সমুদয় কচু একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব যাহাতে এই সমুদয় জন্তু ক্ষেত্রে মধ্যে না আসিতে পারে, তজ্জন্য ক্ষেত্রের চারি পার্শ্বে উত্তম মজবুত বেড়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ম্যাঙ্গোষ্টিন

পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীগণের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যেমন অনুপম আনন্দের বিষয়, তদ্রূপ বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ সমূহের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াও সর্ব্বাপেক্ষা আহ্লাদের বিষয়। বন এবং উপবন ভ্রমণে বহির্গত হইলে কত প্রকার বৃক্ষ ও লতাবলী নয়নপথে পতিত হয় তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃজিত পদার্থ নিচয়ের বিষয় যতই পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্তহই ততই মানস-মন্দিরে যে কি অনির্ব্বচনীয় ও অননুভূত সন্তোষের উদয় হয়, তাহা বর্ণনাতীত। বিগত নিদাঘকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে নিপীড়িত দেহ সুশীতল করনার্থে উদ্যান ভ্রমণ মানসে বহির্গত হইলাম। উপবনে উপস্থিত হইবামাত্র নানাজাতীয় উদ্ভিদগণ সম্মুখে উপনীত হইয়া, সাতিশয় পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। এবং তখন ইহাই উপলব্ধি হইতে লাগিল, ঐ সকল পদার্থের একটীও নিষ্প্রয়োজনে সৃজিত হয় নাই। কিন্তু অলস মানব-বুদ্ধি তাহাদের

গুণানুসন্ধানে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন রহিয়াছে। আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে জাম জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ নয়ন গোচরকরিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, উহার নাম ম্যাঙ্গোষ্টিন বৃক্ষ। উহার পত্র সকল জাম পত্রাপেক্ষা পুরু, মধর এবং অতীব শোভাযুক্ত। শাখাসকল দেখিতে অতিকোমল বলিয়া বোধহয়। আবার বৃক্ষ-কাণ্ডও এক অভিনব শোভাযুক্ত, সহসা দৃষ্টিকরিলে অনুভূত হয়, যেন একজন খর্ব্বাকৃতি মানব একটী গোলাকার প্রকাণ্ড বোঝা মস্তকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ফল সকল গাবেরন্যায়। অপক্কাবস্থায় উহার আস্বাদ বিস্বাদ, কিন্তু সুপক্ক ফল অতিমধুর। ইহা ফলের জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্দেশ প্রবাসী ইংরাজগণ অতীব আনন্দ সহকারে উহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং সহজেই বোধহয় উহা সধারণের ভাগ্যেঘটেনা অধিকন্তু উহার নামও সাধারণের নিকট বড় পরিচিত নহে। যেহেতু ইহা বিদেশাগত বৃক্ষ।

ইহার চাষ অতি সহজ একবার বৃক্ষটী প্রস্তুত করিতে পারিলে বহুদিন ফল প্রদান করে। কিন্তু ইহা বীজহইতে উৎপাদন করাঅতীব কষ্টসাধ্য বলিয়া লোকে সচরাচর কলমই প্রস্তুত করিয়া থাকে। কলম করিবার প্রক্রিয়া নানা প্রকার আছে এবং কৃষিতত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, বিরক্তিকর হইবে বলিয়া পুনরুল্লেখ করিলামনা। গাবগাছের চারা লইয়াই উক্তগাছের সহিত কলম করিয়া গাছ প্রস্তুত করে। যেস্থানে ইহারোপণকরা হইবে তথাকার মাটীর পাট পরিপাটী করিয়া তাহাতে একটী গর্ত্তকাটিয়া তদুপরি কলমটী সাবধান পূর্ব্বক বসাইতে হইবে। অনন্তর সর্ব্বদাই বিশেষ যত্নের সহিত ইহার তত্ত্বাবধান করিলে ক্রমশঃ বৃক্ষ সকল বর্দ্ধিষ্ট হইয়া যথাকালে সুমধুর ফল প্রদান করিয়া থাকে; এইরূপে ম্যাঙ্গোষ্টিন বৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিলেই সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যেই উহার ফলোপভোগহইতে পারে।

শ্রীকরালিপদ মুখোপাধ্যায়
সাং ভাস্তাড়া

ওসেজ অরেঞ্জ (OSAGE ORANGE)

বা

চিরস্থায়ী মজবুত বেড়া করিবার গাছ।

পূর্ণ শস্যক্ষেত্রে উত্তম বেড়ার অভাবে অস্মদ্দেশীয় কৃষকদিগকে গো মহিষ প্রভৃতি জন্তু হইতে যে কত প্রকার ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। গো মহিষাদি জন্তুর উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য, আমাদের দেশের কৃষকেরা প্রতিবৎসর বহুযত্ন ও পরিশ্রম করিয়া ক্ষেত্রের চারিপার্শ্বে বাঁশ দিয়া বেড়াদিয়া থাকে এবং রাত্রিকালে বন্যশুকর কিম্বা অন্য কোন জন্তু যাহাতে উক্ত বেড়া উল্লম্ফন কিম্বা ভগ্ন করিয়া ক্ষেত্রস্থ শস্য নষ্ট না করিতে পারে, এ নিমিত্ত কৃষকেরা একটী বাঁশের উপরার্দ্ধ দুইভাগে চিরিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে পুতিয়া উপরোক্ত চেরা অর্দ্ধাংশে দড়ী বাঁধিয়া দেয় এবং ক্ষেত্রের নিকটস্থ কোনস্থানে উচ্চ এক মাচা করিয়া তাহার সহিত ঐ দড়ী সংলগ্ন করিয়া দেয়। এবং রাত্রিকালে কোনব্যক্তি ঐ মাচায় থাকিয়া উক্ত দড়ীদ্বারা চেরা বাঁশে বিকট শব্দ উৎপাদন করতঃ বন্য শুকর প্রভৃতি জন্তুদিগকে তাড়াইয়া থাকে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কৃষকেরা এতযত্ন ও পরিশ্রম করিয়াও সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। বন্য শুকর প্রভৃতি জন্তু সকল বেড়াউল্লম্ফন অথবা ভগ্ন করিয়া ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপে বহুপরিশ্রম করিয়াও বিফল প্রযত্ন ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াতে কৃষকদিগের মনে যে কিরূপ ক্ষোভের উদয় হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কেহ কেহ এরূপ মনে করে যে এই সমুদয় উপদ্রব অনীবার্য্য এবং অশ্যস্থাবী অথবা যদিও কোনরূপ উপায় থাকে তাহা অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য এবং কষ্ট কর অথবা একরূপ দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। অতএব ইহার কোনরূপ প্রতিবিধানের বিষয় জানিতে পারিলে কাহার না অন্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত হয়?

শিরনামাঙ্কিত ওসেজ অরেঞ্জ (Osage orange) ছোট ছোট ধারাল কণ্টক বিশিষ্ট একপ্রকার উত্তর এমেরিকাজাত গুল্ম বিশেষঃ। উদ্ভিদ-বিদ্ পণ্ডিতেরা ইহাকে ম্যাকলুরা ঔরেনটাইকা (MacluraAurantiaca) কহিয়া থাকেন। বেড়ার নিমিত্ত, ইউনাইটেড্ ষ্টেটে (United State) ইহা বহুকাল হইতে আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এমেরিকান সিভিল ওয়ারের (Civil War) দুই এক বৎসর পূর্ব্বে ল কোং এর দ্বারা ইহার কিছু বীজ ইংলণ্ডে আমদানি হয় কিন্তু তৎকালে ইহার মূল্য অধিক থাকা বশতঃ ইহা সকলে ক্রয় করিতে পারেন না এবং উক্ত যুদ্ধের জন্য আর অধিক বীজ ও আমদানি হইতে পারে নাই। পরে যখন এই যুদ্ধাবসানে অধিক পরিমাণে বীজ আমদানি হয় ; তখন অপেক্ষাকৃত ইহার মূল্য অল্প হওয়ায় প্রায় অনেকেই ইহাক্রয় করেন এবং ইহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।

যে ক্ষেত্রে ইহার বেড়া দিতে হইবে, প্রথমতঃ তাহার চারিধারে উত্তমরূপে কোদলাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে এক এক দিকে দুই দুই লাইন করিয়া অর্দ্ধহস্ত অন্তর গর্ত্ত করিয়া যাইবে, পরে প্রত্যেক গর্ত্তে একএকটী গুল্ম রোপণ করিয়া ইহার মূলে মাটীদ্বারা আবৃত করিয়াদিবে। এবং প্রোথিত অংশ হইতে আন্দাজ দুই ইঞ্চি বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে উক্ত কর্ত্তিত স্থানের চারি পার্শ্ব হইতে ঘন নিবিড় ডাল সমূহ নির্গত হইবে। এইরূপ প্রোথিত অংশ হইতে ছয় ইঞ্চি বাদ দিয়া দ্বিতীয় বৎসরে এবং ৪ হাত বাদ দিয়া তৃতীয় বৎসরে একবার অগ্রভাগগুলি কাটিয়া দিবে। এইরূপে তৃতীয়বার কর্ত্তনের পর ইহা এত ঘন ও নিবিড় হইবে যে, গো মেষাদির কথা কি ইন্দুর ও সর্প প্রভৃতি ক্ষুদ্রপ্রাণি ও ইহার মধ্যদিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহার আরো বিশেষ গুণ এই যে ইহা একবার বর্দ্ধিত হইলে ইহা চিরস্থায়ী বেড়া হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার ইহার জীর্ণ সংস্কার কিম্বা অপর নূতন বেড়ার আর আবশ্যক করে না।

শীতকালেই ইহা রোপণের প্রশস্ত সময়।

তাল।

উদ্ভিদ্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, দেশ ভেদে উদ্ভিদ ভেদ হইয়া থাকে। স্পষ্টত সেই বিভিন্নতা এই উদ্ভিজ্জ জগতে কাহার না নয়নে পরিলক্ষিত হইতেছে? গ্রীষ্মমণ্ডলে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে, তাহা হিম-মণ্ডলে উত্তম হয় না, এবং হিম-মণ্ডলের উদ্ভিজ্জও সম-মণ্ডলের সেরূপ শোভা বিকাশ করে না। তবে দেখা যাইতেছে যে গ্রীষ্ম-মণ্ডলে, উদ্ভিদ্ সমূহের প্রধানতম উৎপত্তিক্ষেত্র। এই মণ্ডলে ধান্য, ইক্ষু, তাল, আম্র, নারিকেল প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় ভক্ষদ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই মণ্ডলের কোন কোন বৃক্ষ অতি সুমধুর ফল প্রদান করিয়া মানব রসনায় যথেষ্ট তৃপ্তিসাধন করিতেছে, কোন কোন বৃক্ষ সুশীতল ও সুখপেয় বারি প্রদানপূর্ব্বক তৃষ্ণার্ত্ত জন সকলকে স্নিগ্ধ ও সুখিত করিতেছে, কোন কোন বৃক্ষ নেত্র তৃপ্তিকর নানাবিধ কুসুম-রাজিতে সমলঙ্কৃত হইয়া বনভূমির শোভা দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতেছে, এবং কোন কোন বৃক্ষ নিরন্ন-জনের জীবন রক্ষার প্রধান সম্বল হইয়া অনুপম শক্তি বিকাশ করিতেছে। এক্ষণে মানবগণের প্রগাঢ় যত্নে ও বিজ্ঞান বলে এক মণ্ডলের বৃক্ষ মণ্ডলান্তরে উৎপন্ন করা যাইতেছে বটে, কিন্তু সেই সেই মণ্ডল পরিশ্রমোৎপন্ন বৃক্ষ সমূহের স্বাভাবিক আবাস ভূমি নহে। দেশ ভেদে উদ্ভিজ্জ ভেদ হওয়াতে মনুষ্যের খাদ্য দ্রব্যাদিরও অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। রাই নামক শস্য, সুমেরু মণ্ডলবাসী জনসাধারণের প্রধান খাদ্য দ্রব্য। তথায় ধান্যের উৎপত্তি হয় না। গোধূম, সুমেরু মণ্ডলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসীগণের জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন। ইহার দক্ষিণে ধান্যের উদ্ভবক্ষেত্র। এই ধান্যের সহিত নারিকেল, তাল, ইক্ষু প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্যেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফরাসী দেশের দক্ষিণ ভাগ হইতে অয়নান্তবৃত্ত পর্য্যন্ত সীমার মধ্যে গোধূম ব্যতিরিক্ত যব, ভূট্টা, ধান্য প্রভৃতিও মনুষ্যের জীবন ধারণের প্রধান সামগ্রী। সংক্ষেপে এই কথা

বলিলে যথেষ্ট হইতেছে যে, দেশ ভেদে উদ্ভিজ্জ ভেদ কেন, সকলই বিভিন্ন হইয়া, সর্ব্বকারণ সেই করুণাময় ভগবানের অনন্ত-মহিমা প্রচার করিতেছে। অতএব এতদ্বিষয়ে অধিক লেখা অতিরিক্ত বোধে বিরত থাকিলাম। এক্ষণে প্রবন্ধ শির্ষক বিষয়টী আমার অদ্যকার লক্ষ্য, যতদূর পারি এইটীর সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করণ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদের বঙ্গ প্রদেশের অপরাপর স্থান সকল অপেক্ষা বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলি, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থান সমূহের মধ্যে বহুতর তাল বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বৃক্ষ দৃশ্য-শোভায় কোন অংশে মন্দ বলা যাইতে পারে না। ইহার উপকারিতা বিষয়ে বলিবার যথেষ্ট কথা আছে, তাহা বলিবার নিমিত্ত আজ অগ্রসর হইব। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, বৈজিক কারণে সচরাচর তাল দুই প্রকার হইয়া থাকে, যথা ফলা ও অফলা, যে গাছে সময়ক্রমে ফল প্রসব করে তাঁহাকে ফলা, আর যে গাছে ফল প্রদান না করিয়া কেবল লম্বা লম্বা জটাকার একরূপ ফল ধরে তাহাকে অফলা বলে। স্থান বিশেষে ঐ জটাকার ফলকে তাল রাঁড়া কহিয়া থাকে। এবং ঐ গাছকেও রাঁড়া তাল গাছ বলিয়া নাম করণ করিয়াছেন; আবার কোন কোন স্থানে মদ্দা গাছও বলিয়া থাকেন। টিকাওয়ালারা তাল রাঁড়াদ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুল ও টিকা প্রস্তুত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে তদ্ভিন্ন জালানি কাষ্টেরও কার্য্য করে রজকেরা ইহার ছায়ে উত্তম ক্ষার প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র পরিষ্কার কার্য্যে ব্যবহার করে।

যে সময়ে "অসিফলক" সহিত তালের পুষ্পাদণ্ডে অর্থাৎ মোচা বহির্গত আরম্ভ হয়, সেই সময়ে শিউলী বা তাহাদের পূর্ব্ব শিক্ষানুসারে ঐ নির্গত পুষ্পাদণ্ডের স্থান বিশেষে কাটিয়া গাছ হইতে রস বাহির করিয়া লয়। এই তাল বৃক্ষ জাত রসকে "তাড়ী" বলে, তাড়ীর মাদকতা শক্তি আছে। মাদক প্রিয় লোকেরা তালরস পান করিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করত নৃত্য-গীতাদি করিয়া সুখের পরাকাষ্ঠা সাধন করে। কিরিঙ্গি রুটী বিস্‌কুট প্রস্তুত বিষয়ে উহার আবশ্যক হয়; এতদ্ভিন্ন যেমন খেজুর-রস বা ইক্ষুরস জালদিয়া উত্তম গুড় প্রস্তুত করে, তালরসকে সেইমত গুড়ে পরিণত করে, আবার গুড়কে

প্রক্রিয়ান্তর করিয়া উৎকৃষ্ট মিশ্রি প্রস্তুত করে। এই মিশ্রিকে "তাল মিশ্রি" বলে। তাল মিশ্রি খেজুর ও ইক্ষুগুড়জাত মিশ্রির প্রায় অনুরূপ হয় কিন্তু ততদূর দানাদার হয় না। তাল মিশ্রির গুণাগুণ সম্বন্ধে এই কথায় শেষ করিব ইহা ধাতুস্খলন রোগের একটী অব্যর্থ মহৌষধ ইহার আস্বাদন দেশ প্রচলিত মিশ্রির ন্যায় মিষ্টরসে পরিপূর্ণ।

অনেক গাছে তালফল প্রায় বার মাসই ফলিতে দেখা যায়। যে গাছে বার মাস তাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে "বার মাসে গাছ বলে। ফলতঃ তাল ফলিবার প্রকৃত সময় ফাল্গুণ ও চৈত্র মাস। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে অপক্ক তালের মধ্যস্থ শস্য যাহাকে "তালশাস" বলিয়া আদরে ভোজন করা হয়; ক্রমে পক্কতাল ও তালপিষ্টকাদি ভোজন করিয়াও নিরস্ত নহি। পাকা তালের সারাংশ বাহির করিয়া লইয়া যে অবশিষ্ট আঁটী থাকে তাহাও পরিত্যাজ্য নহে। একটু ছায়াযুক্ত স্থানে তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, আবার সময়ান্তরে "তাল আঁকুর" নাম ধারণ করিয়া তাহার মধ্যস্থিত শাঁস যেরূপ ভক্ষ্যসামগ্রী হয় তাহা প্রায় এদেশীয় অনেকেই ভক্ষণ করিয়া তাহার স্বর্গীয় আস্বাদন অনুভব করিয়া থাকিবেন। তাল অনেক জাতের আছে, তন্মধ্যে "হেঁড়ে তালই" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তালফল যে বহুকাল হইতে এদেশে আহারীয় রূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? স্পষ্টত এই প্রমান দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বকার স্বাস্থ্য বিদ্যা বিশারদ মহাশয়েরা তাল ভোজনের নিষেধ বিধি ব্যবস্থাছলে এই কথা বলিয়াছেন, যথা "তালে শরীর নাশ সপ্তমীর যোগে। অষ্টমীতে মূর্খহয় নারিকেল ভোজনে" আর ও দেখাযায় মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমাস্কন্ধে এই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয় সহচর বলদেব এবং সুদামাদি সখাগণ সঙ্গে যখন তালবনে গোচারণ করিতে গিয়া তালবনবাসী দানুকাসুর সহ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া, তাহাকে মহাবীর বলদেব এক চপেটাঘাতে নিধন করিয়া তালবনের শান্তি সংস্থাপন করতঃ রাখালগণ সমবেত হইয়া মহানন্দে তাল ভোজন করিয়াছিলেন। সেইজন্য বলরামের "তালভৃৎ" একটী নাম হইয়াছে।" যুগান্তরীণ কথায় বিশ্বাস হইতেছে যে, তাল, কখনই ভিন্ন দেশীয় উদ্ভিদ নহে। এই কথায়

আরও একটী বোধ হইতেছে যে, তৎতৎ কালের কৃষকের তালের উপকারিতা সুন্দররূপ অবগত ছিলেন ও তালের স্বতন্ত্ররূপ আবাদ প্রথা প্রচলিতছিল। কেননা একটী বা দুইটী গাছ একস্থানে থাকিলে বাগান কিম্বা বন বলা যাইতে পারেনা; এক স্থানে বহু বৃক্ষের সমাবেস না থাকিলে, বাগান বা বন শব্দার্থ কি রূপে রক্ষা পাইতে পারে? অতএব পূর্ব্ব সময়ে যে তাল স্বতন্ত্ররূপ আবাদ হইত তাহার সংশয় দেখি না

তালের স্বতন্ত্ররূপ আবাদ করিতে হইলে, আবাদে বিশেষ কোন ব্যয়াধিক্য দোষ নাই। প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতে তাল জন্মিতে পারে, তন্মধ্যে কঙ্কর বিশিষ্ট আটাঁল মাটীতে তাল অতি উত্তম জন্মে। তাল বৃক্ষের পোষণ সামগ্রী উক্ত মৃত্তিকাতে যত পরিমাণে আছে, তাহা অপরাপর ভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাল বাগান করিতে হইলে অগ্রে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া তাহার চতুপার্শ্বে পগার কাটিতে হর। আষাঢ়মাসে সেই ভূমিতে দোয়ার তেয়ার চায করিয়া রাখিতে হয়। চতুর্দ্দিগে তিনহাত অন্তর অন্তর করিয়া অর্দ্ধহস্ত গভীর করিয়া সারিবান্ধিয়া, একটী একটী চতুর্দ্দিকে আটঅঙ্গুলী পরিসর গর্ত্ত কাটিয়া রাখিবে শ্রাবণমাসের শেষ হইতে ভাদ্রমাসের শেষপর্য্যন্ত নিত্য নিত্য যে পাকাতাল ব্যবহার করিয়া তাহার যে সকল আঁটী সংগ্রহ হয়; তাহা দিন দিন সেই ক্ষেত্রের খনিত প্রতি গর্ত্তে একটী একটী তালআঁটী প্রোথিত করিতে হয়। এই সময়ে এই সতর্কতা পূর্ব্বক তালআঁটী রোপণ করিতে হইবেক যে, আঁটীর মুখ যেন উর্দ্ধদিকে থাকে, নচেৎ নিম্নদিকে মুখ পড়িলে অফলা তাল জন্মিবে। রোপিত তালআঁটী দুই তিন মাস পরে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। তাল এক বীজ দলীয় বৃক্ষ" এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ সকলের চারা বহির্গত হইবার সময় অগ্রে কেবল একটী মাত্র পত্র দৃষ্ট হইতে থাকে। কার্ত্তিকমাসের শেষ তাল রোপিত "বাবুই" বা "মুঞ্জতৃনের" মূল পূর্ব্ব প্রোথিত আঁটীর মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক আছে; সেই সেই ফাঁকে ফাঁকে রোপণ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ পরিমিত ক্ষেত্রে বাবুই কিম্বা মুঞ্জ মূল রোপণ করা শেষ হইলে তাল আবাদের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

যদি মাঘ ফাল্গুনমাসে সুবৃষ্টি হয়, তাহাহইলে একবার সাবধানতায় লাঙ্গল দ্বারা উক্ত ক্ষেত্রে চাসদিতে হইবে। যেন কোন মতে তালচারাও বাবুই মুঞ্জের মূলে লাঙ্গলের টাঁড় না লাগে। এইরূপ প্রতি বর্ষের কার্ত্তিক ও মাঘ ফাল্গুণ মাসে একখানি করিয়া চাস দেওয়া ভিন্ন তাল বাগানের অন্যকোন তদ্বির করিতে হয় না। প্রথম বর্ষ ভিন্ন, দ্বিতীয় বর্ষ হইতে বাবুই তৃণ দুইবার কর্ত্তন করা আবশ্যক, একবার আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে, আর একবার মাঘ ফাল্গুণ মাসে। মুঞ্জতৃণ কেবল বৎসরের মধ্যে পৌষ মাঘের মধ্যে একবার কর্ত্তন করা হয়। এই দুই তৃণ কেবল তালবাগানের বাৎসরিক ব্যয় ও পরিশ্রমের ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়। বৎসর গতিকে প্রতিবিঘায় উভয়বিধ তৃণ দ্বারা দশ টাকা লাভও থাকিতে পারে। বাবুই মুঞ্জ একবার রোপণ করিলে বহুকাল থাকে। দুই তিন বৎসর অন্তর ফাল্গুন চৈত্র মাসে একবার বাঁশে পোড়া দিবার মত পোড়াইয়া দিলে; বাবুই ও মুঞ্জ্ অধিক জন্মায়। ইহাতে তাল চারার কোন ক্ষতি হয় না।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, তাল বৃক্ষের ফল ধরিতে অধিক সময় সাপেক্ষ করে; এমন কি যে মৃত্তিকাতে তালবৃক্ষের পোষণ সামগ্রী অধিক পরিমাণে থাকে, সেখানে ও তাল ফলিতে অন্যূন ২৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরাধিক সময় লাগে। যে সকল ভবিষ্যৎ চিন্তাশীল কৃষকগণ তাল বাগান প্রস্তুত করিয়া যান, কেবল তাহাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদি নিয় বংশধরগণের যথেষ্ট আয়ের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিউলীদিগের মুখে শুনিয়াছি "একবিঘা তালের আয়ে দশজন ভদ্রলোকের সুন্দর রূপ গুজরান। চলে"। দেখা যাইতেছে যে তালের কোন অংশই বাদ পড়ে না অবশ্যই লাভের বিষয় তাহার ভুল নাই।

পাঠকগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি? যখন আমাদের আর্য্যশাসন কালে প্রাচীন বংশীয়েরা তালপত্র নির্ম্মিত কুটিরে বাস করিতেন, যখন তাল পত্র রক্ষিত ছত্রে তৎকালীয় বরিষার মুষলধারাবৎ বারি ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ভয়ঙ্কর তাপ নিবারণ করিতেন, যখন দুরন্ত নিদাঘকালীয় গ্রীষ্মের গুরুতর কষ্ট তালপত্র বিরচিত তালবৃন্দের সুশীতল বায়ুতে স্নিগ্ধ হইতেন, যখন

তালবৃক্ষ বিনির্ম্মিত দ্রোণী (*) দ্বরা পারাবতরণ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, যখন তালপত্র নির্ম্মিত আসনে শয়ন উপবেশন ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিতেন, যখন তালপত্রকে লেখ্যরূপে ব্যবহার করিতেন, তখন এই আর্য্যস্থান কি সুখের স্থান ছিল? এখন এই সুসভ্য শাসনে উত্তম অট্টালিকার বাস করিতেছি; এখন বৃষ্টিতাপ নিবারণে, হরিণমার্কা, শার্দ্দুল মার্কা, মেষ মার্কা প্রভৃতি ছাতা পাইতেছি; এখন বায়ু সেবন জন্য সুচারু কারুরচিত নানারকমের পাখা পাইতেছি, এখন পারা বতরণ জন্য কতপ্রকারের সুখতরি পাইতেছি; এখন লিখিবার জন্য ফুলিস্‌ক্যাপ প্রভৃতি ভর, বতর, কাগজ পাইতেছি, আসন শয্যারত কথাই নাই, তবে কেন শান্তি পাই না? তবে কেন বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর কবলে লক্ষলক্ষ লোক কবলিত হইতেছে, তবে কেন দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া উদরান্ন যুটিতেছে না, আপনারা বলিতে পারেন এই উপস্থিত ভীষণ কষ্টের প্রকৃত কারণ কি! আপনারা বলিতে পারেন কি উপায়ে প্রকৃত শান্তি মিলিবে?

শ্রীপ্যারীমোহন গোস্বামী।

ZEA MAYS.

MAIZE—INDIAN CORN.

ভুট্টা, মক্কা, বা জনার।

মার্কীন দেশজাত যতপ্রকার মনুষ্যের জীবনধারণার্থ শস্য আছে, তন্মধ্যে ভুট্টা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শস্য। যেমন নানাপ্রকারের শস্য, ওটস্, রাই প্রভৃতি শস্য মানবজাতীর খাদ্য, তদ্রূপ ভুট্টা এই সকল শস্য অপেক্ষা প্রধান ও

* সাধারণ কথায় যাহাকে "ডোঙ্গা" বলা যায়।

অসংখ্য প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। এই অসংখ্যবিধ ভুট্টা একজাতীয় হইতে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে কি না, তাহা এখন ও স্থিরীকৃত হয় নাই।

তবে এইরূপ একজাতীয় শস্য হইতে বহুবিধ ভুট্টা অক্ষাংশ (Latitude) বা চাষের বিভিন্নতা, মৃত্তিকা, দেশভেদ, বায়ু ও ঋতুর প্রভেদ প্রভৃতি কারণে মূল জাতীয় হইতে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকিবেক। যদিও ভুট্টা জাতি ইয়ুরোপীয় দিগের দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে সভ্য জগতে অবিদিত ছিল, তত্রাচ এখনও এমন অনেক জাতীয় ভুট্টা আছে, যাহা পৃথিবীর গ্রীষ্ম ও সমমণ্ডলের মধ্যস্থ যে কোন স্থানে জন্মাইতে পারে। অনেকে ভুট্টার জন্মস্থান লইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন; কেহ কেহ ইহাকে এশিয়া মহাদেশ জাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার আকৃতি কোন প্রাচীন গৃহ প্রাচীরে খোদিত বা এশিয়ার প্রধান খাদ্য বলিয়া কোন পুরাতন লেখক দ্বারা বর্ণিত হয় নাই।

সে যাহা হউক এই শস্য আমেরিকার প্যারাগুয়ে নামক স্থানের আর্দ্র-জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে। বন্যভুট্টার দানা সকল প্রথমতঃ তুঁষময় পদার্থে আবৃত থাকে, তৎপরে দুইবৎসর বন্যজাত ভুট্টার চাষ করিলে তুঁষময় পদার্থ অন্তর্হিত হইয়া ক্ষেত্রজাত ভুট্টার ন্যায় হয়।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীত হইতেছে যে নূতন পৃথিবীই ভুট্টার জন্মস্থান; অপীচ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম বাসীরা চাষ করিয়া থাকে; এবং নূতন মেক্সিকো, য়্যারিজোনা, কালিফোর্ণিয়া, ন্যাভেডা ও ইউটা প্রভৃতি দেশস্থ লোকের প্রধান খাদ্য। ইণ্ডিয়ান দিগের একমাত্র জীবিকা ও ইহারা কাহার ও নিকট হইতে ইহার চাষ শিক্ষা করে নাই।

পেরুর অন্তঃপাতী য়্যারিকুইপা নামকস্থানে ১৯ ফুট মাটির নিম্নে একটা গোরেতে শবের সহিত মৃত্তিকা পাত্রে ১৩ সের দানা বিশিষ্ট একটা ভুট্টা পাওয়া গিয়াছিল। ইহার অতি অল্প অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া ৪॥ ইঞ্চ পরিমাণ আছে; উহা এক্ষণে স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। একজন ডাক্তার য়্যারিজোনা নামকস্থানের নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বতের গুহার ভিতরে কতক-

গুলি ভুট্টা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি স্মিথ্সোনিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে।

কলম্বস যখন কিউবা নগরে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভুট্টার চাষ দেখিয়াছিলেন, এবং আর ও পিল্‌গ্রিমস ফাদার রা যখন প্লিমাউথে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ও আমেরিকার ইণ্ডিয়ান দিগকে বিস্তৃত রূপ চাষ করিতে দেখিয়া ছিলেন। ভুট্টার আর ও একটী ঐতিহাসিক বিষয় এই যে, দক্ষিণ আমেরিকায় শ্বেতজাতির পদার্পণের পূর্ব্বে ইহার চাষ আদিম জাতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। এখন ও ইণ্ডিয়ানরা পূর্ব্বের ন্যায় পুরাতন নিয়মানুযায়ী ভুট্টার চাষ করিয়া থাকে।

পৃথিবীতে ধান্য ব্যতীত ভুট্টার চাষ বিস্তৃত রূপ হইয়া থাকে। ইহার বিস্তৃত রূপ আবাদ নূতন পৃথিবীর উত্তরে ক্যানেডা হইতে দক্ষিণে প্যাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপ শ্রেণীতে, পশ্চিম ইণ্ডিয়ার দ্বীপ সমূহে, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার সমস্তাংশ, স্পেন, পর্টুগ্যাল ফ্রান্সের দক্ষিণভাগ, ইটালি, ভূমধ্য সাগরস্থ উপকূলসমূহে, হঙ্গেরি, তুরুক, গ্রীস এশিয়ামাইনর, পারস্য, মধ্য এশিয়া, ভারতবর্ষ, চীন এবং ভারতমহাসমুদ্রস্থ দ্বীপ সকলে হইয়া থাকে। যদি ও ভুট্টা আর্দ্র উর্ব্বরাজমি এবং প্রখর সূর্য্যের কিরণে উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এমন অনেক প্রকারের ভুট্টা আছে যাহা ট্রপিকেল ক্লাইমেটের (Tropical climate) সমুদ্র গর্ভ হইতে ৯০০০ ফুট উচ্চে জন্মাইতে পারে। গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিকতর উত্তরাংশে ভুট্টা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এবং এক ঋতুতে তিনবার শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। ক্যানেডায় একজাতি ভুট্টা আছে, যাহা এস্থানের সম্পূর্ণ উপযোগী। ধান্য এরূপ নহে তাহা কেবল উত্তাপ সহ্যকরিতে পারে, কিন্তু উচ্চ অক্ষাংশের শীতলতা সহ্যকরিতে পারে না। অধ্যাপক এমিল উল্‌ফ সাহেব ভুট্টার মিশ্র পদার্থের দুইটি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

	...	নং ১।	...	নং ২।
জল	...	১৪.৪	...	৯.০
ছাই	...	১.৬	...	১.২২

য়্যালবিউমিনিয়ডস্	১০.৩	১০.০৩
(ডিম্বের শ্বেতভাগের ন্যায়)	...	০০
কার্ব্বো হাইড্রেটস্	৬৮.০	৭১.৪০
অপরুক আঁশ	৫.৫	৩.৭০
চর্ব্বি প্রভৃতি	৭.৯	৪.৯৮

ভূট্টার দানার ছায়ে কি কি কি উপাদান আছে নিম্নে লিখিত হইল।

পোট্যাশ্	২৮.৩৭	...
সোডা	১.৭৭	...
খাদ্যলবণ	আভাসমাত্র	...
চুণ	০.৫৭	...
অক্সাইড অব আয়রণ	০.৪৭	...
ম্যাগনেশিয়া	১৩.৬০	...
ফস্‌ফরিকয়্যাসিড্	৫৩.৬৯	...
সলফিউরিকয়্যাসিড্		আভাসমাত্র
বালুকা		১.৫৫

ভূট্টা গাছের পাতায় ও ডাঁটাতে কি কি উপাদান আছে নিম্নে লিখিত হইল।

পোটাস	৩৭.২৬
সোডা	১.১৪
ক্লোরাইড অফসোডিয়ম্ বা খাদ্যলবণ	২.২৯
চুণ	১০.৫৩
ম্যাগনেশিয়া	৫.৫২
অকক্লাইড অফ আয়রণ	২.২৮
ফস্ ফরিকয়্যাসিড	৮.০৯
সলফিউরিক ঐ	৫.১৬
কার্ব্বনিকয়্যাসিড	২.৮১
বালুকা	২৭.২৮

গমের সহিত ভূট্টার পুষ্টিকর পদার্থের অভাব প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। ভূট্টা যে সকল উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার সমস্তই পুষ্টিকর খাদ্যের উপযোগী। প্লুটিনে যবক্ষারজান আছে যাহার দ্বারা আঁশাল মাংস পেশী ও শিরা সম্বন্ধীয় ধাতুর এবং মস্তিষ্কের গঠন সাধন করে। তৈল হইতে প্রায় চর্ব্বি হইয়া থাকে কিন্তু মাড়ও (Starch) চর্ব্বিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; এবং শরীরের আঙ্গারিক অংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তের চলাচল দ্বারা ধীরে ধীরে দহন হওয়াতে শারীরিক উত্তাপের কিয়ৎপরিমাণ সহায়তা করে। ফস্‌ফেট হইতে অস্থির উপাদান সকল, মস্তিষ্কের শিরার লবণাক্ত অংশ সমূহ এবং শরীরের নিরেট ও তরল পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়। সল্টস্ অফ আয়রণ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং রক্তের ইহা প্রধান আবশ্যক অংশ; ফুস্ ফুসি রক্ত প্রবাহিকা নাড়ি ও রক্তবাহিকা শিরাতে রক্ত চলাচল কালিন পুনঃ পুনঃ দহনের পরিবর্ত্তন হওয়াতে ইহা (Salts of Iron) শরীরের সর্ব্বস্থানে রক্তকে অম্লজান প্রেরণ করিতে সক্ষম করে।

ভূট্টার ময়দা যে বিলক্ষণ পুষ্টিকর, বলকর ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা শরীরের স্থূলতা কিয়ৎপরিমাণ বর্দ্ধিত করে। বিশেষতঃ অর্দ্ধেক গমের ময়দার সহিত অর্দ্ধেক ভূট্টার ময়দা বিশেষ উপকারক এম্ সেন্ট পিনট্ সাহেব অর্দ্ধেক গমের ময়দা ও অর্দ্ধেক ভূট্টার ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে বলিয়াছেন; এইরূপ রুটি ইটালি, টুরিন্ ও মিলান প্রভৃতি স্থানের শ্রমজিবী লোকেরা সুলভ স্বাস্থ্যকর খাদ্য বলিয়া ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। রয়েল পার্ক এবং ফারমের অধ্যক্ষ এম্ সেলুর সাহেব বলেন যে অষ্টাদশ লুই ও ওয়াসিংটন সাহেব সর্ব্বদা ভূট্টার রুটি খাইতেন। এমব্রীয়া সাহেব ডাক্তার খানার রোগীদিগের নিমিত্ত ভূট্টার রুটি এখন ও বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক ইউবলার সাহেব ভূট্টার ময়দার গুণাগুণ সম্বন্ধে একখানি বিজ্ঞাপন সম্প্রতি একাডামি অফ মেডিসিন্ নামক সভায় প্রদান করিয়াছেন।

সে যাহা হউক প্রাণীদিগের জীবন ধারণার্থ শরীরের যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, তৎসমুদয়ই ভূট্টাতে লক্ষিত হয়। পরমপীতা পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের

জীবনধারণার্থ ভূট্টা নামক প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রদান করিয়াছেন. এবং মার্কীন জাতিরা এই পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিয়া তাহাদের দেশকে প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে পরিণত করিয়াছে।

ভূট্টা নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর প্রায় ১/৩ অংশ লোক ইহা ভক্ষণ করে। গরু, মেষ অশ্ব ও শুকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের অমূল্য খাদ্য। উহারা আগ্রহের সহিত গাছ সকল ভক্ষণ করিয়া থাকে। ভূট্টার গাছ সকল শস্য প্রদানের পর গো জাতির খাদ্য হইতে পারে, বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীকে ইহার গাছ সকল খাওয়াইলে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা ভূট্টা হইতে এক প্রকার মদ প্রস্তুত করে। ভূট্টার খোসা হইতে (যাহাদ্বারা ভূট্টা আবৃত থাকে) এক প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ জর্ম্মেনি, আষ্ট্রিয়া এবং হঙ্গরি প্রভৃতি দেশে প্রস্তুত হয়। ইহার কাগজে ব্যাঙ্কনোট ও উৎকৃষ্ট এনভেলাপ্ প্রস্তুত হইতে পারে। ভূট্টা কাগজের রং কিঞ্চিৎ হরিদ্রা বর্ণ। ভূট্টার শিষ ও গাছ সকল ইয়ুরোপে জ্বালানি কাষ্টের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কাঁচা মক্কা কড়াই শুঁঠির ন্যায় অনেকে রন্ধন করিয়া খাইয়া থাকেন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার লোকেরা অতি আদরের সহিত সুখাদ্য বোধে রন্ধন করিয়া খাইয়া থাকেন। তাঁহারা অপক্ক ভূট্টার দানা সকল দুগ্ধে সিদ্ধ করত পুনরায় ভাজিয়া লইয়া মাখনের সহিত মরিচ গুঁড়া ও লবণ দিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ভূট্টাকে রাঁধিয়া খাইতে হইলে তুলিয়াই রন্ধন করিতে হয়; কারণ ইহার মিষ্টতা অল্প সময়ের মধ্যে হ্রাস হইয়া আইসে। তখন কৃত্রিম উপায়ে মিষ্টতার ভাগ পূরণ করিতে হয়। রন্ধন মক্কা আস্বাদনে যাস পারাগ্রালের তুল্য।

পৃথিবীতে কত প্রকার ভূট্টা আছে তাহার নির্ণয় করা অসম্ভব। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডন প্রদর্শনীতে ২০০ শত প্রকারের ভূট্টা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভূট্টা সকলের বিভিন্নতা দানার শ্রেণীর সংখ্যা গঠন, বর্ণ, চেহারা, বীজরোপণ ও পাকিবার সময় প্রভৃতি দ্বারা নিরূপিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় ভূট্টা উৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র আদরের সহিত গৃহীত হয়। ইয়োলোপন্ করণ, ভিল্ মরিণ্ স্, নিউ আফ্রিকেন, বোষ্টন টেন্, উইফ, হোয়াইট ফিণ্ট,

গো ও ডেন্ট গোর্ড সিড্, আর্লি ইয়োলো ক্যানেডা, আর্লি কম্টন্ করণ ও মাল্দা।

কুজো মেজ নামক এক প্রকার ভূট্টা আছে. তাহার শস্য ব্যতীত ডাঁটা সকল হইতে ইক্ষুর ন্যায় গুড় উৎপন্ন হয়। কর্ণেল চেম্বারলেন্ সাহেব বিহিয়ার চিনির কলে ৮॥০মণ কুজো ভূট্টার ডাঁটা হইতে ১৫ সের গুড় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ সালে জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগ হইতে ১৫ সের কুজো ভূট্টার বীজ ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরীক্ষার্থে প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত বীজ সকল ভারতীয় কৃষি সমাজ কর্ত্তৃক পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ, ত্রিহুত, বিহার ও বঙ্গদেশের অন্যূন ৬০ জন প্রার্থীকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার ফল সর্ব্বত্রই একরূপ হইয়াছিল, বীজ সকল অঙ্কুরিত, গাছ সকল সম্যকরূপ বর্দ্ধিত হইয়া মোচা সকল ধরিয়াছিল. কিন্তু কোথাও ভূট্টার দানা উৎপন্ন হয় নাই। ইহা হিমালয়ের পশ্চিম কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে।

আমেরিকা হইতে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে ভূট্টা ইয়ুরোপে রপ্তানি হয়। ইহার অধিকাংশই গো, অশ্ব, মেষ, ও শুকর প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু দিগের খাদ্য এবং মাড় প্রস্তুত করণে ব্যয়িত হয়। অধুনা ইয়ুরোপে ভূট্টা ভোজীর সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিতহইতেছে। আমেরিকা হইতে ১৮৭০ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর গড়ে ইয়ুরোপে ৪০, ৬০৬, ৮৩৮ বুশেল (একবুশেল—২৮ সের) ভূট্টা রপ্তানি হইয়া ছিল। রোপণ প্রণালী। দোঁয়াস ক্ষারযুক্ত উর্ব্বরক্ষেত্র ভূট্টা আবাদের পক্ষে প্রশস্ত। যেখানে জল দিবার সুবিধা আছে, তথায় এপ্রেল বা মে মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে ভূট্টার বীজ বপন করিলে চলিতে পারে; নতুবা বৃষ্টি আরম্ভ হইবা মাত্রই ভূট্টার ক্ষেত্র উত্তমরূপ ৩।৪ বার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। ভূমি গভীর করিয়া খনন করিলে ফসলের পক্ষে ভাল। ভূট্টার বীজ সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপণ করিতে হয়। শ্রেণী সকল যেন পরস্পর তিনফুট অন্তর হয়। এবং বীজ সকল পরস্পর দেড়ফুট অন্তর ফাঁক ফাঁক করিয়া রোপণ করা উচিত। বীজ বপনের পর মৃত্তিকা সকল মইদ্বারা সমান করিয়া দিবেক। চারাসকল যখন মাটি হইতে ৬।৭ ইঞ্চ উচ্চ

হইয়াছে এবং ক্ষেত্রের মাটিশুষ্ক প্রায় দেখিবেক তখন হাত কোদালীদ্বারা গাছের গোড়া সকলে মৃত্তিকা দিয়া যাইবেক। তৎপর ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া বারদুই নিড়াইয়া দিতে হইবে; পরিশেষে যখন মক্কা গাছ সকলে ফুল হইতে দেখিবে তখন কোন বর্ষামুক্ত দিবসে উক্ত শিস সকল গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া লইবেক। এই শিস সকল গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য হইতে পারে। কেহ যেন ভুল ক্রমে ভূট্টার মোচা সকল ফুল বোধে কাটিয়া না লয়েন।

ভূট্টা বীজ বপনের পর গাছসকল ক্ষেত্রে নব্বুই হইতে একশত দিন পর্য্যন্ত থাকে। শ্রাবণ অথবা ভাদ্রমাসে (যখন শষ্য সকল পরিপক্ক হইয়াছে দেখিবে) গাছ সকল কাটিয়া ভূট্টার মোচাসকল সংগ্রহ পূর্ব্বক ৮।৯ দিন রৌদ্র লাগাইয়া শুষ্ক করিয়া লইবেক।

যত্ন ও পাইট করিলে ভূট্টা প্রতিবিঘায় ১৬।১৭ মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইতে পারে। প্রতি গাছে ৩।৫ টা মোচা উৎপন্ন হয়। এবং প্রত্যেক মোচা ২০০ শত হইতে ৫০০ শত পর্য্যন্ত দানা থাকে।

বঙ্গদেশে ভূট্টা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে এবং ইহার চাসে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ জাত ভূট্টা আমেরিকা ও আফ্রিকার ভূট্টা অপেক্ষা গুণে ও আকারে অনেক নিকৃষ্ট এতদ্দেশে ভূট্টার চাসে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন না করার ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছে। যত্ন ও মনযোগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষ জাত ভূট্টার আবাদ করিলে আমেরিকা আফ্রিকার ভূট্টার সমকক্ষ হইতে পারিবেক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ জাত ৪ চারিটী ভূট্টার দানা একত্রিত করিলে আমেরিকার একটা দানার সহিত সমান হইয়া থাকে, এবং ভারতবর্ষ অপেক্ষা আমেরিকার ভূমিতে অধিক পরিমাণে ভূট্টা উৎপন্ন হয়। কেন যে ভারতবর্ষজাত ভূট্টা আমেরিকার ভূট্টা অপেক্ষা আকারে, গুণে ও উৎপন্নে এত নিকৃষ্ট তাহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ তাহারা বীজ সকল আবাদের জন্য সাবধান ও যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচন করে। কারণ বীজ যত পরিপক্ব ও তেজস্কর হয়, তজ্জাত বৃক্ষাদি ও সেইরূপ সতেজ ও পুষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যাদির ন্যায় উদ্ভিদ্ দিগের প্রজনন ক্রিয়া একরূপ। যেমন হীন বীর্য্য ব্যাধিগ্রস্থব্যক্তির সন্তান সকল রুগ্ন ও অল্পায়ু হয়,

সেইরূপ অপক্ক অথবা হীনতেজ বিশিষ্ট কোন উদ্ভিদ্ বীজ রোপণ করিলে তৎজাত বৃক্ষাদি ও প্রায় তদ্রুপ হইয়া থাকে। এজন্য উৎকৃষ্ট ফসল ও উৎপন্নের হার বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমে বীজের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবেক।

দ্বিতীয়তঃ। বীজ বপনের পূর্ব্বে তাহারা মৃত্তিকা সকল প্রস্তুত করে।

তৃতীয়তঃ। গভীর খনন এবং ভূট্টা গাছ সকল বীজ বপনের পর হইতে তৃণাদি হইতে রক্ষা করে।

চতুর্থ। প্রচুর পরিমাণে ছাই, অস্থি চূর্ণ প্রভৃতি সারদ্বারা ভূট্টা গাছ সকলের গোড়ায় ঢাকিয়া দেয়।

ভারতীয় কৃষকদিগকে উপরোক্ত একটী নিয়মও প্রতিপালন করিতে দেখা যায় না।

শ্রীতরঙ্গনাথ রায় চৌধুরী
উত্তরপাড়া।

করম শাক।

করম শাক (Colewort) কোপি জাতীয় (Brassica Oleracea) এক প্রকার শাক বিশেষ। ইহার পত্র ও ডাঁটা তরকারি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাশ্মীরে প্রচুর পরিমাণে ইহার চাস হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে ঠিক ফুল কোপির চারা গাছের মত এবং খাইতে অতি সুস্বাদু। চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয় এবং চারাগুলি যখন ৫।৬ ইঞ্চি উচ্চ হয় তখন উহাদিগকে স্থানান্তরে বসাইতে হয়। একমাস দেড়মাসের মধ্যেই চারাগুলি বেশ বড় হইয়া উঠে। কাশ্মীরি গণ ইহার নীচে হইতে পত্র ভাঙ্গিয়া লইয়া ৭।৮টী পত্রের এক একটী তাড়ি বাঁধে এবং বাজারে বিক্রয়া প্রেরণ করে। বৈশাখের প্রারম্ভে যে ক্ষেত্রে করম বসান হইয়াছে জ্যৈষ্ঠমাস

হইতে আশ্বিন কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রে হইতে প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে শাক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এক বিঘা করমের ক্ষেত্র হইতে প্রত্যহ এক টাকা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের শাক সংগৃহীত হয়। এক পয়সায় ৮আটী শাক বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। একবার চারা গুলি বসাইবার পর ২।১ বার খুঁড়িয়া দেওয়া এবং মধ্যে২ জল সেচন ভিন্ন অন্য বিশেষ কোন পরিশ্রম নাই সুতরাং ইহার চাসে সম্পূর্ণ লাভ আছে। অগ্রহায়ন মাসে শীতের প্রাদুর্ভাব বশতঃ আর পাতা নির্গত হয় না. তখন কৃষাণ উহার ডাঁটাগুলি কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। কাশ্মীরের অনেক গৃহস্থ ও ইহার চাস করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ঐ সময়ে ডাঁটা মোটেই কাটেনা। ঐ ডাঁটা গুলি শীত ঋতুতে বরফে ঢাকা যায় এবং চৈত্রমাস পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় ডাঁটা গুলি ফুলিয়া ওল কোপির (Khol Rabi) মত হইয়া উঠে। ইহার আস্বাদন বিলাতী বীজ জাত ওল কোপির স্বাদ হইতে উত্তম। বঙ্গ দেশে ইহার চাস করিলে বেশ লাভ হইতে পারে। আমাদের দেশে ইহাদের চাসের পক্ষে শীত ঋতুই প্রশস্ত সময়।

শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

ক্রমশঃ

ডেটুরা (DATURA)

বা

ধুতুরা।

এই বিশ্বসংসারে বিশ্বপাতার সৃজিত পদার্থ সমূহের মধ্যে যে কতস্থানে, কতপ্রকার সুন্দর সুন্দর বস্তু রহিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন সেই দিকস্থিত প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁহার অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য দেখিতে পাই। প্রত্যেক দিকস্থিত প্রত্যেক বস্তুই,

তাঁহার অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য এবং মহিমা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে, তাঁহার প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় করিয়া দিতেছে।

আহা! শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত প্রভৃতি কি মোনহর রঙ্গেই তিনি ফুল সমূহ চিত্রিত করিয়াছেন! যেখানে যেরূপ রঙ্গের প্রয়োজন, তাহা কি সুন্দর রূপই সমাবেশ করিয়াছেন? যেখানে সাদা ফুলটীর উপর লাল রেখাটী এবং লাল ফুলটীর উপর কাল রেখাটী একচুল সূক্ষ্ম কিম্বা স্থূল হইলেই, আর তত সুন্দর বোধ হইত না; এবং ঐ সাদা ফুলটী তত সাদা কিম্বা ঐ লাল ফুলটী উহা অপেক্ষা অল্প লাল হইলে আর ততদূর নয়ন-রঞ্জন হইত না, তাহাও কিরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন! মনুষ্য! তুমি সামান্যরূপ চিত্র করিতে শিখিয়া বৃথা অহঙ্কারে দশদিক্ শূন্যময় দেখিতেছ! আপনার সমকক্ষ কেহ নাই ভাবিয়া, কাহাকেও তৃণজ্ঞান করিতেছ না; কিন্তু একবার সেই নিরাকার অসাধারণ চিত্রকরের চিত্রের প্রতি চাহিয়া দেখ, সেইরূপ চিত্রকরা দূরে থাকুক, জন্ম জন্ম চেষ্টাকরিলেও সেইরূপি রঙ্গ ফলাইতে পারিবেনা।

আমরা যে ফুলের বিষয় লিখিতেছি, ইহা শ্বেত, পীত, নীল, হরিদ্রা এবং কাল প্রভৃতি অনেক রঙ্গের আছে। তন্মধ্যে আমরা অদ্য সবইন্স্পেকটা জাতীয় ধুতরার বিষয়ই আলোচনা করিব।

ইহার রঙ্গ তুষারের ন্যায় ধবল। অতি মনোহর, দেখিলেই চক্ষুজুড়ায়। ইহার গন্ধও অতিশয় প্রাণ মুগ্ধকর এবং শীতল।

এই ডেটুরা সাধারণ ধুতুরা ফুল অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া থাকে। ইহা লম্বে একফুট এবং ইহার মাথার বেড় প্রায় ১৫ ইঞ্চি হইবে। প্রত্যেক পত্রের পরেই এক একটী ফুল ফুটিয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে। এইরূপ যখন প্রত্যেক পাতার পার্শ্বে এক একটী ফুল ফুটিয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে, তখন যে কি অপূর্ব্ব শোভা হয়, তাহা বর্ণনাকরা দুঃসাধ্য। বোধহয় যেন একস্থানে কতগুলি কাঁচের ঝাড় টাঙ্গান রহিয়াছে! বৃক্ষেরচারিধারে এক একটী বড় বড় সবুজ পাতার পার্শ্বে, দুগ্ধের ন্যায় সাদা রঙ্গের ফুলগুলি নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকিলে যে কি অপরূপ শোভা ধারণকরে, তাহা একবার স্বচক্ষে না দেখিলে, সে সুন্দর শোভা কখনই অনুভব করিতে পারাযায় না।

পাঠক! তুমি অবস্থিতিহীন বিস্তারেরও কল্পনা করিতে পারিবে, তথাপি একবার স্বচক্ষে না দেখিলে এই অপূর্ব্ব শোভার বিষয় কখনই কল্পনা করিতে পারিবে না। যখন অসংখ্য দুগ্ধ ফেণনিভ সদৃশ সাদা সাদা ফুলগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া বাগানের শোভা বৃদ্ধি করে, তখন দেখিলে কাহার না চক্ষুজুড়ায়? যত দেখিবে ততই দেখিবার লালসা বৃদ্ধিহইবে। ইহার গাছ উর্দ্ধে ৪।৫ হাত হয়। ইহার সবুজবর্ণের পাতাগুলি অনেক বড় বড় হইয়া থাকে। ইহার ফল হয় না। গাছে ও কাঁটা নাই। দেখিলে ধুতুরার গাছ বলিয়া বোধ হয় না।

ইহার গাছ করিতে হইলে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহার ডালে গুল কলম করিতে হয়। একমাসের মধ্যেই শিকড় বহির্গত হইয়া থাকে। ইহার কলম পাইকপাড়া নর্শরীতে পাওয়া যায়। কেহ ইচ্ছাকরিলে এখান হইতে ও লইতে পারেন।

সোণামুগ।

যাহাকে বারমেসে জমী কহে অর্থাৎ যে সমুদয় জমীতে বারমাস চাষদেওয়া যেতেপারে সেই সমুদয় জমীতেই সোণামুগ বপন করিতে হয়।

ভাদ্রমাসে আউসধান কাটিয়া লইয়া, ঐ জমীতে ও ২।৩ বার চাষ করিয়া সোণামুগ বপনকরা যাইতে পারে।

রাজসাহী, পবনা ফরিদপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও বরিশাল জেলাতে ইহার অধিক আবাদ হয়।

আশ্বিন মাসের ১৫ ই হইতে ৩০ সে পর্য্যন্ত ইহা বপনের সময়।

এটেঁল এবং বালুকাময় এই দুই প্রকার জমীতেই সোণামুগ উৎপন্নহইয়া থাকে।

বালুকাময় জমীতে বিঘাপ্রতি /৬ ছয়সের এবং এঁটেল মৃত্তিকাতে বিঘাপ্রতি /৪ চারিসের বীজ হইলেই যথেষ্ট হইবে।

বালুকাময় জমীতে বিঘাপ্রতি ১ হইতে ২৫ মন পর্য্যন্ত এবং এটেঁল জমিতে বিঘা প্রতি ২০ হইতে ৩৫ মণ পর্য্যন্ত সোনামুগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বালুকাকয় জমীতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার দানাগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয় বটে, কিন্তু তাহা অধিক সুস্বাদু এবং অধিক মূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে। ইহা রোগীর পথ্যের পক্ষেও উত্তম।

চাষ প্রণালিঃ—প্রথমতঃ বীজ বপন করিয়া লঙ্গলদ্বারা ২।৩ বার চাষ করিয়া মইটানিয়া সমতল করিয়াদিবে। ক্ষেতে কোনরূপ জঙ্গল হইলে ২৪।২৫ দিন পরে একবার বিদাদিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

অগ্রহায়ণ ও পৌষমাস ইহা পাকিবার সময়। পাক হইলে অন্যান্য শস্যের ন্যায় কর্ত্তন ও মর্দ্দন করিয়া লইবে।

লাল লম্বা বা সুর্ত্তিমূলা।

(Long scarlet strap-leaved Radish.)

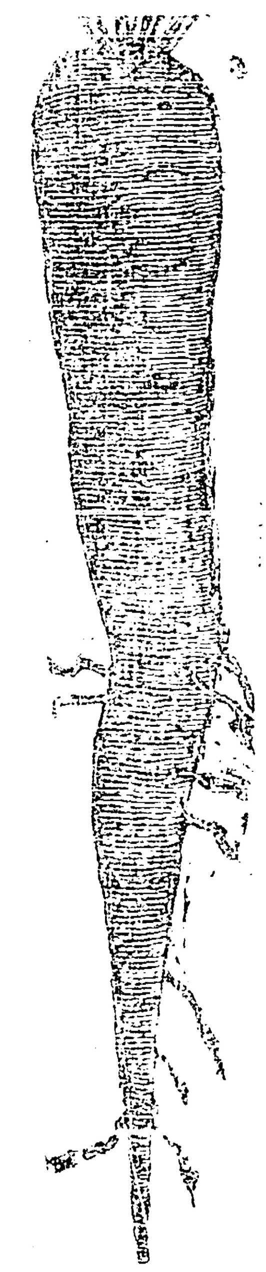

বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই মূলার চাষ হইয়া থাকে; কিন্তু সকল স্থানের মূলা সুখাদ্য নহে। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই ইহা তরকারিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাল মূলা, শাক আলুর ন্যায় জলপানেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

পৌষমাস পর্য্যন্ত মূলা খাদ্যের উপযুক্ত থাকে; পরে মাঘ মাস হইতে, ইহা অত্যন্ত শক্ত হইয়া উঠে এবং আস্বাদের ও অনেক প্রভেদ হয়, এজন্য, মাঘমাসে মূলা কেহ খায় না। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মতে ও মাঘমাসে এবং চতুর্থিতে মূলা ভক্ষণ নিষেধ।

উপরে যে মূলার প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল, উহা এমিরিকাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অস্মদ্দেশীয় মূলা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এই মূলা যেরূপ সৎগন্ধ বিশিষ্ট, সেইরূপ খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু। এই মূলা আমাদের দেশীয় মূলা অপেক্ষা অধিক মোটা হয় না বটে, কিন্তু দৈর্ঘে অনেক বড় হইয়া থাকে।

ইহা অনেক জাতীয়। তন্মধ্যে গোল রাঙ্গা মূলা (Red Turnip) এক প্রকার লম্বা শাদা মূলা (White Lady Finger.) লাল লম্বা বা স্মুর্ত্তি মূলা (Long Scarlet Strap-beared) এবং চীন দেশীয় এক প্রকার মূলা (China Winter) এই কয়েক জাতীই উত্তম।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই ইহার রোপণের উপযুক্ত সময়। দোয়াঁস মৃত্তিকায় ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ইহার ক্ষেত ভালরূপ পাট করিতে হয়। অনেকবার চাষদ্বারা ইহার ক্ষেতের মাটি একেবারে ধুলার ন্যায় করা একান্ত আবশ্যক। মৃত্তিকা যত ধুলার ন্যায় হইবে, ফসলও তত অধিক হইবে। লোকে চলিত কথায় বলিয়া থাকে যে, "মূলার মাটি তুলা" অর্থাৎ মূলার মাটি তুলার ন্যায় হওয়া চাই। ইহাও লোকে বলে যে, মূলা ক্ষেতে কলসি ফেলে দিলেও ভাঙ্গে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহার মাটি এত অধিক আলগা ও ধুলার ন্যায় হইবে যে, কলসি ফেলে দিলেও ভাঙ্গিবে না। ফলতঃ মূলার জমি অধিক কর্ষিত হইলে, মাটি ঝুরা হয় এবং মৃত্তিকা ঝুরা হইলে, মূলা সহজে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মূলার বীজ সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে বপন করা উচিত। এক স্থানে রাশিকৃত এবং অপর স্থানে অতি অল্প এরূপ না হয়। এরূপ হইলে মূলা বৃদ্ধির পক্ষে অনেক ব্যাঘাৎ জন্মে। এক কাঠা জমিতে আধ পোয়া বীজ হইলেই যথেষ্ট হয়।

চারা পাঁচ ছয় ইঞ্চি পরিমাণে বড় হইলে, সমুদায় ক্ষেত এক বার নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক, এবং নিড়ানীর সময়, চারা গুলি ঘন ঘন হইলে, কতকগুলি তুলিয়া ফেলা উচিত; নতুবা ইহা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ হানি জন্মায়। ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে জল দিতে হইবে। চারার গোড়ার মৃত্তিকা মাঝে মাঝে খুঁড়িয়া মাটি আলগা করিয়া দিবে।

মূলার পুরাতন বীজে চারা ভাল হইয়া থাকে। দুই তিন বৎসের পুরাতন বীজ চাষের পক্ষে উত্তম।

ORCHIADS.

বা

পরগাছার বিষয়।

যে সুন্দর সুন্দর প্রফুটিত ফুল সমূহ দেখিলে, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি যুবক কি প্রৌঢ়, সকলেরই অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, সেই ফুল সমূহ কিপ্রকারে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং কি উপায়েই বা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সুন্দর সুন্দর ফুল সমূহ আমরা এখানে পাইতে পারি. তাহা জানিবার জন্য কাহার না অন্তঃকরণ সমধিক সমুৎসিকীত হইবে?

শিরনামাঙ্কিত (orchid) পরগাছা দেখিতে অত্যন্ত মনোহর। ইহার ফুল গুলি নানা প্রকার রঙ্গে চিত্রিত; বারম্বার দেখিলেও নয়নের তৃপ্তিবোধহয় না যতবার দেখাযায় ততই পুনর্ব্বার দেখিতে ইচ্ছা করে। কি প্রকারে ইহা এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, কিররকমে ইহার তত্ত্বাবধান করিলে ভালহইতে পারে; কিরূপ প্রক্রিয়া করিলে, ইহা উত্তমরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে; কোন স্থানেই বা অধিক উত্তম হয়; অন্যান্য দেশহইতে আনীত পরগাছা সমূহেরই বা কিরূপ কারাকিত করিতে হয়; তৎসম্বন্ধে আমরা অদ্য এই প্রস্তাবে (Samuel Jennings)" সেমুয়েল জেনিংস সাহেব লিখিত মত বিবৃত করিব।

গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে এবং বর্ষাকালে ও অত্যন্ত জঙ্গলের জন্য ইহা আমাদের বাগান সমূহে ভালরূ জন্মিতেপারে না সুতরাং অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন এই চারিমাসই ইহা বাগানে চাষের উপযুক্ত সময়।

এই পরগাছা ইংলণ্ডে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য বলিয়া, অধিক মূল্যে বিক্রিত হয় সুতরাং সকলে সহজে পাইতে পারে না; কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা সহজেই পাওয়া যাইতে পারে এবং অল্লায়াসেই কোন ছায়াবিশিষ্ট বারাণ্ডাতে অথবা নীচেতে চারাগুলি রাখিবারজন্য একখান ক্ষুদ্র ঘর করিয়া; তাহার মধ্যে ও ইহার ফুল উত্তমরূপ জন্মান যাইতে পারে।

বৎসরের সকল সময়েই, এই মোনহর পুষ্পের সুন্দর শোভা, সুন্দর গঠন এবং ইহার পত্র সমূহের উত্তম গাঢ় সবুজবর্ণ নয়ন প্রীতিকর থাকে। বিশেষতঃ যখন গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে অন্যান্য ফুল সমূহ শুষ্কহইয়া যায়, তখন ইহার অপূর্ব্ব শোভা আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। Oneidinm papilio অনসিডিয়াম পেপিলিও) নামক পরগাছা পুষ্পের সুন্দর এবং মনোরম গঠনের ন্যায়, আর কোন পুষ্পেই সেরূপ সুন্দর গঠন দেখাযায় না। যখন এই ফুল প্রস্ফুটিত হয়। তখন দেখিলে বোধ হয় যেন সবুজ পাতার উপর লাল এবং পীত-বর্ণের একটী বড় প্রজাপতি বসিয়ারহিয়াছে। Cyenochis (চাইকনসিস্। নামক ফুল দেখিলে বোধ হয় যেন একটী তুষার সদৃশ ধবল বর্ণ সারস পক্ষী গ্রীবা বক্র করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আহা, Peris terin elatn (পেরিস্টারিয়া ইলেটা) ফুল আরো কি মোনহর! বোধহয়, যেন দুগ্ধ-ফেণ-নিভসদৃশ শুভ্রবর্ণের একটী ঘুঘু উড়িবে বলিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

এইরূপ মনোহর এবং সুন্দর সুন্দর বর্ণের অনেক পরগাছার উল্লেখ করা যাইতে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে নিরস্ত রহিলাম। ইহার আর এক গুণ এই যে, ইহা অতিঅল্প স্থানের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করাযাইতে পারে। কোন ছায়া বিশিষ্ট বারাণ্ডার কিম্বা কোন ছোট ঘরে (যেখানে অপরাপর বৃক্ষের চারা গুলি রক্ষিত হয়) এরূপ স্থানে ও ইহা প্রচুর পরিমানে জন্মান যাইতে পারে

ভগ্ন আম্রশাখাতে কিম্বা সুন্দরী কাষ্ঠে নারিকেলের ছোবড়া জড়াইয়া বাঁধিয়াদিয়া তাহাতে পরগাছার শিকড় গুলি জড়াইয়াদিলে ও তাহাতে ইহা উত্তমরূপ বৃদ্ধিহইয়া থাকে।

ঝামা, কয়লা মৃত্তিকা এবং পাতাসা (mould leaf) উত্তমরূপ একত্র করিয়া তাহাতে ও পরগাছার শিকড় গুলি জড়াইয়া দিয়া কোন গামলায় রাখিলে ও ইহা বৃদ্ধিপাইয়া থাকে।

সুন্দর সুন্দর পরগাছা ফুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইলেই, এই রূপ প্রক্রিয়া করিতে হয়, নতুবা যেখানে বায়ু আর্দ্র থাকে, এরূপ

কোন চারা রাখিবার ঘরেও চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহা উত্তম রূপ বাড়িতে পারে।

এই পরগাছাতে ফুল হইবার পূর্ব্বে ইহাতে অল্প অল্প জল দিবে। কিন্তু গেঁরোযুক্ত পরগাছার গেঁড়োগুলি যাহাতে সঙ্কুচিত না হইয়া যায়, এনিমিত্ত তাহাতে কিছু অধিক পরিমানে জল সিঞ্চন করিবে। সপ্তা-হের মধ্যে একদিবস জল দিলেই যথেষ্ট হইবে।

এইরূপে জল দিতে দিতে ফাল্গুণ মাসের প্রারম্ভে গাছ হইতে দুই একটী নূতন পত্র বহির্গত হইতে দেখা যাইবে। তখন কিছুকাল পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুইবার করিয়া ইহার মূলে জল সিঞ্চন করিবে এবং তদনন্তর ফুল নাহওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহই জল সিঞ্চন করিবে। ফুল না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় গাছেই পিচ্‌কারী দ্বারা জল সিঞ্চন করিবে; কিন্তু ফুলহইলে আর পিচকারীরদ্বারা জল দিবে না; কেন না তাহা হইলে ফুলের মনোহর বর্ণ কিয়ৎপরিমানে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এই সময়ে পত্রগুলি উত্তমরূপ ধৌত করতঃ পরিষ্কার করিয়া স্পঞ্জ দ্বারা ইহার মূলেতে ঘন ঘন জল দেওয়া কর্ত্তব্য। জল সিঞ্চন করিবার সময় সাবধান থাকা কর্ত্তব্য, যেন কোনরূপে পাতায় জল না দাঁড়ায়, কেন না তাহা হইলে পাতা গুলি পচিয়া গাছের পক্ষে বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা।

গাছের শোভা এবং সৌন্দর্য্য বিষয়ে পত্রের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন, যাহাতে পত্রের উপর কোনরূপ ধুলা বালি পড়িয়া ইহা নষ্ট করিতে না পারে এজন্য ইহা উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কোনরূপে ধুলা বালি পড়িলে অথবা জল সিঞ্চনের সময় পত্রসমূহে জল দাঁড়াইলে, স্পঞ্জদ্বারা উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া দিবে। যাহাতে এই পর-গাছায় আর্দ্র বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, সেজন্য বিশেষ মনযোগ করা নিতান্ত উচিৎ। ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র সকলেই গামলা কিম্বা টবে চারারাখিয়া তাহাতে জল সিঞ্চন করেন; কিন্তু ইহাতে টবে জল দাঁড়াইয়া পরগাছা সমূহের বিশেষ হানিকর হইয়া উঠে এনিমিত্ত গামলা কিম্বা টবেতে জল সিঞ্চন করা অনুচিৎ।

পরগাছাগুলিপৃথক পৃথক করিয়া রাখিলে অধিক পরিমাণে ফুল হয় না এনিমিত্ত, অধিক বিস্তারের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, পরগাছাগুলি কখন ও পৃথক পৃথক করিয়া রাখিবে না।

পৃথক পৃথক রাখিবার বিশেষ আবশ্যক হইলে, গোড়াতে কিঞ্চিত কিঞ্চিত রাখিয়া ধারাল ছুরিদ্বারা কাটিয়া অপরস্থানে রাখিবে।

পরগাছার ফুল হইতে আরম্ভ হইলে তাহাতে অনেক বীজোৎপন্ন হয়। এক একটী বীচির ছড়াতে প্রায় সহস্র সহস্র বীজ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বীজ হইতে চারা প্রস্তুৎকরা বড় দুষ্কর।

নিবিড় বনমধ্যে বড় বড় বৃক্ষের শাখাতেই এই পরগাছা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে চারা অবস্থায় ইহাই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা কোনরূপ বাক্স মধ্যে অথবা অন্য কিছুদ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন না করিয়া অনাবৃত আনা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি চারাগুলি অনেক বড় হয়, তবে ইহা কিছুদিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুষ্ককরিয়া কোন বাক্সমধ্যে উত্তমরূপ আবদ্ধ করিয়া আনাকর্ত্তব্য। রৌদ্রে শুষ্ককরিয়া নালইলে, বাক্সমধ্যে থাকিয়া ইহা পচিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এক এক লাইন শিওলা এবং তাহার উপরে এক এক লাইন চারা রাখিয়া বাক্সমধ্যে উত্তমরূপ আবদ্ধ করিয়াই আনা যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু বাক্সমধ্যে আরসুলা প্রভৃতি কোনরূপ পোকাযাইয়া চারাগুলি নষ্ট না করিতে পারে, এজন্য বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত অবস্থায় অর্থাৎ কোন বাক্সমধ্যে উত্তমরূপ আবদ্ধ করিয়া আনিয়াই, তৎক্ষণাৎ বাক্সহইতে চারাগুলি বাহিরকরিবে এবং কোন ছায়াবিশিষ্ট অন্ধকার স্থানে রাখিয়া অল্প অল্প জল সিঞ্চনকরিবে। এবং তথাহইতে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প আলোকেতে আনিবে। হটাৎআলোকে আনিয়া রাখিলে চারাগুলি মরিয়াযাইবার সম্ভাবনা এজন্য হটাৎ একবারে না আনিয়া ক্রমে ক্রমে আনাই উচিৎ।

বাক্সমধ্য হইতে বাহির করিয়া ইহার পত্রগুলি সাবানদ্বারা উত্তম রূপ ধৌত করিয়া দিতে হইবে এবং ইহার শুষ্ক শিকড়গুলি কাঁচিদ্বারা উত্তমরূপে কাটিয়া ফেলিবে।

ভারত বর্ষজাত পরগাছা সমূহে সাধারণতঃ চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে ফুল হইয়া থাকে। কিন্তু এমেরিকাজাত পরগাছা সমূহে ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসেই ফুল হয়।

প্রায় অধিকাংশ স্থানেই এই পরগাছা পাওয়া যায়।

নেপাল হইতে ভূটান পর্য্যন্ত হিমালয় পর্ব্বতে, দ্বারজিলিংএ এবং আসাম জন্তিয়া, খাসিয়া এবং নাগা পাহারের উপত্যকা সমূহে ও ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বার্ম্মা ও আরাকান প্রেদেশেও ইহা অধিক পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে সুন্দরবনে প্রচুর হইয়া থাকে; কিন্তু আন্দামান, সিলন, এবং জাবাদ্বিপে ও ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে।

ডেলিয়া (DAHLIAS)

শ্বেত, পীত, ও লোহিত প্রভৃতি অনেক রঙ্গের এই ডেলিয়া পুষ্প "ডেরা" (Doyra) প্রেদেশের উত্তরস্থ পাহাড় সমূহে প্রাপ্তহওয়া যায়। এই পুষ্পের শোভা অত্যন্ত সুন্দর। একবার দুইবার দেখিয়া ইহার শোভা অনুভব করিতে পারাযায় না। বোধহয় যেন জগদীশ্বর এক বস্তুতে পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুর শোভা একত্র করিয়া দেখিবার জন্যই ডেলিয়া পুষ্পের সৃজ্যন করিয়াছেন

বসন্ত কাল হইতে এই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয় এবং শরৎকাল পর্য্যন্ত ফুল ফুটিয়া থাকে। টবে করিয়া ইহার কলম আনাই উত্তম।

আশ্বিন কার্ত্তীক মাসেই পহাড় হইতে ইহার চারা আনা শ্রেয়স্কর। আনিবার সময় ইহা কোনরকম বাক্সে রাখিয়া উপরে বালি এবং তদুপরে বিছালি পাতিয়া পেরেকদ্বারা উপরের আবরণ আটকাইয়া দিবে। যাহাতে ফাল্গুণ মাসের মধ্যে ইহার অঙ্কুরোদ্গম না হইতে পারে এনিমিত্ত এবং ইহা সমাধিক শীতল রাখিবার জন্য ইহা আনিয়াই কোন ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষের নীচে ২। ২॥ ফুট গভীর গর্ত্তকরতঃ উক্তবাক্স সহিত পুতিয়া রাখিবে। তদনন্তর চৈত্র মাসে ইহা একটা কুণ্ডীতে করিয়া ১৮ ইঞ্চি পরিসর

এবং ১২ ইঞ্চি গভীর একগর্ত্ত খনন করতঃ তাহার মধ্যে উক্ত ঝুড়ী সহিত চারা পুতিতে হইবে।

অঙ্কুরোদ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে ইহারমূলে এক একবার জল দিবে কিন্তু অঙ্কুরোদগম হইলে দিবসে দুইবার জলসিঞ্চন করিতে হইবে।

বর্ষাকালে গর্ত্তেরমধ্যে একখানি ইট রাখিয়া তাহার উপর সাবধানের সহিত ঐ ঝুড়ীটী স্থাপন করতঃ গুড়ামৃত্তিকা দ্বারা উক্ত গর্ত্তপূর্ণকরিয়া দিবে। এবং ইহার দুইফুট দূরে, দুইফুট পরিসর ও ৬ ফুট গভীর গর্ত্ত খনন করতঃ কোন নিকটবর্ত্তী পগার অথবা নর্দ্দমার সহিত এরূপভাবে সংযোগ করিয়া দিবে যে, জলহইলে পরেই যেন ইহা দ্বারা উক্ত পগার কিম্বা নর্দ্দমার মধ্যে জলসরিয়া যাইতে পারে।

ডেলিয়া ফুল অনেকপ্রকার আছে ; কিন্তু সেসমুদয় নাম সকলের নিকট নূতন বোধহইবে বিবেচনায় আর তাহার এইস্থানে উল্লেখ করিলামনা।

কোন টবের মধ্যে বালি রাখিয়া তাহার মধ্যে এই গাছের গাঁইটগুলি পরবৎসরের নিমিত্ত তুলিয়া রাখিবে।

উক্ত গাঁইটে, কলমে এবং বীজে এই তিন রকমেই ইহার চারা হয়।

রাইবেলফুল।

বেলফুল নানা প্রকার ; তন্মধ্যে রাই বেল ফুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার সুঘ্রাণ অত্যন্ত প্রাণবিমুগ্ধকর। যখন এই ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ইহার সুঘ্রাণ বিস্তার করিতে থাকে, তখন কাহার না অন্তকরণ পুলকিত হয় ? এই ফুল অত্যন্ত বড় বড় হইয়া থাকে। ইহার এক একটী ওজনে প্রায় এক ভরি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দোঁয়াস মৃত্তিকায় কিঞ্চিৎ পোড়া মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া ইহার গাছ রোপণ করিলেই ভাল হয় ; এঁটেলমৃত্তিকায়

ও ইহার গাছগুলি সমধিক তেজস্বী হইয়া থাকে কিন্তু ফুলগুলি তাদৃশ বড় বড় হয় না। ইহার আবাদ দুইপ্রকারঃ—

১ম। ফুল হওয়ার পর গাছের পাকা পাকা ডালগুলি কাটিয়া ফেলিবে এবং মাঘমাসে ইহার গোড়া খুঁড়িয়া কিঞ্চিৎ পচা গোময়ের সার আন্দাজ আধপোয়া পরিমাণে মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রেত্যেক গাছের গোড়ায় দিতে হইবেক ; এবং ২।৩ দিন অন্তর গাছে জল সিঞ্চন ও ১০।১২ দিন অন্তর এক একবার করিয়া গোড়ায় মাটী খুঁড়িয়া দিবে। চৈত্রমাস হইতে শ্রাবণমাস পর্য্যন্ত এই গাছে ফুল ফুটিবেক।

২য়। ভাদ্রমাসে এই গাছের ডালগুলি ছাঁটিয়া দিতে হইবে এইরূপ ছাটিয়া দেওয়ার পর যেসমুদয় ডাল পুনরায় বাহির হইবে তন্মধ্যে যেগুলি নিস্তেজ এবং যে ডালের পত্রগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া হইবে, তাহাও কাটিয়া ফেলিবে। যে সকল ছাটা ডালের গোড়াগুলি সুক হইয়া যাইবে তাহাও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ফাল্গুন মসে এইগাছ গুলির চতুঃপার্শ্বস্থ মৃত্তিকা দ্বারা বাঁধের ন্যায় করিয়া, প্রেত্যেক গাছের মূলে প্রতিমাসে দুই দুই বার করিয়া জল সিঞ্চন করিবে। আষাঢ় মাসে এইগাছে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ফুল ফুটিতে থাকিবেক।রাইবেলের কলম দুইপ্রকার

১ম। ইহার কোন একখান ডাল নিম্ন করতঃ ইহার অগ্রভাগ হইতে আধহস্ত পরে মাটীতে প্রোথিত করিয়া দিলে ঐ প্রোথিত স্থান হইতে শিকড় বহির্গত হইবে। ইহাকে লেয়ার কলম বলে। ইহা আষাঢ়মাসে করিতে হয়। একমাসের মধ্যেই লেয়ার কলম প্রস্তুৎ হয়। ২য়। শ্রাবণমাসে অর্থাৎ অধিক বর্ষার সময় রাইবেলের ডালের অগ্রভাগ হইতে আধহস্ত পরিমাণে গাঁট রাখিয়া কাটিবে এবং তৎপর কোন ছায়া বিশিষ্ট বালুকাময় স্থানে রোপণ করিলেই ইহাহইতে শিকড় বহির্গত হইবে। ইহাকে কাটিং কলম বলে।

পেয়ারা।

কেহ কেহ বলেন যে পেয়ারা এতদ্দেশীয় ফল নহে। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রথমে ইহা এ দেশে আনীত হয়; কিন্তু কোন সময়ে কাহা কর্তৃক যে ইহা প্রথমে এখানে আনীত হয় তাহা নিশ্চয় বলা যায়না।

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এই ফল আমাদের দেশে আছে বলিয়া অনেকে ইহাকে দেশীয় ফল বলিয়াই অবগত আছেন।

পেয়ারা যে এতদ্দেশীয় ফল, এসম্বন্দে মত ভেদ থাকা সত্ত্বে ও ইহাকে অনেকেই একমতে দেশীয় ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাহউক, ইহা কোন দেশীয় ফল যে সম্বন্দে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পেয়ারা কত রকম আছে, কোন জাতীইবা কি প্রকার এবং একই পেয়ারার বীজ হইতে, তিন রকম পেয়ারা হইবার কারণ কি, এই সমুদয়ই আমরা আয় এই প্রস্তাবে বিবৃত করিব।

দেশী, পাটনাই, কাফ্রী বেণারসী এবং চায়না এই কয়েক জাতীয় পেয়ারা আছে। এই সকল পেয়ারা গাছের অবয়ব প্রায় একই রকম কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে, প্রত্যেক রকমের পাতায় ও গাছে অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

দেশী পেয়রা অনেক ছোট ২ হয় এবং পাকিলে ইহার মধ্যে লালবর্ণ হয়। খেতে ও সুস্বাদ বটে, কিন্তু ইহা প্রায় বীচিতেই পরিপূর্ণ থাকে।

পাটনাই পেয়ারা লেবুর মতে বড় ২ হইয়া থাকে। ইহার মধ্য সাদা। ইহা খেতে যেরূপ সুস্বাদু তেমন ইহা সৎগন্ধ বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে ও অধিক বীচি থাকেনা।

কাফ্রী পেয়ারা, পাটনাই পেয়ারার ন্যায় তত সুস্বাদু নহে কিন্তু ইহা অনেক বড় ২ হইয়া থাকে। এক বোঁটাতে ইহা এককালে ২।৩টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সকল গুলির মধ্যে বেণারসী পেয়ারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা খেতে যেরূপ সুস্বাদু, ইহার মধ্যে বীচিও সেইরূপ অতি অল্প। ইহা অনেক বড় বড় হইয়া থাকে।

পেয়ারার বীজেতেই চারা জন্মে। পেয়ারার তিন দিকের অংশের তিন রকম বীজেতে তিন রূপ চারা হয়। সুতরাং কোন উত্তম পেয়ারর বীজেতে যে ভাল পেয়ারা হইবে এরূপ নহে। মৃত্তিকার বিভিন্নতায় ও ফলের ইতর বিশেষ হয় বটে, কিন্তু পেয়ারার অংশ বিশেষের বীজ অনুসারে ফল অধিক বিভিন্ন হয়।

পেয়ারার ফুলের দিকের অংশের বীজেতে ফল ঠিক সুগোল, সুস্বাদু এবং ফলের উপরের ত্বক অর্থাৎ ছাল পাতলা হয়, ইহার মধ্যে বীচি ও অনেক অল্প হয়। ইহার মধ্য স্থানের বীজেতে পেয়ারা লম্বা এবং সুস্বাদু হইয়া থাকে এবং শেষের দিকের অর্থাৎ বোঁটার দিকের বীজে ফল অপেক্ষা কৃত অনেক ছোট এবং ইহার মধ্যে অধিক বীচি হইয়া থাকে এবং খেতে ও তত সুস্বাদু হয় না।

চায়নারা পেয়ারা;—ইহার গাছ গুলি, উল্লিখিত পেয়ারা গাছ হইতে এত প্রভেদ যে, ইহাকে পেয়ারার গাছ বলিয়াই বোধ হয় না। ইহার সবুজ বর্ণ পত্রগুলি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং নয়ন প্রীতিকর। এই পেয়ারা অনেক বড় বড় হইয়া থাকে, কিন্তু কাঁচা খাওয়া যায়না। পাকাবস্থায় ইহার মধ্যে লাল বর্ণ হয়। খেতে টক ২ বোধহয়। দেশী পেয়ারা অপেক্ষা ইহার বীজ গুলি অনেক ছোট ছোট হয় বটে কিন্তু ইহারমধ্যে বীচিতে পরিপূর্ণ থাকে ইহার গাছে একবারে অধিক ফল হইয়া থাকে।

ইহার বীজেতে চারা হয় না; চারা জন্মাইতে হইলে ডালে গুল কলম করিতে হয়।

কলিকাতা "Botanical Garden" এ ইহার একটী গাছ আছে, কিন্তু তাহাতে আজপর্য্যন্ত ও ফল হয়নাই।

পেয়ারা পাকিলে ইন্দুর বাদুর এবং কীট প্রভৃতি অনেক জন্তুতে ইহা নষ্ট করিয়া ফেলে অতএব তন্নিবারণ জন্য কোন প্রকার জাল দিয়া গাছ ঘেরিয়া

দেওয়া এবং নেকড়া দ্বারা আলগা করিয়া ফল গুলি বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাদাম।

বাদাম গাছ উর্দ্ধে প্রায় ২৫।২৬ হাত হইয়া থাকে। ইহার বড়২ সবুজ বর্ণের পত্র গুলি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোহর। ইহার শাখা প্রশাখা গুলি চতুঃপর্শে বিস্তৃত হইয়া সূর্য্যের প্রখর কিরণ নিবারণ করতঃ নীচে সুশীতল ছায়া প্রদান করিতেছে। বহুদূর হইতে সমাগত পথশ্রান্ত ক্লান্ত পথিক গণ ইহার শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করে।

ইহার ফলগুলি অত্যন্ত সুস্বাদু। এই ফলের মধ্যস্থিত শাঁস অত্যন্ত কঠিন আবরণে আবৃত থাকে। এই আবরণ এত শক্ত যে কোন অস্ত্র ব্যতিত হস্ত দ্বারা কোন মতেই খোলা যায় না।

বৎসরের মধ্যে ইহাতে দুইবার ফল হইয়া থাকে। চৈত্র মাসে ইহার ফল হয়। এবং এই সময়েই আবার ছোট২ সাদা বর্ণের মনোহর ফুল গুলি হইয়া থাকে। শীতের প্রারম্ভে উক্ত ফুল সমূহে পুনরায় ফল হইয়া থাকে।

আমাদের দেশীয় বাদাম অপেক্ষা বিলাতী বাদাম অনেক সুস্বাদু। কিন্তু আমাদের দেশে ইহার চারা জন্মান দুষ্কর। কেহ ২ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ইহার চারা জন্মাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলে; কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ব্রকলি (Brocoli.)

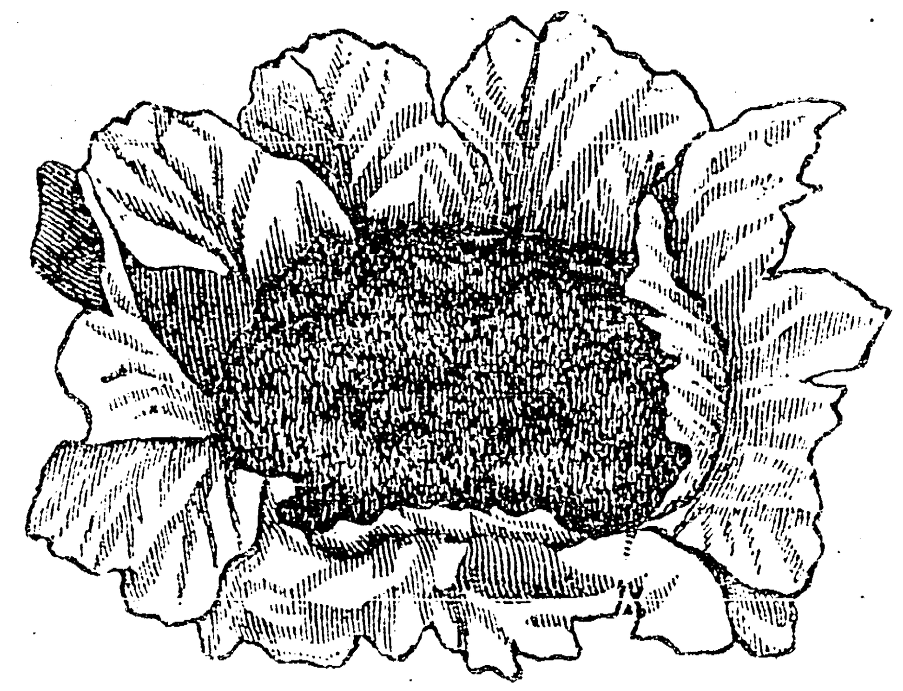

শাক সব্‌জি যে কতই নয়ন প্রীতিকর, কতই হৃদয় আনন্দ-জনক যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আনন্দ-রসের সঞ্চার হইতে থাকে, ও যখন গাছগুলি সম্যকরূপে বর্দ্ধিত হয়, তখন উহাদিগকে দর্শন করিলে নয়ন মন একেবারে প্রীতি-রসে পরিপ্লুত হইয়া যায়। অদ্য আমরা পাঠকবর্গের নিকট নূতন প্রকার ফুল কপির বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, উহার নাম ও চিত্র উপরে লিখিত হইল। এই ফুল কপির গাছ কাল, ফুল লালের আভাযুক্ত সবুজ, দেখিতে বড়ই মনোহর; সচরাচর যে ফুল কপি দেখা যায়, এই ফুল কপি তাহা অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু এবং উহার এমন এক ভিন্ন প্রকার বিশেষ আস্বাদন আছে, যাহা অন্য কোন ফুল কপিতে নাই। যাঁহারা উহার মধুর আস্বাদন গ্রহণ না করিয়াছেন একবার মাত্র উহার আস্বাদন গ্রহণ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। নিত্য নূতন দ্রব্য ভক্ষণে মনে যত আনন্দ হয়, এক প্রকার দ্রব্য ভক্ষণে সে রূপ হয় না, এ নিমিত্ত যাহাতে আমাদের দেশে ভক্ষ্য দ্রব্যের বাহুল্য হয়, সে বিষয়ে সকলকারই যত্নবান হওয়া উচিত। উহার চাষ, রোপণ এবং চারা রক্ষা ইত্যাদি কার্য্য সকল ঠিক্ ফুল কপির ন্যায়, এজন্য ঐ সকল বিষয় এখানে বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই; খৈল ইহার প্রধান সার।

ব্রকলির জন্ম স্থান কেপ অব্ গুড্ হোপ্ (Cape of Good hope.) অধুনা বিলাত ও আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে; আমাদের দেশে উহার গাছ ও ফুল ভাল হয়, কিন্তু বীজ উত্তমরূপে পরিপুস্ট হয় না, কারণ শীত প্রধান দেশ ব্যতীত বীজের শস্য উত্তমরূপ পরিপক্ক হয় না। পরিপুস্ট বীজ পাইবার জন্য আমরা বৎসর বৎসর বিলাত ও আমেরিকা হইতে বীজ আমদানি করিয়া থাকি। ঐ বীজের উত্তম চারা হয়।

শ্রীফল।

সৃষ্টিকর্ত্তার সৃজিত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে বেল একটী উপাদেয় সামগ্রী। কথিত আছে—দেবাদিদেব মহাদেব এই ফলকে সর্ব্বপেক্ষা উত্তম বলিয়া শ্রীফল, এই নামকরণ করিয়াছেন। এবং ইহার পত্র [illegible] আদরে শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিতেছেন। ফলতঃ এ কথা নিতান্ত [illegible] বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ যাবতীয় ফলাপেক্ষা সুপক্ক শ্রীফল অতি সুমধুর। প্রচণ্ড নিদাঘ কালে শ্রীফলের সরবৎ পানীয় দ্রব্য মধ্যে বড় উপাদেয় পদার্থ, জগৎ-পাতা জগদীশ্বর যদি এই ফলাভ্যন্তর এতাদৃশ বীজ পরিপূর্ণ নাকরিতেন, তাহা হইলে ইহা যে কত আদরের সামগ্রী হইত তাহা বলা যায় না। তথাচ কি পক্ক, কি অপক্ক সকল প্রকার শ্রীফলই সম্পূর্ণ উপকারী। কাঁচা বেল খাইলে উদরাময় আরোগ্য হয় এবং কোষ্ঠ বদ্ধ রোগ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ হয়। পাকা বেল সরবত করিয়া খাইলে সারক, স্নিগ্ধ এবং গুরু পাক হয়। কিন্তু আস্বাদনে অতি উত্তম বলিয়া বোধ হয়।

আমাদিগের দেশে সচরাচর বন জঙ্গলেই বেল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ নিমিত্ত লোকে ইহার চাষে বড় একটা যত্ন করেনা কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহার চাষ হয়। ধনী লোকেরা নিজ নিজ উদ্যানে শ্রীফল বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন। ইহা অনেক প্রকার দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে বড় এবং অল্প বীজবিশিষ্ট বেলেরই চাষ লোকে আদর

পূর্ব্বক করিয়া থাকে। এই বৃক্ষ কণ্টকাকীর্ণ হওয়ায় লোকে বাগানের পগারে এবং এক পার্শ্বে আজ্জায়। ইহার চাষও তাদৃশ কঠিন নহে। একটী সুপক্ক শ্রীফল হইতে বীজ সকল বাহির করিয়া জলে ধৌত করত টবে আজ্জাইতে হয়। অনন্তর চারা বেলাতেই অন্য স্থানে পোতা কর্ত্তব্য, নতুবা যে স্থানে আজ্জাইতে হইবে, সেই স্থান উত্তমরূপ চসিয়া তথায় সার দিয়া ৫।৬ হস্ত অন্তর এক একটী গর্ত্তে জোড়া জোড়া বীজ পোতা বিধেয়, কেন না যদি দৈবাৎ একটা বীজ অঙ্কুরিত না হয় তবে অপরটা হইবার নিশ্চয়ই সম্ভাবনা। এই বৃক্ষের পত্র সকল কোন পশুতে খায় না এবং নষ্টও করে না। তবে মধ্যে মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং জল দেওয়া উচিত, নতুবা মরিয়া যাইতে পারে। এইরূপে অল্প দিন মধ্যেই বিল্ব বাগান প্রস্তুত হইতে পারে। ক্রমে ফল বিক্রয় করিয়াও উদ্যানস্বামী প্রচুর লাভ পাইতে পারে। আমাদিগের দেশে একটী সামান্য লোকের এক বিল্ব বাগান আছে, তাহার প্রমুখাৎ শ্রুত হওয়া গেল যে, ঐ বাগা- নের শ্রীফল বিক্রয় করিয়া সে ব্যক্তি খাজানা বাদে বার্ষিক ২০।২২ টাকা উপসত্ত্ব ভোগ করে। ইহা হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে এপ্রকার লাভজনক কার্য্যে সকলেরই প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

পুরাকালের মুনি ঋষিগণ শ্রীফল আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা শ্রীপঞ্চমীর দিন শ্রীফল ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। এবং ইহার পত্র সকল দেবার্চ্চনায় ব্যবহার করিতেন। বৃক্ষটী হোমাদি যাজ্ঞিক কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন। তদবধি ইহা আমাদের দেশে পবিত্র বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এবং লোকেও ইহার পূজা করিয়া আসিতেছে।

আর এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতি বেল আছে, তাহাকে কয়েত বেল কহে। ইহাও অত্যন্ত উপকারী, বিশেষতঃ ইহা অরুচির রুচি করে। পত্র সকল পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। এবং কোন কোন ঔষধেও লাগে। বৃক্ষটীও বেল বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ নহে। সুপক্ক কয়েত বেলের অম্বল অতি পরিপাটী হয়। এই ফলের বৃক্ষ সকল স্বভাবতঃ সকল

স্থানেই জন্মে, লোকে কদাচ ইহা আজ্জায় এবং ইহা বিক্রয় করিয়াও থাকে। রোগ বিশেষে অত্যন্ত উপকারী।

শ্রীকরালীপদ মুখোপাধ্যায়।
ভাস্তাড়া

মধুরিকা বা মৌরী।

মৌরী নদীভরাটে * রসপলে জমিতে অতি উত্তম জন্মে। ইহার আবাদে বিশেষ ব্যয় বাহুল্য দেখিনা। উক্ত রূপ জমি দেখিয়া ভাদ্র মাসের শেষ বা আশ্বিন মাসের প্রথমে একবার দোয়ার চাষ করিয়া এক পালা মই টানিয়া ভূমি সমান করিয়া রাখিতে হয়। আশ্বিন মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিকমাসের প্রথম পক্ষ পর্য্যন্ত মৌরী বুননের প্রকৃত সময়। এই কাল মধ্যে যেমত পারা যায় এক খান চাষ দিয়াবিঘা প্রতি ॥০ সের বীজ বপন করিয়া বীজ ঢাকামত আর এক বার চাষ দিয়া মইদ্বারা বীজ বপিত ক্ষেত্র সমান করিতে হয়। দুই সপ্তাহ মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বহির্গত হইতে থাকে। ইহার আবাদে অন্য কোন প্রকার কারকিতের প্রায় প্রয়োজন হয়না।

পৌষ মাসের মধ্যে এই লক্ষ্য করিতে হইবে, ক্ষেত্রস্থ মৌরী গাছ সকল যদি সড়াল হইয়া উঠে, তবে উহার ডগা ছাঁটিয়া দিতে হইবে। ঐডগা গুলি পরিত্যাজ্য নহে, গো মহিষাদির অতি পুষ্টিকর আহারীয়; তদ্ভিন্ন এই শাক অন্নের অত্যুত্তম উপকরণ সামগ্রী হয়। গাছ যত ঝাড়াল হইবে ততই অধিক পরিমাণে শস্য ফলিবে। যখন ইহার ডগায় ডগায় পুষ্পগুচ্ছ প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন মৌরী ক্ষেত্রের কিপর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় মনোহর শোভা তাহা বলা সুকঠিন। যেমন

* যে স্থানে পূর্ব্বে নদী বা খাল ছিল, তাহা কালক্রমে রেতী জমিয়া জমিয়া সেই স্থান পূর্ণ হইয়া সমভূমি হইয়া গিয়াছে এরূপ ভূমিকে নদী ভরাটে জমী কহে।

দৃশ্য শোভা, তাহার উপর আবার তেমনই দূরব্যাপক সদ্গন্ধ। মাঘের শেষ হইতে ফাল্গুণের শেষপর্য্যন্ত মৌরী সুপক হয়; গম যব শষ্যাদির ন্যায় কর্ত্তন ও মর্দ্দনাদি করিয়া লইতে হয়। মৌরী উত্তম জন্মিলে বিঘা প্রতি পাঁচ মণ হইতে আট মণ পর্য্যন্ত ফলে। ইহার দরও নিতান্ত কম নহে।

আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে মৌরী পাক মসলায় ও পান মসলায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তদ্ভিন্ন ঔষধাদিতেও প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক হইতেছে, এবং ইহা সর্ব্বসাধারণেই দেখিয়া আসিতেছেন কিন্তু কি প্রকারে ইহার আবাদ করিতে হয়, কোন্ প্রকার ভূমি ইহা বপনের উপযুক্ত, এতদ্বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বোধ করি অনেকেই নিরুত্তর থাকেন। আমরা সর্ব্বদা যে সকল দ্রব্য সুখে ব্যবহার করিয়া থাকি, তৎসম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকা ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি আধুনিক সুসভ্য জন পদ সমূহে কৃষিকার্য্যের যে রূপ দিন দিন উন্নতি সংসাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে কতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পাঠক গণ একবার স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি; যে স্বর্ণ প্রসবিণী আদি সভ্যস্থান ভারত এক কৃষি কার্য্যের অনুন্নতিতে তাহার কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। প্রবাদ কথায় বলে "রাজার সুখে অরণ্যে বাস"। কৃষি বলুন, লেখা পড়া বলুন, দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা বলুন, যাবতীয় জনসুখকর বিষয় রাজার শুভ দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। রাজার যত্ন সাহায্য ভিন্ন কোন ক্রমেই তাহার শুভ সাধন হইবার যোনাই।

শ্রীপ্যারি মোহন গোস্বামী।
মনিখালি

শণ।

(৫৪ পৃষ্ঠার পর)

শণ আমাদের একটী আবশ্যকীয়বস্তু। পাট যেরূপ আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, শণ তদপেক্ষা কম বটে, কিন্তু যে সমস্ত কার্য্যে সূত্রের দৃঢ়তার প্রয়োজন তৎসমুদয়ই শণ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। উৎকৃষ্ট দড়ি, জেলের জাল, চট, ঘুড়ির ডোর প্রভৃতি শণে উত্তম প্রস্তুত হয়। গৃহ-কার্য্যের নিমিত্ত শণ ব্যবহার করিলেও পরিপাটীরূপে কার্য্য সমাধা হয়। আজ কাল বিদেশীয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ শণসূত্র পশমের সহিত করিয়া অতি উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার যথেষ্ট আবাদ এদেশে দেখা যায়না। পূর্ব্ববারে আমরা দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মালদহ, পুর্ণিয়া, প্রভৃতি অঞ্চলের শণআবাদের প্রণালী ও আয় ব্যয়াদির বিবরণ পাঠক মহোদয় দিগকে জ্ঞাত করিয়াছি; এবারে রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা যশোহরপ্রভৃতি স্থান সমূহের শণআবাদের রীতি এবং আয় ব্যয়ের বিষয় লিখিতে বাধ্য হইলাম। বিবেচনা করিয়া দেখিলে শণের চাষ বহুল পরিমাণে হইলে বড়ই লাভের বিষয় হইতে পারে ও দেশীয় কার্য্যে ব্যবহারেরও সুবিধা হয়।

শণ এদেশে দুই প্রকার। কিন্তু এই দুই প্রকারের গাছ ও বীজ একই। ঋতু ভেদে রোপণের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকাতেই দুই প্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। একপ্রকার হৈমন্তিক দ্বিতীয় প্রকার ভাদই।

শণের জমিতে সার দেওয়া আবশ্যক, যে সকল জমি বর্ষার দুই মাস জলে ডুবিয়া থাকে ও ধান রোপণ করা হয় এবং পক্ব ধান্য কর্ত্তন করিলে ধান্য গাছের অর্দ্ধাংশ জল থাকিয়া যায়, এবং ঐ সমস্ত তৃণ জলে পচিয়া অথবা শুষ্ক হইলে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিলেই যথেষ্ট সার প্রস্তুত হয়। অন্যথা গোবরের অথবা পুষ্করিণীর পচামাটীর সার দিবে। হৈমন্তিক শণের জন্য জলাভূমির আবশ্যক, কারণ উহাতে সার অক্লেশেই প্রস্তুত হয়, এবং বিনা জল সিঞ্চনেই উত্তম ফসল হয়। কার্ত্তিক মাসে ধান কাটি

য়াই জমির খড় আগুন দিয়া দগ্ধ করিয়া দিবে। এবং জমি সরস থাকিতে থাকিতেই চাষ দিতে থাকিবে। যখন ঢিল উঠিবে তখন উহা মৈ দিয়া ভাঙ্গিয়া দিবে। এইরূপে ১০। ১২ বার চাস ও মৈ দিয়া যখন দেখিবে যে জমির রীতিমত পাইট হইয়াছে ও সমস্ত মাটী ধুলিবৎ হইয়াছে তখন বীজ বপন করিবে। বীজ এত ঘন হওয়া চাই যেন এক অঙ্গুলি অন্তর গাছ হইতে পারে। ত্রিশ শের বীজে এক বিঘা জমীর বপন কার্য্য সম্পন্ন হয়। বীজ বপন করিয়া তখনই চাষ ও মৈ দিতে হইবে। বীজ বপনের পূর্ব্বে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যেন ভূমিতে বড় বড় ঢিল নাথাকে, কারণ তাহা হইলে শণের বীজ অঙ্কুরিত হইতে ব্যাঘাত হয়। এবং গাছ সোজা হইয়া উঠিতে পারেনা। বীজ অঙ্কুরিত হইলে সাবধানতা পূর্ব্বক সতত রক্ষা করিবে যেন কোন পশ্বাদি উহার উপর দিয়া না যায়, তাহাহইলে অনেক গাছ নষ্ট হইতে পারে। গাছ যখন এক হস্ত পরিমিত উচ্চ হইবে তখন পশ্বাদি বিচরণ করাতে গাছ মরেনা বটে, কিন্তু হেলিয়া দুলিয়া পড়াতে অনেক ক্ষতি হয়। গাছ প্রায় দুই হস্ত উচ্চ হইলেই ফুল হইতে থাকে, ফুল দেখিতে ঠিক অতসী ফুলের ন্যায়। ফুল হওয়ার পরেও গাছ প্রায় ১।০ ১॥০ হাত বৃদ্ধি হয়। ফাল্গুণ মাসের শেষে অথবা চৈত্র মাসের প্রথমে যখন দেখিবে বীজ প্রায় পক্বাবস্থায় উপনীত হইল ও গাছের গোড়ায় পত্র সকল পতিত হইতে লাগিল তখনই শণ উৎপাটন করিবে। কোন কোন স্থলে শণগাছ গুলি গোড়ার নিকট কাটিয়া লয়। কিন্তু তাহাতে শিকড়ের শণ গুলি পাওয়া যায়না, সুতরাং গাছ উঠান ভাল। গাছ উঠাইয়া বড় বড় আঁটী বাঁধিয়া অগ্রভাগের ৫।৬ অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিবে,। পরে জলে পচাইতে দিবে, পাঁচদিন পচানের পর প্রতিদিন দেখিবে যে শণ রীতিমত পচিয়াছে কিনা? অর্থাৎ মূলদেশের সুত্র ধরিয়া টানিলে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত সূত্র খসিয়া আসে কিনা? যখন দেখিবে যে সমস্ত সূত্র খসিয়া আসিতেছে তখন আর বিলম্ব না করিয়া শণ ধুইতে থাকিবে। শণ ধুইবার রীতি মেস্তা ধোয়ারমত নহে। ইহার এক একটী আঁটি ধরিয়া ২ স্থানে

ভাঙ্গিয়া পশ্চাৎ ধুইতে হয়। শণ ধৌত হইলে রৌদ্রে রীতিমত শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। পচান শণ ধুইতে বিলম্ব করিলে সমস্ত সূত্র বহির্গত হয়না ও সূত্র অতিক্ষীণ হয়।

ভাদই শণও ঠিক এই প্রণালীতে আবাদ করিতে হয়। কেবল উহার জমি কিঞ্চিৎ উচ্চ হওয়া আবশ্যক। ইহাতে গোবরের সার দিতে হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই শণের আবাদ করিয়া থাকে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহা কাটিয়া ধৌত করিতে হয়। এই শণের বীজ পাকাইয়া রাখিলেই বপন কার্য্য চলিতে পারে।

হৈমন্তিক শণের জমিতে ধান পাট ইত্যাদি আবাদ হয়। তাহাতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, ধান্যাদি চাষের পর এক বার চাষ ও মৈ দিলেই হয়। ভাদই শণের জমিতে শরিসা, যব গোধুম ইত্যাদির আবাদ হইতে পারে। এক বিঘা জমির নিম্ন লিখিত হিসাবে (মাঝামাঝিতে) আয় ব্যয় দেখান হইল। সময় সময় ইহাপেক্ষা অনেক অধিক আয় হইয়া থাকে।

ব্যয়।

কৃষকের বেতন ও খোরাকী	২॥০
গরুর খোরাকী	১৲
বীজ	৪৲
জমীর রাজস্ব (অর্দ্ধবৎসরে)	৸০
কর্ত্তন বাবৎ মজুর খরচ	১৸০
ধোলাই খরচ	২৲
	১২৲

এক বিঘা জমিতে শণ ৬মোণ হইতে ১২মোণ হইতে পারে, অতএব এস্থলে ৮মোণ ধরা হইল। শণের মূল্য ৫৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকাপর্য্যন্ত হইয়া থাকে অতএব এস্থলে ৮৲ টাকার হিসাবে ধরা হইল, ইহাতে দেখা যায় যে ৮ মোণ শণের মূল্য ৮৲ টাকার হিসাবে ৬৪৲ টাকা হয়। ব্যয় ১২৲ টাকা বাদ দিলেও ৫২৲ টাকা প্রতি বিঘায় লাভ থাকে। এরূপ লাভ জনক কৃষিকার্য্যে যে কেনই ভারত বাসীর সমধিক আদর নাই তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বিবেচনা হয়।

চাডট্ট কৃষি শিক্ষা প্রদায়িণী সভা।

বেহার অঞ্চলে চাষ সম্বন্ধীয় প্রবাদ।

বেহার প্রদেশে প্রতি বৎসর কৃষির ভবিষ্যৎ ফল জানিবার সম্বন্ধে বহু কালাবধি একটী নিয়ম প্রচলিত আছে, এবং ঐ পরীক্ষা মান্য বলিয়া তাল কৃষকেরা বিশ্বাস করেন, তাহা এই যে প্রতি বৎসর পলাস বৃক্ষের ফল ফলিবার সময় ঐ বৃক্ষের ফলের বীজ অবলোকন করেন, তাহাতে তিনটী বীজ জন্মিয়া থাকে। ঐ তিনটী বীজের দ্বারা তিন ফসল ধরা যায় অর্থাৎ ভাদই, ধান্য ও রবিফসল। উক্ত তিনটী বীজ যদি পূর্ণাবয়ব জন্মিয়া থাকে, তাহাতে জানা যায় যে প্রত্যেক তিনটী ফসলই পূর্ণরূপে জন্মিবে কিন্তু যদি তাহার মধ্যে কোন অন্যরূপ থাকে, তবে তাহার অবয়বের ভাবের সহিত মিল করিয়া প্রত্যেক ফসলের উৎপন্ন হইবার ভাব গ্রহণ করা যায়। এইবার পলাসের বীজ একটী কেবল তুষের ন্যায় সার রহিত ছিল তাহাতে ভাদই ফসল কিছুই হয় নাই এবং আর একটী অর্দ্ধ ছিল তাহাতে অর্দ্ধ ধান্য হইবার আশা আছে, শ্রাবণ মাসের পর আর জল বৃষ্টি হয় নাই নিম্ন ভূমির ধান্য অদ্যাপি জীবিত আছে এবং জল সেচন দ্বারা হইবার আশা করা যাইতেছে কিন্তু উচ্চভূমির ধান্য আর কাটিবার আশা নাই তৃতীয় বীজ পূর্ণাবয়ব ছিল তাহাতে লোকে অনুমান করেন যে রবিফসল ভাল হইবে এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিলাম প্রায় ২০ ক্রোশের মধ্যে দশ বারজন এই অঞ্চলের পলাস বীজ সম্বন্ধে ঐরূপ বলিলেন যে এই বৎসরে মোটে ১॥০টী বীজ ছিল এবং এই নিয়মের ব্যতিক্রম কখন ও ঘটে নাই এবং যত দূর প্রদেশে ঐ নিয়মে শস্য উৎপন্ন হইবে তত দূর পলাস গাছের বীজ ও সর্ব্বত্র এক রূপ জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে এইরূপ প্রবাদ কখনও শুনা যায় নাই, অতএব লিখিতেছি যে যদি এই নিয়ম যথার্থ হয় তবে অনেক ফল দায়ক ও নিয়ম প্রকাশক এবং সকল প্রদেশে ইহার পরীক্ষা প্রচলিত করিয়া ইহার

সত্যাসত্য স্থির করা কর্ত্তব্য বটে ; এবং যে স্থানে পলাস গাছ নাথাকে তথায় রোপণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য ।

শ্রীমদন মোহন ভট্ট ।
বেহার

গাছ পান ।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্রেরই এই পানের বিষয়টী অবগত হওয়া আবশ্যক, বোধ হয় এই বঙ্গভূমির অনেক স্থানে এই পানের নাম পর্য্যন্তও প্রকাশিত নাই । কিছু পরিশ্রম স্বীকার করিলে সর্ব্বত্রই এই জাতীয় পানের চাষ হইতে পারে । ইহার চাষ প্রণালী অতীব সহজ এবং অল্পায়াস সাধ্য । পল্লিগ্রামস্থ গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহ সমীপে আম, জাম,, কাঁটাল, আমড়া কোন না কোন গাছ সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয় । সাধারণ পানের চাষের ন্যায় ইহাতে কেশে প্রভৃতির ঘেরার আবশ্যক করে না । পূর্ব্বোক্ত কোন একটী বৃক্ষের ছায়াই পানের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করে । এবং ঐ এক মাত্র গাছে পান জন্মাইতে পারিলে একটী গৃহস্থের পরিপোষণ হইয়া থাকে ।

পান, গাছের চারিপার্শ্বে লাগাইবার পূর্ব্বে চারা প্রস্তুত করিতে হয় । পুরাতন ঐ জাতীয় গাছের মূল তুলিয়া কোন স্থানে ছাপর করিয়া ঐ মূল রোপণ করিতে হয় । ঐ মূল হইতে স্বতন্ত্র চারা জন্মিলে তাহা তুলিয়া নির্দ্ধারিত বৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে রোপণ করিতে হয়, রোপণ করিবার পূর্ব্বে ঐ বৃক্ষের নিকটস্থ মাটী পাট করিয়া রাখিতে হয় ১ ভাগ বালি ২ ভাগ মাটী ১ ভাগ গোময় এবং অর্দ্ধভাগ খৈলদিয়া মাটীটী পরিপাটী করিয়া রাখিতে হয়, তদুপরি চারা রোপণ করিয়া যেমন চারা বাড়িতে থাকে প্রত্যেক চারার নিকট আশ্রয় হেতু একটী একটী কাটী পুতিয়া বৃক্ষের উপর নম্রভাবে

রাখিতে হয় । চারা গুলি বৃদ্ধি হইয়া ঐ কাটীটী উত্তীর্ণ হইলে সমস্ত চারা গুলিকে একগাছি শণের দড়ি দিয়া গাছে বাঁধিয়া দিতে হয় । কিন্তুকসিয়া বাঁধিলে পান গাছ মরিবার অধিক সম্ভাবনা । এবিধায় উহা এই রূপ কৌশল সহকারে বাঁধিতে হয় যে গাছে কোনরূপ আঘাত না লাগে, ক্রমে ক্রমে পান গাছ গুলি বাড়িয়া গাছের গুঁড়ি পার হইয়া গেলে আর কিছুই করিতে হয়না তখন পুরাতন পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া লইলে অতি সুখাদ্য হয় । এই পান সাধারণ পান অপেক্ষা ঈষৎ তীব্র এই জন্য কিছু চুণ বেশী দিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

পান যখন বৃক্ষের চারি দিকে কমিয়া যায় তখন আর কোনরূপ যত্ন পরিশ্রম আবশ্যক করেনা, শুদ্ধ মাত্র মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলেই যথেষ্ট হয় ।

এই পান চাষ করিতে কোন জাতির পক্ষেই নিষিদ্ধ হইতে পারেনা ; কারণ বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে এই পান স্বতই জন্মিয়া থাকে, আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য পান এইরূপ স্বল্পায়াস লব্ধ হইলে গৃহস্থ মাত্রের যে কত উপকার, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যায় । গৃহস্থ মাত্রেরই এই পান বাটীতে অথবা উদ্যানে রোপণ করা কর্ত্তব্য ।

শ্রীমধু সূদন চৌধুরি ।
সেরাজগঞ্জ ।

সাগু ।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে নামটী প্রদর্শিত হইল তাহা সাগু বৃক্ষ । সাগু তালজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে পরিগণিত । একএকটী গাছ ১৭।১৮ হাত বড় হইয়া থাকে । মলক্কস ও ফিলিপাইন-পুঞ্জ নামক দ্বীপ সমূহে প্রচুর সাগু বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে । এক্ষণে এদেশে অনেক স্থানে সাগু

সত্যাসত্য স্থির করা কর্ত্তব্য বটে; এবং যে স্থানে পলাস গাছ নাথাকে তথায় রোপণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীমদন মোহন ভট্ট।
বেহার

গাছ পান।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্রেরই এই পানের বিষয়টী অবগত হওয়া আবশ্যক, বোধ হয় এই বঙ্গভূমির অনেক স্থানে এই পানের নাম পর্য্যন্তও প্রকাশিত নাই। কিছু পরিশ্রম স্বীকার করিলে সর্ব্বত্রই এই জাতীয় পানের চাষ হইতে পারে। ইহার চাষ প্রণালী অতীব সহজ এবং অল্পায়াস সাধ্য। পল্লিগ্রামস্থ গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহ সমীপে আম, জাম, কাঁটাল, আমড়া কোন না কোন গাছ সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয়। সাধারণ পানের চাষের ন্যায় ইহাতে কেশে প্রভৃতির ঘেরার আবশ্যক করে না। পূর্ব্বোক্ত কোন একটী বৃক্ষের ছায়াই পানের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এবং ঐ এক মাত্র গাছে পান জন্মাইতে পারিলে একটী গৃহস্থের পরিপোষণ হইয়া থাকে।

পান, গাছের চারিপার্শ্বে লাগাইবার পূর্ব্বে চারা প্রস্তুত করিতে হয়। পুরাতন ঐ জাতীয় গাছের মূল তুলিয়া কোন স্থানে হাপর করিয়া ঐ মূল রোপণ করিতে হয়। ঐ মূল হইতে স্বতন্ত্র চারা জন্মিলে তাহা তুলিয়া নির্দ্ধারিত বৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে রোপণ করিতে হয়, রোপণ করিবার পূর্ব্বে ঐ বৃক্ষের নিকটস্থ মাটী পাট করিয়া রাখিতে হয় ১ ভাগ বালি ২ ভাগ মাটী ১ ভাগ গোময় এবং অর্দ্ধভাগ খৈলদিয়া মাটীটী পরিপাটী করিয়া রাখিতে হয়, তদুপরি চারা রোপণ করিয়া যেমন চারা বাড়িতে থাকে প্রত্যেক চারার নিকট আশ্রয় হেতু একটী একটী কাটী পুতিয়া বৃক্ষের উপর নম্রভাবে

রাখিতে হয়। চারা গুলি বৃদ্ধি হইয়া ঐ কাটীটী উত্তীর্ণ হইলে সমস্ত চারা গুলিকে একগাছি শণের দড়ি দিয়া গাছে বাঁধিয়া দিতে হয়। কিন্তুকসিয়া বাঁধিলে পান গাছ মরিবার অধিক সম্ভাবনা। এবিধায় উহা এই রূপ কৌশল সহকারে বাঁধিতে হয় যে গাছে কোনরূপ আঘাত না লাগে, ক্রমে ক্রমে পান গাছ গুলি বাড়িয়া গাছের গুঁড়ি পার হইয়া গেলে আর কিছুই করিতে হয়না তখন পুরাতন পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া লইলে অতি সুখাদ্য হয়। এই পান সাধারণ পান অপেক্ষা ঈষৎ তীব্র এই জন্য কিছু চুণ বেশী দিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পান যখন বৃক্ষের চারি দিকে কমিয়া যায় তখন আর কোনরূপ যত্ন পরিশ্রম আবশ্যক করেনা, শুদ্ধ মাত্র মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলেই যথেষ্ট হয়।

এই পান চাষ করিতে কোন জাতির পক্ষেই নিষিদ্ধ হইতে পারেনা; কারণ বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে এই পান স্বতই জন্মিয়া থাকে, আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য পান এইরূপ স্বল্পায়াস লব্ধ হইলে গৃহস্থ মাত্রের যে কত উপকার, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যায়। গৃহস্থ মাত্রেরই এই পান বাটীতে অথবা উদ্যানে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমধু সূদন চৌধুরি।
সেরাজগঞ্জ।

সাগু।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে নামটী প্রদর্শিত হইল তাহা সাগু বৃক্ষ। সাগু তালজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে পরিগণিত। একএকটী গাছ ১৭।১৮ হাত বড় হইয়া থাকে। মলক্কস ও ফিলিপাইন্‌পুঞ্জ নামক দ্বীপ সমূহে প্রচুর সাগু বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে এদেশে অনেক স্থানে সাগু

বৃক্ষ দেখা যায়। আমরা পীড়িতাবস্থার যে সাগু পথ্য জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা এই সাগু জাতীয় বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাগু অত্যন্ত লঘু পথ্য এজন্য চিকিৎসকেরা রোগের অবস্থায় উহা পথ্য ব্যবস্থা করেন। সকলপ্রকার রোগেই সাগু পথ্য হইতে পারে। সাগুর বিশেষ গুণ এই যে উহা যেমন লঘু সেইরূপ অল্পসময়ে পরিপাক হইয়া থাকে। সাগুর ন্যায় লঘু পথ্য আর কিছুই নাই। আমাদের দেশে পূর্ব্বে সাগু ব্যবহার ছিলনা। অল্প দিন হইল উহা ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে সাগু ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা কি উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহার বৃক্ষের আকার কিপ্রকার এবং কি নিয়মে সেই বৃক্ষ রোপণাদি করিতে হয়, বৃক্ষের কোন্ অংশ হইতে কি প্রণালীতে সাগু প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা অনেকেই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কি প্রকারে সাগু প্রস্তুত করিতে হয়, আমরা কেবল তদ্বিষয়টী এইখানে লিখিলাম।

বাজারে যে সাগু দানা বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা সাগুজাতীয় বৃক্ষের মজ্জা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৃক্ষ হইতে সাগু বাহির করিতে হইলে, বৃক্ষ কাটিয়া তাহা লম্বাভাবে চিরিতে হয়। এই রূপ করিয়া চিরা হইলে তাহার মধ্য হইতে মজ্জা বাহির হইয়া পড়ে। পরে সেই মজ্জা চূর্ণ করিয়া চালনীতে উত্তম রূপে চালিতে হইবে। অনন্তর তাহা জলে গুলিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। সেই মণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিলে দানার ন্যায় সাগু প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাগু সম্বন্ধে অনেকের মনে কুসংস্কার আছে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সাগু অন্নের মাড় শুকাইয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এজন্য উহা অপবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সাগু অন্নের মণ্ড নহে। উহা ব্যবহারে কোন দোষ নাই। সাগুদ্বারা উত্তম পায়সও প্রস্তুত হইয়া থাকে। আজ কাল যেরূপ সাগু ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে এসময় এদেশে উক্ত জাতীয় বৃক্ষের আবাদ করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে।

কৃষিবিদ্যা।

জগতে যে কোন বিষয়ের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই জ্ঞান সাপেক্ষ। জ্ঞান সম্পন্ন সুসভ্য দেশ সমূহের অবস্থার সহিত অজ্ঞানাচ্ছন্ন অসভ্য দেশের তুলনা করিলে স্বর্গ ও পৃথিবী বলিয়া বোধ হয়। যে দেশে বিদ্যার যে পরিমাণে আলোচনা হইয়া থাকে, সেই দেশের অবস্থাও সেই পরিমাণে উন্নতি—পথে ধাবিত হয়। প্রাচীন ভারতে নানা বিদ্যার অনুশীলন ছিল বলিয়াই ভারতের এত গৌরব এত সুখ্যাতি এবং এত কীর্ত্তি। কি সাহিত্য কি জ্যোতিষ, কি গণিত, কি দর্শন, কি চিকিৎসা, কি শিল্প, কি কৃষি সকল বিদ্যারই সম্যক্ অনুশীলন ছিল। কাল ক্রমে ঐ সকল বিদ্যার আলোচনা যে পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, সেই সঙ্গে ভারতেরও অবস্থা শোচনীয় আকারে পরিণত হইল। ভারতের প্রভুত্ব, ভারতের সমৃদ্ধি, ভারতের সুখ সস্বচ্ছন্দতা, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল। ভারত হস্ত পদ থাকিতে পঙ্গুর ন্যায়, চক্ষু কর্ণ থাকিতে জড়ের ন্যায়—বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকিতে পশুর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদেশীয় বিদ্যার আলোকে ভারত উজ্জ্বল, বিদেশীয় বাণিজ্যস্রোতে ভারত বক্ষ প্রবাহিত বিদেশীয় কৃষির কর্ষণে ভারত ক্লিষ্ট হইতেছে; অথচ দেশীয় সংস্কৃত ভাষার প্রভা-হীন, দেশীয় বাণিজ্য অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় মৃদু গতিতে সঞ্চারিত, এবং দেশীয় কৃষি দিন দিন হতাদর হইতেছে এখন পরাশরের ন্যায়, বশিষ্ঠের ন্যায়, কৃষিবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত আর দেখা যায় না। কৃষি বিদ্যার অনুশীলন ভারতবাসীদিগের নিকট আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয়না। কৃষিকার্য্য সভ্যতাভিমানী হিন্দু জাতির নিকট অনাদৃত হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত কৃষিরপ্রতি দেশীয় লোকের এইরূপ অযত্ন ও হতাদর থাকিবে ততদিন দেশ মধ্যে খাদ্যের সস্থলতা হইবেনা।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কৃষি ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত। যে বিদ্যার উন্নতির উপর আমাদের জীবন, সভ্যতা ও সম্পদ নির্ভর করিতেছে দেশমধ্যে বহুল প্রকারে যতই তাহার অনুশীলন হয় ততই মঙ্গল।

এদেশে কৃষি বিদ্যা শিখিবার কোন রূপ ব্যবস্থা নাই। পরম্পরাগত রীতি অনুসারে কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে তাহাতে আবার যে নিয়মে হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে। ভদ্র বংশীয় কোন ব্যক্তি কৃষি বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা করিলে সামান্য কৃষক দিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হয়। দেশীয় কৃষক গণ কৃষি বিদ্যায় যেরূপ পণ্ডিত তাহাও কাহার অবিদিত নাই। কি উপায়ে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়। কোন্ মৃত্তিকায় কোন্ কোন্ পদার্থ কত ভাগ আছে কি প্রকার মৃত্তিকায় কি প্রকার সার দিতে হয়, কৃষিব্যবহার্য্য যন্ত্র সমূহের মধ্যে কি কি দোষ আছে। তৎসম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় জ্ঞানে বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং অজ্ঞ জাতি দ্বারা উন্নতির আশা করা যাইতে পারেনা।

পৃথিবীর মধ্যে সুসভ্য দেশ মাত্রেই কৃষি বিদ্যার সম্যক্ অনুশীলন হইয়া থাকে। অনেক স্থানে কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। তথায় সাধারণ লোক সমূহ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। এদেশে কৃষিবিদ্যা শিখাইবার কোন অনুষ্ঠানই নাই। সম্প্রতি মান্দ্রাজে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে তত্রত্য অনেকের পক্ষে শিক্ষা লাভ সহজ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই বঙ্গদেশে এপর্য্যন্ত কৃষি বিদ্যা শিখাইবার কোন উপায় অবধারিত হয় নাই। ভারত যেরূপ উর্ব্বরাক্ষেত্র এখানে কৃষিবিদ্যার অনুশীলন হইলে কৃষি জগতে যে কতদূর উন্নতি হয় তাহা কাহাকে লিখিয়া বুঝাইতে হইবে না; এমন কৃষি প্রধান দেশেও যে দুর্ভিক্ষের অত্যাচার; ইহা বারপর নাই পরিতাপের বিষয়।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে কৃষি সম্বন্ধে কোন পুস্তক বা পত্রিকা পড়াইবার ব্যবস্থা নাই। কি ধনী, কি কৃষক, কি ব্যবসায়ী, কি শিল্পকর,

কি যাজক, সকলেরই সন্তান একরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকেন। সংসারে অবস্থাভেদী বালক দিগকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং বিদ্যালয়ে যদি পৃথক পৃথক বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত ও পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা হয়, তবে বালকেরা নিশ্চয়ই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সকলেই চাকুরীর দিকে অগ্রসর হয়েন না। এদেশে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে শিক্ষিত শ্রেণী চাকুরী ভিন্ন আর কোন স্বাধীন ব্যবসা করিতে সমর্থ হয়েন না; কেবল মাত্র চাকুরী দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কস্মিন্ কালেও দেশের অবস্থা উন্নত করিতে পারিবেননা।

এক্ষণে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাদান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আন্দোলন হইতেছে, এ আন্দোলন হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া দাড়াইয়াছে কারণ দেশের সাধারণ লোক অশিক্ষিত থাকিলে কোন ক্রমে এ দেশের কৃষিকার্য্যাদির উন্নতি হইবেনা।

বৃক্ষ।

"বৃক্ষাদয়োপ্যমী সর্ব্বে,
লোকানাং হিতকারকাঃ।"
সর্ব্ব দর্শক।

বৃক্ষ যে একটী নির্ম্মল সুখের আধার তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিবেষ্ঠিত থাকিলে যেমন সুখে থাকা যায়, উদ্যানস্থিত বৃক্ষ লতা পুষ্প ইত্যাদি লইয়াও মনুষ্য সেইরূপ আনন্দিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর সকল দেশেই বৃক্ষের আদর দেখা যায়, উদ্যানস্থিত বৃক্ষের শোভায় আকৃষ্ট না হয় এমত লোক অতি দুর্ল্লভ। বৃক্ষ দ্বারা সংসারের যে কত উপকার সাধিত হইতেছে তাহা বর্ণনা করিয়া

শেষ করা যায় না। পৃথিবীর কত স্থানে যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সবিশেষ তত্ত্ব অবগত হওয়া বচনাতীত সুখের বিষয়। পরমেশ্বর অসংখ্য বৃক্ষ দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। জগৎ কাননে এক একটী বৃক্ষে যে তাঁহার কত শক্তি কত মহিমা, কত কৌশল এবং কত দয়া প্রকাশিত রহিয়াছে তাহা দর্শন করিলে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। বাস্তবিক পরমেশ্বর লোক দিগের হিতের নিমিত্ত বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। পরোপকার ব্রত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যেন বৃক্ষগণ সংসারাশ্রম শোভিত করিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষের ন্যায় উপকারী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। ছেদনকারীকে ছায়া দান দ্বারা শীতল করিতে এমন মহৎ দৃষ্টান্ত জগতে আর কি আছে।*

বৃক্ষ দ্বারা নানাবিধ উপকার লাভ করা যায়, বৃক্ষ না থাকিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন ব্যাপার হইত, তজ্জন্য ভারতবাসীগণ বৃক্ষাদির সেবার জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বৃক্ষ সেবার মহৎ ফল হিন্দু শাস্ত্রের সর্ব্বত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা একটী মহান ধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। বাস্তবিক বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ স্থানে স্থানে রোপিত হইলে, প্রখর রৌদ্রের সময় যে কত দূর উপকারজনক হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে যিনি মধ্যাহ্ন কালে প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে দগ্ধ কলেবর হইয়া অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারেন বৃক্ষগণ কিরূপ হিতকারী। বৃক্ষের প্রতি আদর অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

পরমেশ্বর অসংখ্য মনোহর পুষ্প ও ফল বৃক্ষ দ্বারা ভারত কানন সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখানকার মৃত্তিকায় সকল দেশীয় বৃক্ষাদিই প্রায় জন্মিয়া থাকে। যদিও ভারত ফল পুষ্পের জন্য অন্যের

*ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাস্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ।

মুখাপেক্ষী না হইলেও চলিতে পারে, তথাপি নানা দেশ হইতে বহুবিধ উদ্যান শোভাকর বৃক্ষাদি এদেশে আনীত হইয়াছে। কিন্তু সমধিক দুঃখের বিষয় ভারত সন্তানগণ তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। দেশীয় মহাত্মারা যেরূপ যত্নের সহিত পরপদ সেবা দাসত্ব বৃত্তি করিয়া থাকেন সেইরূপ যত্নের সহিত এক একটী উদ্যানস্থ বৃক্ষাদির সেবা করিলে অনায়াসে সুখে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। শাস্ত্রে কথিত আছে পুরা কালে কল্প পাদব মনুষ্যদিগকে সকল প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকিত। বাস্তবিক এটী কি শাস্ত্রকারদিগের প্রলাপ বাক্য, কি কবিদিগের কল্পনা প্রসূত, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার মধ্যে একটী সত্যের বীজ নিহিত আছে। বৃক্ষ সেবা করিলে অঙ্গ চালনা জনিত শারীরিক স্বাস্থ্যসম্পাদিত হয়, স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষের নব পল্লব, পুষ্প এবং মুকুল সন্দর্শন করিলে মনে অনির্ব্বচনীয় সুখের উদ্রেক হয়, পত্র রচনা পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও পুষ্প হইতে ফল সঞ্চার ইত্যাদি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও চিন্তা করিলে বিশ্বপতি পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা স্রোত হৃদয় হইতে প্রবাহিত হয়, বৃক্ষের ফল পুষ্প দান করিয়া দাতার ন্যায় পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারা যায়, এবং আবশ্যক মত উহা বিক্রয় দ্বারা আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিয়া সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারা যায়। স্বাস্থ্য, ঈশ্বর ভক্তি পরোপকার এবং অর্থ সঞ্চয় যে বৃক্ষের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে কল্প পাদপ নামে অভিহিত করা কখনই যুক্তি বিরুদ্ধ প্রলাপ বাক্য বলিতে পারা যায় না।

বৃক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, রোপণ প্রণালী এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধেও প্রাচীন ভারত বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য ও ইতিহাসে বৃক্ষাদির যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় পুরাকালে বৃক্ষাদির উন্নতি বিষয়ে নানা উপায় অবলম্বিত হইত। উদ্যান ও নগরেরশোভার জন্য কোন্ বৃক্ষ কোন্ স্থানে রোপিত হইলে

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তৎসম্বন্ধেও বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। ঋষিদিগের আশ্রম স্থিত বৃক্ষাজির শোভা বর্ণনা পাঠ করিলে কাহার চিত্ত তপোবন দর্শনে উৎসাহিত না হয়? তাপসগণ, ঋষি কন্যাগণ সংসারের পাপ প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সজীব চিত্র, নানা বিচিত্র পত্র শোভিত, ফল পুষ্প ভারাবনত আশ্রম তরু সমূহ লইয়া চিত্ত বিনোদন করিতেন। পরমেশ্বর মানবমন তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ আনন্দ-জনক বৃক্ষ সৃজন করিয়াছেন। এই নির্ম্মল আনন্দেবঞ্চিত থাকা যারপর নাই আক্ষেপের বিষয়। আর্য্যেরা বৃক্ষাদি জনিত পবিত্র আমোদ সর্ব্বদাই উপভোগ করিতেন এরূপ নহে, কোন্ বৃক্ষের কি গুণ তদ্বারা কি কি কার্য্য সাধিত হয় তৎ সম্বন্ধেও তত্ত্বদর্শী ছিলেন। বৃহৎ বৃহৎ ফলবৃক্ষ সকল কি নিয়মে রোপণ করিতে হয় অর্থাৎ বহু শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ সমূহ কতদূর অন্তর রোপণ করা উচিত তদ্বিষয়ে আর্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন।

"অভ্যাস জাতা স্তরবঃ সংস্পৃশন্তঃ পরস্পরং।
পত্রৈ মূলৈশ্চ ন ফলং সম্যক্ গচ্ছন্তি পীড়িতাঃ।
উত্তমং বিংশতি হস্তা মধ্যমং ষোড়ষান্তরং।
স্থানাৎ স্থানান্তরং বৃক্ষাণাং দ্বাদশান্তরং॥

যে কোন বৃক্ষের চারা রোপণ সময় বিবেচনা করা উচিত, বৃক্ষ বড় হইলে কতদূর ব্যাপিয়া শাখা সকল বিস্তৃত হইতে পারে। কারণ চারা সকল সম্পূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইলে যদি পরস্পর শাখা পত্র ও মূল সমূহে সংস্পর্শ হয় তাহা হইলে বৃক্ষ সতেজ হইতে পারে না এবং ফল ধরিতে ব্যাঘাত জন্মে। অল্প স্থানে অধিক বৃক্ষ রোপিত হইলে ঘনতা বশতঃ বৃক্ষগণ আবশ্যকীয় স্থান প্রাপ্ত না হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেপারে না এবং শিকড় সকল পরস্পর জড়িত হইয়া স্বাধীন ভাবে সঞ্চারিত হইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য ঘন রোপিত বৃক্ষ অপেক্ষা ফাঁকের গাছ অধিক পত্র ও বহু শাখা বিশিষ্ট তেজস্কর হইয়া প্রচুর ফল ধরিয়া থাকে,

আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি একএকটী বাগানে যে পরিমাণে ফল ধরিয়া থাকে, ফাকে রোপিত দুই একটী গাছে প্রায় সেই পরিমাণে ফল হইয়া থাকে। অতএব বৃহৎ শ্রেণীর বৃক্ষ সমূহ বিংশতি হস্ত অন্তর তদভাবে ষোড়ষ হস্ত অন্তর ন্যুন কল্পে দ্বাদশ হস্ত অন্তর রোপণ করা বিধেয়। বৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ঘন করিয়া রোপণ করিলে ফলোৎপাদনে যে ব্যাঘাৎ হইবেতাহা বলা বাহুল্য।

বৃক্ষাদি সম্বন্ধে অনেকের মনে নানা প্রকার কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়,। কাহার কাহার মনে এরূপ বিশ্বাষ যে চন্দন বৃক্ষ যে বনে থাকে, ঐ বৃক্ষের বাতাসে অরণ্যের অন্যান্য বৃক্ষও চন্দন বৃক্ষের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক চন্দন বৃক্ষ কোন বৃক্ষের বায়ু স্পর্শে গুণ প্রাপ্ত হয় না চন্দন এক জাতীয় বৃক্ষ। উহার কাষ্ঠ স্বাভাবিক সৌগন্ধে পরিপূর্ণ।

আকন্দ গাছ।

করুণাময় বিশ্বপতি মানব জাতির সুখের জন্য, উপকারের জন্য, সংসারকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। এক একটী বৃক্ষে এক একটী লতায় যে তাঁহার কত দয়া কত মহিমা তাহা দর্শন ও আলোচনা করিলে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। যাহা আমরা নিতান্ত হেয় ও অগ্রাহ্য জ্ঞান করিয়া থাকি, তাহাতেও তাঁহার জীবন্ত দয়া দেখিতে পাওয়া মনুষ্য যত বিজ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিবে, ততই পরমেশ্বরের অনুপম বিশ্বব্যাপার দেখিয়া মোহিত হইতে থাকিবে।

আকন্দ একটী সামান্য গাছ, কিন্তু ইহাদ্বারা নানা প্রকার উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই এই গাছ জন্মিয়া থাকে আকন্দের শিকড় ও ছালে নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার আটা বা দুগ্ধ জমাইয়া রাখিলে তাহা গোটা পাচার ন্যায় অনেক কার্য্যে লাগিতে পারে। এতদ্ব্যতীত আকন্দ গাছ দ্বারা আরও উপকার জনক

কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মেজর হ্যানিংস সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, আকন্দের ডাল ১২ কিম্বা ১৮ ইঞ্চ লম্বা করিয়া কাটিয়া ডালের ছাল খুলিতে হইবে, ছাল খুলিলে যে তুলা বাহির হইবে, তাহা একত্র করিয়া তুলার দুই পার্শ্বে সূতা দিয়া রগড়াইলে অথবা মাজিলে ঐ তুলা একেবারে সূতা প্রস্তুত হইবে। দর্জিতে যেমন সেলাই জন্য সুতা তৈয়ার করিয়া থাকে, উহাও সেইরূপ করিতে হইবে। এইরূপে সূতা প্রস্তুত করিতে কলের আবশ্যকতা করেনা কেবল মাত্র হস্তদ্বারা হইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আকন্দের সূতা ভিজাইলে অধিক শক্ত হইয়া থাকে।

হ্যানিংস সাহেব আকন্দের সূতার কাপড় ও দড়ি প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষীয় এগ্রিকল্চার সোসাইটীতে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন ফ্লাক্স দ্বারা যে যে কাজ হয়, আকন্দ সূতা দ্বারাও তৎসমুদায় কার্য্য হইতে পারে।

আকন্দের ফল তুলার ফলের ন্যায় সুতরাং তাহা হইতেও তুলা পাওয়া যায়। কার্পাস তুলার ন্যায় আকন্দ তুলা শক্ত নহে, কিন্তু এই তুলা সহজেই রং করা যাইতে পারে। হ্যানিংস সাহেব জনেক পঞ্জাব বাসী দ্বারা আকন্দ তুলার একখানি উৎকৃষ্ট তুল্চা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। বিলাতের ন্যায় এদেশে কৃষি বিষয়ে উন্নতি এবং যন্ত্রাদি থাকিলে এই তুলা দ্বারা নানা বিধ কার্য্য সাধিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গ দেশ অপেক্ষা পঞ্জাবে আকন্দ গাছ অধিক বড় হইয়া থাকে। পঞ্জাব বাসীরা আকন্দের মোটা শিকড় খুঁদিয়া তদ্দ্বারা সেতারার অলাবুর কার্য্য করিয়া থাকে। পাতা ভিজাইয়া কসের কার্য্য ব্যবহার করে, কাষ্ঠ পোড়াইয়া বারুদের কার্য্য করিয়া থাকে। আকন্দের দুগ্ধ বিষের ন্যায় প্রাণ নাশক পূর্ব্বে পঞ্জাবের ধাত্রীগণ এই দুগ্ধ স্তনে মাখাইয়া কন্যা সন্তান দিগকে উহা পান করাইয়া তাহাদিগের জীবন নষ্ট করিত।

সূর্য্যমুখী ফুল।

(Helianthus Califoricus.)

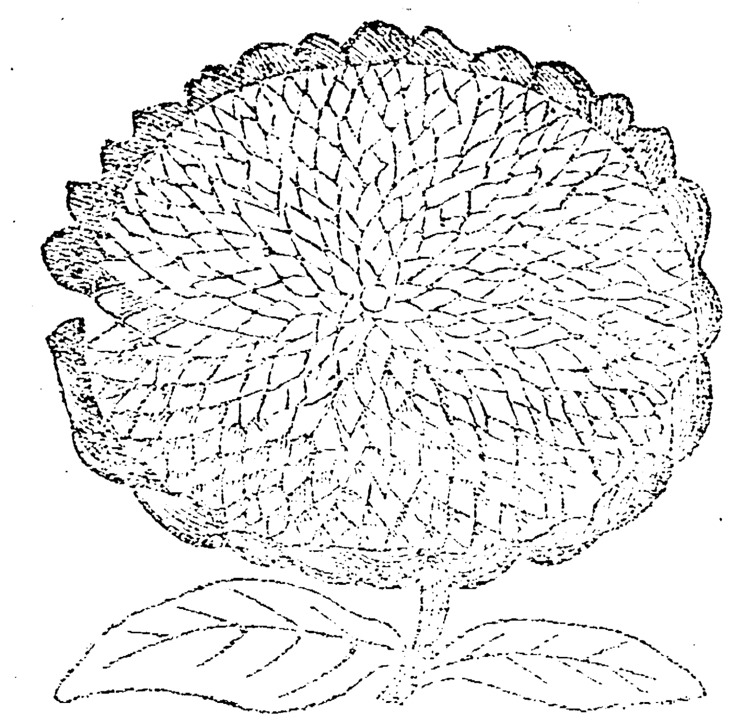

সূর্য্যমুখী ফুল অনেকেই দেখিয়াছেন, যখন গাছে ফুল প্রস্ফুটিত হয় কাহার মন উহাতে আকৃষ্ট না হয়? এই প্রস্তাবের শিরো ভাগে যে মনোহর ফুলটির চিত্র শোভা পাইতেছে, ইহার নাম হিলিয়েনথস কেলিফরনিকস, অর্থাৎ বহুদল বিশিষ্ট সূর্য্যমুখী ফুল, একটি ফুলের সৌন্দর্য্যে বাগান আলোকিত করিয়া থাকে প্রকৃত রূপে বাগান সুসজ্জিত করিতে হইলে এই ফুল রোপণ করা আবশ্যক, এ দেশে বৎসর মধ্যে শীত এবং বর্ষাকালে দুইবার এইফুল ফুটিয়া থাকে, এজন্য দুইবার বীজ বপন করা আবশ্যক। এরূপ ঠাষ দল-বিশিষ্ট এবং বৃহৎ ফুল সচরাচর দেখা যায় না, ইহার জন্য বিশেষ সারের আবশ্যক হয় না, বীজ হইতে চারা বাহির হইলে এবং যখন চারপাতা বিশিষ্ট গাছ হইবে উহাদিকে উঠাইয়া অপর স্থানে বসাইতে হয়। এই গাছ শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, যখন গাছ ২ বা ২॥০ হস্ত লম্বা হয় সেই সময়ে প্রত্যেক পত্র গাঁইট হইতে ফুলের কলি নির্গত হইতে থাকে, এবং ঐ রূপে গাছের মাথা পর্য্যন্ত কলি দেখা যায় ক্রমে ছোট ছোট হইয়া উপরে খুব বড় কলি হইয়া উঠে এবং এক এক করিয়া ফুল প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন যে কি পরিমাণে গাছের শোভা সম্পাদন করে, তাহা

লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সকল জাতির মধ্যে উপরের চিত্রিত ফূলটি অধিক মনোহর এবং অগণ্যদলযুক্ত এই ফুলের একটি বিশেষ গুণ এই যে মেলেরিয়া প্রপীড়িত স্থান গুলির বায়ু একে বারে বিনষ্ট হইয়া যায় তজ্জন্য ইহা সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে থাকা উচিত।

সুর্য্যমুখীর চাযের লাভালাভের বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে কৃষি তত্ত্বের প্রথম খণ্ডের ১৫৭ পৃষ্টায় যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে পাঠ করিলে জানা যাইবে।

সেগুণ গাছ।

ডাক্তার রাক্সবরা লিখিত।

ইংলণ্ড দেশে ওক কাষ্ঠের ন্যায় ভারতবর্ষে সেগুণ কাষ্ঠ নানা বিষয়ে ব্যবহৃত হয়; এদেশে ওক গাছ জন্মিয়া বৃদ্ধিশীল হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং ওক ও সেগুণের গুণের তারতম্য বিবেচনা করা অনাবশ্যক। এদেশে কেবল জাহাজ নির্ম্মাণার্থ সেগুণ কাষ্ঠ উপযোগী হয় এমত নহে, ঘরের কড়ি এবং অন্যান্য যে সকল গঠনে শক্ত টেকসহি অথচ হাল্‌কা কাষ্ঠ আবশ্যক হয় তৎসমুদায়ই সেগুন কাষ্ঠ দ্বারা পরিস্কার ও উত্তম রূপে নির্ম্মিত হইতে পারে অতএব এই কাষ্ঠের বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। যেদেশে এই মূল্যবান বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মেনা সেখানে ইহারচাষ করা আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশে ইহা উত্তম রূপে বৃদ্ধিশীল হইতে পারে এবং অনেক কাজে লাগিতে পারে, অতএব ইহার কৃষি বাহুল্য করা অত্যন্ত আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয় অবগত হইয়া বহু কাল হইল ঐ গাছ এদেশে বাহুল্যরূপে উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত উৎসাহ দিয়াছেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে সকলের প্রবৃত্তি জন্মে একারণ সর্ব্বসাধারণকে বিশেষতঃ জমিদার

দিগকে জানান আবশ্যক যে এই গাছ উৎপন্ন করিলে প্রচুর লাভ সম্ভাবনা আছে।

এই গাছ অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সকল অবস্থাতেই ইহার কাষ্ঠ কর্ম্মণ্য হয়। সেগুণ গাছ যে শীঘ্র বৃদ্ধিশীল হয় তাহার একপ্রমাণ এই সন ১৭৮৭ সালে রাজমান্দ্রি নামক স্থান হইতে কয়েকটা চারা আনাইয়া কোম্পানির বাগানে রোপিত হইয়া ছিল সেই সকল গাছ বৃদ্ধিশীল হইলে ইংরাজী ১৮০৪ সালে পরিমাণ করিয়া দেখা যায় যে ভূমি হইতে সাড়েতিন ফিট করিয়া গুঁড়ি সকল উচ্চ হইয়া ছিল। এবং তাহাদের বেড় ৩। ৪ ফিট করিয়া মোটা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে বৃক্ষের এই উচ্চতার পরিমাণ যে অধিক হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঐ সকল চারা এক বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমের সময় রামজান্ত্রি সরকার হইতে আনীত হয়, তাহাতে ১৭ বৎসর মধ্যে ঐ প্রকার বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠে। অতএব এতাদৃশ স্বল্প কালের মধ্যে যদি ঐ গাছ এবম্প্রকার বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া জাহাজ নির্ম্মাণের উপযোগী হইল তবে ইংলণ্ডের ওক গাছের সহিত ইহার তুলনা করিয়া ইহার বিষয়ে মনোযোগ ও উৎসাহ দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এই গাছের চারা বীজ হইতে কি প্রকারে উৎপন্নহয় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। কারণ আমরা বারম্বার দেখিয়াছি এই গাছের বীজ লইয়া বপন করত কেহবা কৃতকার্য্য হয়েন কাহারও বা যত্ন একেবারে বিফল হয়।

সেগুণের ফল অতিশয় শক্ত; তাহার মধ্যে চারিটা করিয়া গহ্বর আছে, প্রত্যেকে এক একটা বীজ থাকে। সেই বীজ ভূমির মধ্যে বপন করিলে সত্বর উহা অঙ্কুরিত হয়না এমন কি ১৭।১৮ মাসেও অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে সেগুণের বীজ অক্‌টোবর মাসে সুপক্ক হয়; সেই সময় গাছ হইতে তুলিয়া লইয়া তার পর বর্ষার প্রারম্ভে অথবা উত্তর পশ্চিম দিকের বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে রোপণ করিতে হয়। যদিস্যাৎ ঐ সময়ে বীজ বপন করা যায় (ঐ সময়ের পূর্ব্বে রোপণ করিলে আরো ভাল হয়)

তাহা হইলে চৌকার উপরি আচ্ছাদন দিয়া ছায়া করিয়া তন্মধ্যে এক এক ইঞ্চি অন্তর করিয়া পুঁতিবে ও তাহার উপরে এক ইঞ্চের চতুর্থ ভাগ পরিমাণে মৃত্তিকা দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দিবে। পরে পচা খড় অথবা ঘাস সেই মৃত্তিকার উপরে ছড়াইয়া দিবে শুখার সময়ে সর্ব্বদা জল দিতে হয়। জল পাইলে মৃত্তিকা সরস থাকিয়া বীজের উপকার সাধন করিবে। এই রূপ করিয়া বপন করিলে চারি সপ্তাহের পর আট সপ্তাহের মধ্যে ঐ সকল বীজের প্রত্যেক হইতে এক অবধি চারিটা পর্য্যন্ত চারা হইবে। কখন কখন এরূপ ঘটনা হয় যে অনেক বীজ উক্ত নিয়মিত সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত নাহইয়া এক কি দেড় বৎসরে অঙ্কুরিত হয় যদিও এঘটনা সর্ব্বদাহয়না বটে তথাপি এমন ভূমিতে বীজবপন করা কর্ত্তব্য যাহা পরবৎসর বর্ষা পর্য্যন্ত অঙ্কুর হইবার অপেক্ষায় রাখা যাইতে পারে। এবিষয়ে প্রণিধান না করাতে অনেক ব্যক্তি ইহার কোন কোন বীজ অকর্ম্মণ্য বোধ করিয়া সেই ভূমি খনন পূর্ব্বক অন্য শস্য বুনিয়া পরিশ্রম বিফল করেন।

সেগুণের চারা উৎপন্ন হইবার সময় অতি ক্ষুদ্র থাকে। কফি শাকের চারা প্রথমতঃ যে রূপে বাহির হয় প্রায় তদ্রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু অতি অল্প কাল মধ্যে বাড়িয়া উঠে। চারা সকল বাহির হইয়া এক বা দুই ইঞ্চ উচ্চ হইলে তুলিয়া লইয়া অন্যস্থানে ছয় ছয় ইঞ্চ অন্তরে এক একটা করিয়া পুতিয়া দিতে হয়, এই স্থানে আগামী বর্ষা পর্য্যন্ত থাকিবে। এক বৎসর পরে তথা হইতে তুলিয়া লইয়া যেখানে বরাবর থাকিবে সেই স্থানে পুতিয়া দিবে। মধ্যে একবার অন্য স্থানে না পুতিয়া চারা সকল দুই বা তিন ইঞ্চি বড় হইলে যেখানে বৃদ্ধিশীল হইবে একেবারে তথায় রোপণ করিলেও গাছ হইতে পারে। কিন্তু এপ্রকার রোপণ করা বড় ভাল নহে,এতদপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম উত্তম। কেননা এক স্থানে থাকিয়া চারা সকল তিন চারি ইঞ্চ উচ্চ হইলে তাহা দিগকে স্থানান্তরে রোপণ করিতে অনেক ব্যাঘাত হইবার সম্ভবনা আছে, অর্থাৎ মূল শিকড় নষ্ট হইতে পারে। তাহাতে চারার বৃদ্ধি

বিষয়ে হানি এবং কখন কখন গাছ শুদ্ধ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভব।

কলিকাতার চতুর্দ্দিকে এই গাছ অতিশয় বাড়িয়া উঠে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যৎসামান্য যত্ন করাতে কোন কোন বৃক্ষ বিশেষ বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে নিম্ন অথবা জল-প্লাবিত স্থানে ইহার বীজ বপন অথবা চারা রোপণ করিলে ফল দর্শেনা। অপর যে স্থানে চারা পুঁতিবে তথায় বন্যবৃক্ষ বা তৃণাদি না জন্মে এবিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে ও শুখার সময় প্রথম বৎসরে অল্প অল্প জল দিবে। যে সকল ভূমি উত্তম এবং যাহাতে উলু অধিক না জন্মে সেই সমস্ত ভূমিই সেগুন চারা রোপণের উৎকৃষ্ট স্থান। ঐ প্রকার ভূমিতে চারা রোপণ করিয়া ছয় মাস তদারক করিলে তাহার পর আর ঐ সকল চারার প্রতি সাবধানতার আবশ্যক করেনা। অঙ্কুর হওয়া অবধি দুইবার দুই স্থানে রোপণ করাতে যে সময় লাগে সে সময় তাহাদের বয়ঃক্রম ১৮ মাস হয়। ঐ সময়ে চারা সকল ভূমির উর্ব্বরতার তারতম্যানুসারে পাঁচ অবধি দশ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয় সুতরাং কেবল উত্তর পশ্চিম বায়ু ব্যতীত অন্যান্য উৎপাৎ হইতে আপনা হইতেই রক্ষিত হয়।

মৌয়া বৃক্ষ।

সাঁওতাল পরগণা অপেক্ষা বেহার প্রদেশের প্রায় সর্ব্বস্থানেই মৌয়াগাছ যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের উপকারিতা বিষয়ে বেহারের কৃষক ভিন্ন অপরাপর এদেশীয় কৃষকেরা কিছু মাত্র অবগত নহে; তাহাদের অবগতির নিমিত্ত আমি অদ্য এই বৃক্ষের যাবতীয় বিষয় লইয়া উক্ত কৃষক মণ্ডলীতে উপস্থিত হইতেছি। জ্ঞাতব্য বিষয় অবশ্যই তাহারা জ্ঞাত হইতে আপত্তি রাখিবেনা।

মৌয়াবৃক্ষ সচরাচর শুষ্ক এবং বালুকা মিশ্রিত ভূমিতে অতি উত্তম জন্মায়। জলা, নিম্নভূমি ও আটাল মৃত্তিকাতে এ গাছ ভাল হয় না। ইহার বীজ দেখিতে অবিকল নীচু বীজের ন্যায়। ভূমিতে রোপণ করিলে ১০। ১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে নূতন মৌয়া গাছের সৃষ্টি হয়। এ গাছের কোন প্রকার বিশেষ পাইটের প্রয়োজন হয়না, সহজেই ইহার উন্নতি হইয়া থাকে। মৌয়াবৃক্ষ দ্বিবীজ দলীয় উদ্ভিদ; রোপণ কাল হইতে দশ বৎসরের মধ্যে মৌয়া ফলিতে অর্থাৎ বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। মৌয়া আর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; বৃক্ষের ফুল মাত্র।

ফাল্গুণ মাস হইতে মৌয়া বৃক্ষের পুষ্প বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়, চৈত্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফুলশেষ হইয়া যায় এই কালের মধ্যে ঐ ফুল সংগ্রহ করিয়া ক্রমে শুষ্ক করিতে হয়। ফুল উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে ৩। ৪ বৎসর ঘরে রাখিলে অধিক নষ্ট হয়না, ও গুণের কোন তারতম্য হয়না; ইহার স্বাভাবিক গুণ অত্যন্ত গরম। মৌয়াফুলগুলি, ঠিক কিস্‌মিসের তুল্য আকৃতি বিশিষ্ট, স্বাদ কিঞ্চিৎ মিষ্ট। বেহারীয় লোকেরা মৌয়াকে অতি পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া ঘোড়াকে খাওয়াইয়া থাকে, এবং গরীব দুঃখী লোকে ময়দা ও আটার সহিত মিশাইয়া তাহার রুটী প্রস্তুত করিয়া ভোজন করে। মৌয়া দ্বারা একরূপ সুরা প্রস্তুত করিয়া বেহারীয় সৌণ্ডিকগণ, প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। শুনিয়াছি আজ কাল মৌয়া ইয়োরোপে রপ্তানি হইতেছে এবং তদ্দ্বারা অতি উত্তম ব্রাণ্ডি মদ্য প্রস্তুত হইয়া দিক দিগন্তে আমদানি হইতেছে। মৌয়া ফুল নিতান্ত কম দরে বিক্রীত হয় না, মনকরা এক টাকা হইতে ২৷৷০ পর্য্যন্ত সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে। এক একটী প্রবীণ গাছে অন্যূন চারি মণ হইতে ছয় মণেরও অধিক ফুল বিকশিত হইয়া সহজেই পতিত হয়। অতএব এরূপ লাভ জনক বৃক্ষের আদর অপরাপর প্রদেশে কেন না হয়?

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেমন আঁম কাঁঠাল যত্ন করিয়া রোপণ করে, বেহারীয় কৃষকেরা সেই রূপ মৌয়া বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে।

বেহারাঞ্চলের অনেক স্থানে এই বৃক্ষের বাগান দেখিতে পাওয়া যায় মৌয়া বীজ শ্রাবণ মাসে পাকিয়া থাকে। উহা সংগ্রহ করিয়া দ্বিখণ্ড করত শুষ্ক করে। পরে যেরূপে নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয় সেই রূপ ঘানিতে পীড়ন করিয়া ঐ বীজেরতৈল প্রস্তুত করে। তৈল দেখিতে অবিকল ঘৃতের ন্যায়, জমিয়া গেলে ঘৃত কি তৈল সহসা অনুমান করিতে পারা কঠিন হয়। শঠ বণিকেরা উহা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন এই তৈল ঐ দেশীয় গরীব লোকেরা প্রদীপে জ্বালাইয়া আলোকের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। পরন্তু জ্বর জ্বাড়ি প্রভৃতি রোগে ঔষধ রূপে ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করে। মৌয়া বীজের গলন ও নিতান্ত কম নহে, প্রতি ৴৭৷০ সের বীজে দেড় সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত তৈল নির্গত হয়। মৌয়া গাছ সচরাচর ৩০। ৪০ ফিট উচ্চ এবং ছয় হইতে নয় ফিট্ পর্য্যন্ত গোল হয়। ইহার কাষ্ঠ কপাট্ গৃহ জানালা প্রভৃতি নির্ম্মাণোপযোগী কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু ইহা শাল কাষ্ঠের ন্যায় দীর্ঘ কাল স্থায়ী নহে।

শ্রীপ্যারি মোহন গোস্বামী।

মনিখালি।

কৃষি সম্বন্ধে—খনার বচন।

১ ফাগুণে আগুন চৈতে মাটী।

বাঁশকে রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি

ফাল্গুণ মাসে বাঁশের গোড়ায় আগুন দিয়া, চৈত্র মাসে বাঁশে মাটী দিবে। অনন্তর বাঁশের পিতামহকে অর্থাৎ যে বাঁশ তিন সনের হইয়াছে তাহাকে কাটিবে।

২। আষাঢ়ের খোবর।

ভাদ্রের গোবর।

আষাঢ় মাসে খোবরে বীজ পুতিলে যে ধান হয়, ভাদ্র মাসে গোবর দিয়া বীজ পুতিলেও সে ধান হয়না।

৩। আষাঢ়ে দিলে, শ্রাবণে ফলে,
ভাদ্রে রুইলে শীষ্‌টে, শীষ্‌টে।
আশ্বিনে রুইলে কীস্‌টে কীস্‌টে।

আষাঢ় মাসে রোপণ করিলে বেশ খড় ও ধান হয়, শ্রাবণ মাসে রোপণ করিলে বেশ ধান হয়। আর ভাদ্র মাসে রোপণ করিলে একটী একটী মাত্র শীষ হয়। এবং আশ্বিন মাসে রোপণ করিলে কিছুই হয়না।

৪। ঘনর ঘন জাওলি, কাহনে কুড় পাতলার বার বিশ।

অর্থাৎ ঘন ঘন রোপণ করিলে এক বিঘায় এক কাহন ধান হইতে পারে এবং পাতলা করিয়া রোপণ করিলে বার বিশ হয়।

শ্রীকরালীপদ মুখোপাধ্যায়।
ভান্তাড়া

চাঁপা নটে

নটে নানা জাতীয় ; ভিন্ন জাতির আস্বাদন ও নাম পৃথক। শাকের মধ্যে চাঁপা নটে অতি সুস্বাদু ও উপাদেয়। এই শাক বৎসরের সকল সময় উৎপন্ন হয়, কিন্তু শীতের সময় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়, ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে ইহাদের জন্য জমিতে গোবরের সার মিলাইয়া রাখিবে। এক কাঠা জমিতে আন্দাজ দশ ঝুড়ি সার দিয়া কোদালীর দ্বারা জমী কোপাইয়া রাখিবে। কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে উক্তজমি ভাল করিয়া উল্টাইয়া মৃত্তিকা সমান করত বীজ এরূপ ভাবে ছড়াইতে হইবে যাহাতে এক স্থানে বেশী বা কম না হয়, বীজ ভাল হইলে তিন চারি দিবসের অধিক অঙ্কুরিত হইতে লাগেনা। চারা যদ্যপি

সতেজ না হয় প্রত্যহ বৈকালে টিনের বোমা দ্বারায় উক্ত শাকের ভূমিতে জল দিতে হইবে, বোমার পরিবর্ত্তে কলসীর মুখে হাত দিয়া এরূপ কৌশলে জল দিতে হইবে যাহাতে এক এক বারে অন্তত৩।৪ হাত চারি দিকে জল পড়ে, কলসীর জল এক স্থানে পতিত হইলে গর্ত্ত হইয়া যায় এবং তদ্দরুন সেই স্থানের চারা গুলির শিকড় বাহির হইয়া মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এক কাঠা জমিতে এক ভরি বীজ বপণ করা উচিত। ইহার বীজ ভিজাইয়া বুনিতে হয় না। প্রাতঃকালে বীজ বুনা কর্ত্তব্য। যত দিন বীজ অঙ্কুরিত নাহয় তত দিন উহা কলা কি খেজুর কি নারিকেল কি কচু যে কোন পাতা দ্বারা ঢাকিয়া রাখা উচিত। এবং অঙ্কুর বাহির হইলে পাতা তুলিয়া ৩।৪ দিন অন্তর ক্ষেত্রে জল দিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বার মাসেই চাঁপা নটে শাক জন্মিতে পারে। বৈশাখ মাসে বীজ বুনিলে তিন দিনের মধ্যে উহা অঙ্কুরিত হয় কিন্তু শীতকালে অর্থাৎ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বপণ করিলে অঙ্কুর বাহির হইতে অন্যূন ১৪।১৫ দিন লাগে। অনেকে চাঁপা নটে শাক জমিতে ছড়াইয়া বুনিয়া থাকে কিন্তু ইহা অপেক্ষা ক্ষেত্রে পটি বাঁধিয়া বপন করা ভাল এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পটী বাঁধা উচিত। প্রত্যেক পটি তিন হাত আকারে বিস্তার হওয়া আবশ্যক। এবং উক্ত পটির উভয় পার্শ্বে আধ হাত জমি খালি রাখিতে হইবে। বর্ষাকালে পটির উপর বীজ বুনিতে হয়। শীতকালে পটির উভয় পার্শ্বের খালি জমী অপেক্ষা পটি কিছু নীচ করিতেহয়। এরূপ করার তাৎপর্য্য এই বর্ষা-কালে বৃষ্টির জল পটির উভয় পার্শ্বস্থ জোল দিয়া নির্গত হয়, শাক পচা-ইতে পারে না। এবং শীত কালে পটি কিঞ্চিৎ জোল হইলে জল সেচনের সুবিধা হইয়া থাকে। পটির পাশে খালি জমী থাকাতে তাহার উপর বসিয়া ঘাস নিড়াইতে, শাক কাটিতেও সুবিধা হয়। শাক আট অঙ্গুলি বড হইলে দুই অঙ্গুলি গোড়ায় রাখিয়া তাহা কাটা উচিত। যত কাটা হইবে ততই বাড়িতে থাকিবে এবং অধিক ডাল পালা বৃদ্ধি

হইবে, এই রূপ কয়েক বার কাটিয়া বীজ জন্মাইবার জন্য কাটা বন্ধ করিবে এবং বীজ পরিপক্ব হইলে আর জল সেক করিবেকনা বহু কাটার পর গাছে বীজ রাখিলে উহা ভাল পুষ্ট হয়না। কারণ গাছের বয়স অধিক এবং অনেক বার কাটার পর গাছের তেজ হ্রাস হইয়া সরু সরু ডাল পালা বাহির হয়, সুতরাং তেজস্কর হয়না এজন্য দুইবার কাটার পর বীজ রাখা কর্ত্তব্য। এই শাক মাঘ ও ফাল্গুনে রোপণ করিলে অধিক বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায় তদধিক বীজ শীতের দিন জন্মে না শাকের ভূমিতে অপর অপর গাছ যাহা বাহির হইবে তাহাদের সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে সরু নিড়ানির দ্বারায় মৃত্তিকা খুসিয়া দিবে, যে দিন খুসিবে সেই দিন জল দেওয়া নিষেধ। কৃষক দিগের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে "এক দিনে খুসিয়া দেওয়া সাত দিনের জল দেওয়া সমান"। যে দিন শাক কাটা হইবে সে দিন ক্ষেত্রে জল দিতে হইবে। বর্ষাকালে জল না দিলে কোন অনিষ্ট হয় না।

নটকণ।

সৌভাগ্য ক্রমে বঙ্গদেশের শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গ স্বাধীন বৃত্তিকে বিশেষতঃ কৃষি কার্য্যকে আর অনাদর করেননা; কৃষি কার্য্য দ্বারা দেশের ধনাগমের পথ যে সুপ্রশস্ত হয়, অর্থ ব্যবহারের এই মহান বাক্যের সারত্ব তাঁহারা এত দিনে বুঝিতে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সংবাদ পত্রে প্রায়ই পাঠ করা যায়, কেহ কেহ কৃষি বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা পাক্ষিক পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রচার করিতেছেন, কেহবা আপন পুত্র পৌত্রকে কৃষি বিদ্যা শিক্ষার্থ বিলাত ও ফ্রান্সে পাঠাইতেছেন, কেহবা নশ্বরী অথবা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী খুলিবার প্রস্তাব করিতেছেন, কেহ বা কৃষি বিদ্যালয়ের

অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করিতেছেন, কেহ বা এ সকলে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজে লাঙ্গল ধারণ পূর্ব্বক ভূমি কর্ষণে প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে লাঙ্গল ধরিলে সমাজচ্যুত হইতে হইবে এই কুসং-স্কারপূর্ণ অসার বাক্যের প্রভাব যতদিন না উঠিবে, যত দিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাবুরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজে কার্য্য করিতে সক্ষম না হইবেন যতদিন পর্য্যন্ত কেবল বক্তৃতা এবং প্রবন্ধের কথা ছাড়িয়া এদেশীয় শিক্ষিত লোকেরা সাহসের সহিত হাতে হাতে কাজ করিতে নাপারিবেন তত দিন পর্য্যন্ত প্রকৃত উন্নতির আশা কোথায়? বক্তৃতা দিতে অনেকে পারে, দুই কলম লেখাও আজ কাল বড় কথা নহে, কিন্তু রামা কৈবর্ত্তের মত কাজের লোক কয় জন আছেন? আমি যে এত ভূমিকা করিয়া কলম, ধরিয়াছি, এত বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ আস্ফালনের সহিত কৃষি-তত্ত্বে প্রবন্ধ পাঠাইতেছি, আমিই বা কি ধাতুর লোক! স্পষ্ট বলিতে কি, ভূমির সহিত আমার চির বিচ্ছেদ; কি রূপে ভূমি কর্ষণ করিতে হয় জানিনা, কৃষি কার্য্য করিতে কখনও প্রবৃত্ত হই নাই এবং লাঙ্গল ধরার ভয়টী আমার বেশ আছে। আমি ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় বলিতে পারি, আমার ন্যায় কেবল বাহ্যিক কথা-ভরা লোকের দ্বারা কৃষিকার্য্যের কখন উন্নতি হইতে পারেনা এবং হয়ও নাই; আমি রামের নিকট কথা শুনিয়া তাহা শ্যামকে বলিতে পারি, কিন্তু নিজে কার্য্য করিতে পারিনা। যাঁহারা কৃষি কার্য্যের দ্বারা এদেশের উন্নতি সাধন করিতে তৎপর তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার স্বভাবটি পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহারা কেবল বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে চেষ্টা না পান।

দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের লোকেরা কেবল ধান চাষ করাকেই কৃষি কার্য্য বলিয়া থাকে। ধান চাষ ব্যতীত কৃষি কর্ম্মের আর কত প্রকার যে অর্থ হইতে পারে, তাহা অনেকে জানেন না। ধান চাষ ব্যতীত আর কত সহস্র প্রকারে যে কৃষিকার্য্য হইতে পারে, কত বিবিধ প্রকার উপায়ে লাভবান হওয়া যাইতে পারে, অদ্য

তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি কৃষিতত্ত্বের পাঠক দিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। বিষয়টি সামান্য; শুনিলেই অনেকে হাসিবেন; কিন্তু এই সামান্য উপায়েমনুষ্য কত বড় ধনী হইতে পারে ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বিলাতের পার্লামেন্ট মহাসভার মহামাননীয় সভ্যদিগের মধ্যে অনেকে জুতা, পশুলোম, ফলফুলের বীজ প্রভৃতির ব্যবসা করেন। মহারাজ দলিপ সিংহ ভেড়া বিক্রয়করেন, টেনিসন দুহিতা হংস বিক্রয় করেন, ইস্তাম্বুলের বাদসাহ টুপী এবং তাম্বু বিক্রয় করেন,এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অন্যতম প্রধান সহচর টেরেনিয়ো সাহেবের শ্যালক মহাশয়ের ময়ুর পুচ্ছ বিক্রয়ের পণ্যালয় আছে। আমাদের বাবুদের কাছে এ সকল উপকথা মাত্র!। হায়!! যে দেশের লোকেরা রাজনীতিকে বৃক্ষের ফল, সমাজনীতিকে কুক্কুট মাংস এবং ধর্ম্মনীতিকে সার্ভেণ্টিশের সাঙ্গোপাঙ্গা বলিয়া জানেন, যাঁহারা পরপদ পাদুকা লেহন ও পরমুখপেক্ষীতাকে স্বাধীন বৃত্তিবলিয়া আখ্যাত করেন, তাঁহাদের কাছে আমারন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা লট্‌কণের বৃত্তান্ত অর্পণ করা লোষ্ট্র খাইবারপথ প্রশস্ত করা মাত্র!

লটকণ সাধারণতঃ চারি প্রকার—দেশী, পপ্পটি, চীনে এবং শিমুলে, চীনে দুই প্রকার—গুল গুলা ও কাজললতা; এই দুই প্রকার লট্‌কণের প্রচলন অত্যন্ত অধিক। চীনে লটকনের বীজ টাকায় পাকি ওজনে (৮০ সিক্কায়) ৪ সের করিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। কখন কখন দুইসের আড়াই সের করিয়া বিক্রয় হয়। দেশী বীজের মূল্য টাকায় ৮ সেরের অধিক নহে। চীনের বীজ এখন কলিকাতায় ১৬ টাকায় মণ বিক্রয় হইতেছে। পাঠক! এখনও দেখুন, এই সামান্য ব্যবসায়ে কত লাভ! এক বিঘা জমিতে লটকণ দিলে প্রায় দুই শতাধিক বৃক্ষ জন্মে, প্রত্যেক বৃক্ষে ১০ সের করিয়া বীজ জন্মিতে পারে; নিতান্ত ব্যাঘাত হইলে ৮ সেরের কম কোথাও জন্মিতে দেখা যায় না। আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণে পোয়া বসাইতে হয়, ভাদ্রে ফুল ধরে, আশ্বিনে বীজ ধরে এবং পৌষে ফল পাকে।

মাঘ ফাল্গুণে ইহার ব্যবসা চলে। মেদনীপুর জিলায় ইহার ব্যবসা অত্যন্ত অধিক; দাসপুর, পাটুনা, কেশপুর, নাড়াজোল ঘাটাল পার্ব্বতীচক প্রভৃতি স্থলে লটকণের ব্যবসা করিয়া বহু লোক ধনবান হইয়া গিয়াছেন, এই সকল স্থলে ইহার কারবার অত্যন্ত অধিক। হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার সমীপ বর্ত্তী বালী দেওয়ান গঞ্জ গ্রামে বহুদুর ব্যাপিয়া বহুটাকায় লটকনের কারবার চলিতেছে। একজন প্রসিদ্ধ লট্‌কন ব্যবসায়ী ধনীর খাতা হইতে এই হিসাবটী উদ্ধৃত হইল—

ব্যয়।		আয়।	
একুকিতা			
৫০ বিঘা জমির বার্ষিক গড় ৩ টাকার হিসাবে খাজনা		৫০ বিঘা ভুমিতে প্রত্যেক বিঘার গড়ে ২২॥০ মণ বীজের হিসাবে ১১২৫ মণের মূল্য গড়ে ৮ টাকার হিসাবে।	
কোম্পানী ...	১৫০৲		
পোয়ার বীজ খরিদ ...	১৲		৯০০০৲
মালির বেতন ৫ টাকার হিসাবে এক বৎসরে ...	৬০৲		
আগোলদারের বেতন ৬ টাকার হিসাবে ...	৭২৲	আয় ...	৯০০০৲
জল সেচন ইত্যাদি ...	৭৲	ব্যয় ...	৩২৫৲
মজুর খরচ ...	১০৲		
অস্ত্র শস্ত্র ...	২৫৲	মোনফা ...	৮,৬৭৫৲ টাকা
	৩২৫৲ টাকা		

আমি যে গ্রামে বসিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, তথায় আমার সম্মুখে টাকায় ১।০ সের করিয়া চীনে লটকণের বীজ বিক্রয় হইয়া গেল। আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। ৫০ বিঘা ভুমিতে ৯,৬৭৫ টাকা লাভ! ভাবুন দেখি, ব্যাপার টা কি।

ধান্য, গোধুম, সর্ষপ ইত্যাদি বপন করিতে হইলে ভূমিকে যেরূপ কর্ষণ করিয়া, তাহার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে কষ্ট ও যত্ন স্বীকার করিতে হয়, লটকণ বৃক্ষ রোপণে তাহার কিছুই করিতে হয় না। আন্দাজ ১০ কাঠা পরিমাণ এক কিতা সরস ভূমিতে লটকণ বীজ ধান্যের ন্যায় চারাইয়া ফেলিতে হয়, ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পোয়া রূপে পরিণত হইলে তাহা তুলিয়া লটকণ ক্ষেত্রে বার্ত্তকী চারার ন্যায় প্রোথিত করিতে হয়, ঐ চারা (পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি) বৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়া আশ্বিনে ফুল ধরে এবং পৌষে বীজ পরিপক্ক হয়। কিন্তু একটী কথা এই, প্রথম তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ১২৯০ সালে পোয়া বসাইলে ১২৯৩ সালে ঐ পোয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে এবং তাহাতে কার্য্য চলিবে। তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে, ৪র্থ বৎসর হইতে প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ বৃক্ষ জীবিত থাকে। ৪র্থ বৎসর হইতে ফল ঝাড়া হইয়া গেলে, বৎসর বৎসর শাখা কাটিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে গাছ আরও সতেজ ও ফলশালী হইয়া উঠে। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৯০ সালের লটকন ব্যবসায়ের আয় ব্যয়ের একটী মোটামুটি সংক্ষিপ্ত হিসাব এই স্থানে সন্নিবিষ্ট করা গেল।

আয়।

৫০ বিঘা জমিতে পূর্ব্ব হিসাব মত	
৪র্থ বৎসরে …	৯০০০্
বাকি তিন বৎসরে …	২৭০০০্
কাষ্ঠ বিক্রয় …	৬৭্
মোট	৩৬,০৬৭্
ব্যয় …	১৩,৬৪॥৶
মোনফা	৩৪,৭০২।৶০

ব্যয়।

পোয়ার বীজ খরিদ …	১॥৶০
তিন বৎসরে মালিও আগোলদারের বেতন …	৩৯৬্
৫০ বিঘা জমির খাজনা	৪৫০্
জলসেচন …	২১্
মজুর খরচ …	১৬্
অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি …	৩০্
৪র্থ বৎসর হইতে ৭ম বৎসর পর্য্যন্ত খাজনা …	৪৫০্
মোট	১৩৬৪॥৶০

লটকন গাছ বানরে খায় না, গরুর আহারীয় নহে এবং পোকা ধরিতে প্রায়ই দেখা যায়না। গাছের জন্য বিশেষ যত্ন স্বীকার করিতে হয় না, গাছ আপনা হইতে বর্দ্ধিত ও ফলশালী হইয়া ইহার আশ্রয় দাতাকে স্বল্প কাল মধ্যে ধনশালী করিয়া তুলে। লটকন বীজে উৎকৃষ্ট রং প্রস্তুত হয়। বিদেশে অধিক পরিমাণে ইহার রপ্তানী হইয়া থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্ত।

সার ও কর্ষণ।

গবাদি সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত ভূমিতে উপযুক্ত সার দেওয়া, এবং গো সকলের দুর্ব্বলতা হেতু গভীর কর্ষণও হয় না। গো-সংখ্যাবৃদ্ধি ও গো-জাতির উন্নতি করা বিশেষ আবশ্যক। এক্ষণে ভূমিতে সার প্রয়োগ এবং কর্ষণের দ্বারা মৃত্তিকার যে সকল প্রাকৃতিক গুণোৎপাদন হয়, তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

মৃত্তিকাকে প্রথমতঃ উহার রাসায়নিক উপাদানানুসারে এবং দ্বিতীয়তঃ উহার প্রাকৃতিক পদার্থের ধর্ম্মানুসারে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে হইবে। শস্যোৎপাদন করিতে মৃত্তিকায় রাসায়নিক উপাদান এবং প্রাকৃতিক ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক তাহা উহার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারেনা বলিয়া, অকর্ষিত ভূমিতে বৃক্ষ ব্যতীত প্রায় কোন শস্যই উৎপন্ন হইতে পারেনা। অধিকাংশ স্থলে উদ্ভিদের উৎপত্তি জন্য যে কয়েকটী মৌলিক পদার্থের আবশ্যক, তাহা প্রায় স্বাভাবিক মৃত্তিকাতে থাকেনা; যদি

থাকে তাহা অতি অল্প পরিমাণে ও উহা মিশ্রিত অবস্থায় থাকা বিধায় তাহা উদ্ভিদের আহার্য্য হইতে পারেনা, বরং উদ্ভিদ বৃদ্ধির পক্ষে প্রতিকূলই হয়। আবার কখন কখন উহা মৃত্তিকায় এরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকে যে, ঐ সকল দ্রব্য উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। অতএব মৃত্তিকার ঐ সকল অভাব দূর করাই কৃষি কার্য্যের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেবল যথারীতি কর্ষণ আর সার প্রয়োগ দ্বারা মৃত্তিকার ঐ সকল অভাব দূর হইয়া থাকে।

এই সার ও কর্ষণের মধ্যে কোনটী প্রধানতঃ আবশ্যক ও অবলম্বনীয় তাহা প্রথমতঃ মৃত্তিকার অবস্থার উপর নির্ভর করে; তৎপরে শস্যের প্রকার ভেদের উপর। আর ঐ শস্যোৎপন্ন করিতে যাহা ব্যয় হয় তাহাও কৃষকের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদের পুষ্টি সাধক খাদ্যের জন্য মৃত্তিকাতে যে সকল মৌলিক দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা সচরাচর সার প্রয়োগ দ্বারা দূর করা যাইতে পারে। আর কর্ষণের দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংযোজিত হওয়ায় মৃত্তিকায় যে সকল খাদ্য থাকে, তাহা উদ্ভিদের ভক্ষণীয় করিয়া দেওয়া হয় এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ সকলেরও অনিষ্ট কারিতা বিদূরিত হয়। আর এতদ্দ্বারা যেমন মৃত্তিকার অনিষ্টকর গুণ সকল দূর হয়, তেমনি আগাছাদি জঙ্গল সকল ও উন্মূলিত হয়। কিন্তু মৃত্তিকার প্রাকৃতিক গুণ সকলের বৃদ্ধির জন্য এবং জড় রাসায়নিক পদার্থ সকলকে দ্রব করিবার জন্য সার প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক। গভীর কর্ষণে যে সুফল ফলিয়া থাকে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবেক না; কিন্তু সার প্রয়োগের আতিশয্য হইলে, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি আবার নষ্ট হইয়া যায়। অধিক কি কাল ক্রমে মৃত্তিকার আর শস্যোৎপাদনের ক্ষমতাই প্রায় থাকেনা। ইহার বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে হয়ত ভূমি স্বভাবতঃ এত উর্ব্বরা যে সার প্রয়োগ ব্যতীত উহা হইতে সর্ব্বোপযুক্ত পরিমাণে ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কর্ষণ ব্যতীত কোন মতেই সন্তোষ জনক ফল লাভ করা যায় না। রাসায়নিক

উপদানানুসারে কোন কোন মৃত্তিকাকে অতিশয় উর্ব্বরা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে; কিন্তু কর্ষণের দ্বারা উক্ত মৃত্তিকার প্রাকৃতিক গুণ সকলের উন্নতি না হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন শস্যই উৎপন্ন হয় না।

উর্ব্বরতার নানা প্রকার অবস্থা আছে। মৃত্তিকাতে উদ্ভিদের খাদ্য থাকা আবশ্যক; কিন্তু উহার প্রাকৃতিক গুণ থাকা অধিকতর আবশ্যক। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ রসায়ণ শাস্ত্রানুসারে কোন কোন মৃত্তিকার মিশ্রিত বস্তু সকলকে নানাংশে পৃথক করিয়া উহাতে উদ্ভিদের প্রচুর পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য দেখিয়া উহাকে অতিশয় উর্ব্বরা বিবেচনা করিলেও কখন কখন তাহার ফল বিফল হইতে দেখা গিয়াছে। মৃত্তিকা হইতে সর্ব্বোচ্চ ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত মৃত্তিকাকে উত্তম রূপে ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হইবে।

দেশে কৃষি বিদ্যার যত অধিক উন্নতি হয় গভীর কর্ষণের তত অধিক আবশ্যকতা বিবেচিত হইয়া থাকে। এমন কি জঙ্গল রক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারাতে ইউরোপের ও আমেরিকার কোন কোন দেশের লোকে জঙ্গলের ভূমিসকলও যথেষ্ট কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মৃত্তিকার প্রাকৃতিক গুণ সকলের উন্নতি কেবল কর্ষণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে; কারন তদ্দ্বারা মৃত্তিকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বায়ু সঞ্চালিত হইলে রাসায়ণিক ক্রিয়া সকলের সম্পূর্ণরূপে কার্য্য হয়। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে মৃত্তিকাকে কেবল অতি সূক্ষ্ম পদার্থ সকলের সমষ্টি বলিয়া বোধ হয়। ঐসকল সূক্ষ্ম পদার্থ প্রস্তর কণা মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। উহারা মৃত্তিকার অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। ঐ সকল প্রস্তর কণা বালুকা কণার সহিত নানা রূপে মিশ্রিত আছে, ঐ বালুকা রাশি প্রস্তর কণার সহিত একত্রিত হইয়া মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে। মৃত্তিকার উপরিভাগস্থ স্তরের সার ভাগ দেখিয়া আমরা উহার উপরকার স্তরও নিম্ন স্তরের প্রভেদ দেখিতে পারি। ধূলি রাশি

এবং অতি সূক্ষ্মরূপে বিস্তারিতসার ভাগই মৃত্তিকার প্রাকৃতিক পদার্থের ধর্ম্মের অস্তিত্বের সন্ধান করিয়া দেয়।

অল্প বা অধিক পরিমাণে গোলাকার মৃত্তিকা কণা সকল একত্রে থাকিলে তাহারা একত্রীভূত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে ফাঁক বা ছিদ্র থাকে, মৃত্তিকার ঐ সকল ছিদ্র অতিশয় আবশ্যকীয় ; কারণ বায়ু সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক না হইলে, মৃত্তিকার ঐ ছিদ্র সকল বায়ু পূর্ণ হয় এবং উহার সূক্ষ্ম ছিদ্রময়ত্ব নির্ণয় করিয়া দেয়।

এদেশের কৃষকেরা যে কৃষি বিজ্ঞানকে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে ভূতত্ত্ববিদ্গণ সেই কৃষি বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সার ও কর্ষণের দ্বারা মৃত্তিকার যে সকল প্রাকৃতিক গুণোৎপাদন সপ্রমাণ করিয়াছেন এস্থলে তাহারই স্থূল মর্ম্ম প্রদর্শন করা যাইতেছে। পূর্ব্বে মৃত্তিকার মধ্যে যে ছিদ্র থাকার কথা বলা হইয়াছে, তাহার উপকারিতা সকলে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন। মৃত্তিকা যত অধিক পরিমাণে ধূলিবৎ চূর্ণীকৃত এবং সছিদ্র করা হয়, উহা ততোধিক বাষ্প শোষণ করিতে সমর্থ হয়, এজন্য গভীর রূপে কর্ষিত ধূলিবৎ মৃত্তিকা, সামান্য রূপ কর্ষিত মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক বাষ্প শোষণ করিতে পারে এবং বেলে মাটী অপেক্ষা এটেল মাটী অধিক বাষ্প শোষণ করে। মৃত্তিকার অত্যধিক উষ্ণতা বা অনুষ্ণতা যত অধিক পরিমাণে হ্রাস হয়, তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় মৃত্তিকা হইতে যে অতি সুফল ফলিয়া থাকে তাহা ইউরোপের প্রত্যেক কৃষক উত্তম রূপ অবগত আছেন। বায়ু শোষণ সম্বন্ধে ইহা এখানে বলা আবশ্যক যে অম্লজান (Oxygen) এবং যবক্ষার জান (Nitrogen) এতদুভয় বাষ্প নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মৃত্তিকা দ্বারা শোষিত হইয়া থাকে।

যদিও মৃত্তিকার অম্লজান আকর্ষণ করিবার স্বাভাবিক শক্তি অধিক নহে ; কিন্তু এই বাষ্প অপরাপর পদার্থের সহিত শীঘ্র মিশ্রিত হয় বলিয়া ইহা মৃত্তিকার দ্বারা অধিক পরিমাণে শোষিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা কণা সকল ভূমির উপরিভাগে অম্ল জানকে গাঢ় করে।

কিন্তু এই বাষ্প সঙ্কর পদার্থ সকলের সহিত প্রবিষ্ট হওয়াতে এক প্রকার রাসায়ণিক কার্য্য হয়, যাহাতে বিশুদ্ধ অম্লজান স্থানান্তরিত হয় তাহাতে মৃত্তিকা কণা সকল ক্রমাগত অম্লজান শোষণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যতক্ষণ ঐ রাসায়ণিক কার্য্যে উক্ত বাষ্প স্থানান্তরিত না হয়, ততক্ষণ এই শোষণের কার্য্য অতি সামান্যরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মৃত্তিকাতে লৌহের ভাগ কিছু অধিক পরিমাণে থাকে, অথবা পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ (Humus) থাকে, তাহাদের অম্লজান শোষণ করিবার শক্তি অধিক।

মৃত্তিকাতে যত অধিক অম্লজান সঞ্চালিত হয়, উহাতে উদ্ভিদ ততোধিক পরিমাণে বৃদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করে। সুতরাং সেই পরিমাণে ফলোৎপন্নও হইয়া থাকে। উদ্ভিদের মূলের দ্বারাই উহার নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে বায়ু সঞ্চালিত হইলে, উহাতে কত অধিক ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা জর্ম্মণ দেশীয় জগদ্বিখ্যাত রাসায়ণিক কৃষিবেত্তা ষ্টকহারট (Stockhardt) সাহেব বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সে ফল প্রায় দ্বিগুণ হইয়া থাকে।

আর মৃত্তিকায় যত অধিক বায়ু সঞ্চালিত হয়, উহাতে উদ্ভিদের মূল ও ততোধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেহুমেকার (Schuhmacher) নামক জনৈক জার্ম্মণ রাসায়ণিক কৃষিবিদ্ পণ্ডিত দুইটী পাত্রে যব বপন করেন। তন্মধ্যে যে পাত্রে বায়ু সঞ্চালনের উপায় ছিল না, তাহাতে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা যে পাত্রে উক্ত প্রকারে বায়ু সঞ্চালিত হইবারউপায় ছিল তাহাতে তিনগুণ অধিক ফলোৎপন্ন হইয়াছিল। অথচ দুইটী পাত্রেই এক প্রকার মৃত্তিকা ছিল এবং এক প্রকার অবস্থায় ছিল।

উদ্ভিদ সকলের প্রকার ভেদের উপর উহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয় অম্লজানের পরিমাণ নির্ভর করে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণী উদ্ভিদের যে অধিক অম্লজান আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে যে সকল মৌলিক পদার্থের অতিশয় আবশ্যক, তাহাদের অল্পতা হইলে উদ্ভিদের আর বৃদ্ধি হইতে পারেনা। রাসায়ণিক ক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া, উহাদের বৃদ্ধির জন্য যে সকল আহার্য্য আবশ্যক, তাহা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া যে মৃত্তিকাতে অধিক পরিমাণে লৌহের ভাগ থাকে, তাহা সর্ব্বদা গভীররূপে কর্ষণ করিতে হইবে। যে দেশের জল বায়ুর উষ্ণতানুসারে সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তথায় এরূপ মৃত্তিকা হইতে গভীর কর্ষণের সন্তোষ জনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে বালুকা এবং চূণযুক্ত মৃত্তিকা অতিশয় অল্প পরিমাণে অম্লজান শোষণ করিতে পারে। আর পিঙ্গল বা কৃষ্ণ বর্ণ গলিত উদ্ভিদ পদার্থ যুক্ত মৃত্তিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে, উক্ত বাষ্প শোষণ করিয়া থাকে ইহা হারমান (Herman) নামক জনৈক রাসায়ণিক কৃষিবিদ্ পণ্ডিত বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন।

মৃত্তিকার দ্বারা অম্লজান শোষিত হইলে কি প্রকার কার্য্য হয়, তাহা এক্ষণে দেখা আবশ্যক। মৃত্তিকাস্থিত খনিজ পদার্থ কণা সকলকে পৃথক করা এবং উদ্ভিদ প্রাণীও সারকে মূলের নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য উপযোগী করাই উক্ত অম্লজান শোষণের প্রধান কার্য্য। যাহার প্রচুর পরিমাণে অম্লজান শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে, এরূপ মৃত্তিকা এবং উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী সার প্রয়োগ আর সর্ব্বদা গভীর কর্ষণ এই ত্রিবিধ উপায়ে মৃত্তিকার এই বাষ্প শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সার প্রয়োগ এবং কর্ষণের দ্বারা মৃত্তিকার যে সকল অন্যান্য প্রাকৃতিক ধর্ম্মোৎপাদন হয়, তাহা পরে দেখান যাইবে।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস।
রায়না।

জল্‌দি উৎপন্ন হইবার কঠিন বাঁধা কপি।

(Early york Cabbage)

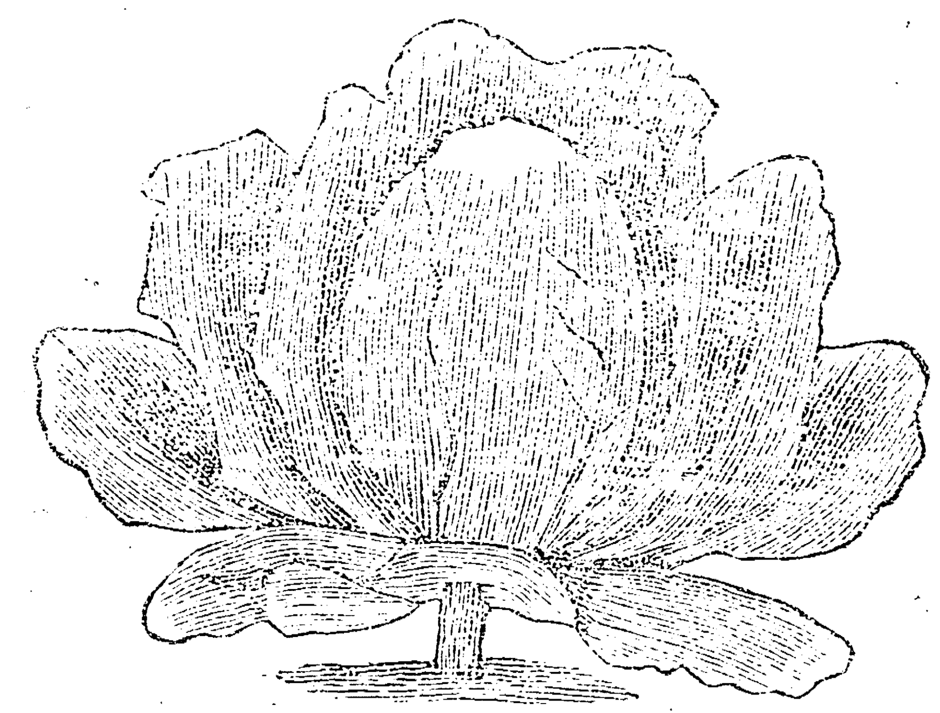

অন্নাহারী বাঙ্গালী গণের পক্ষে শাকসবজি আদি তরকারি যেমন বিশেষ' প্রয়োজনীয়, ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন করার পক্ষে তাঁহা-দের সেরূপ আগ্রহ দেখা যায় না, বরং শিথিলতা দেখিয়া আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হই। শাক সবজির আবাদ করিলে মন যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে, সহস্র সহস্র মুদ্রা বেতনের চাকুরি করিলে তাহার বিন্দু বিসর্গ ও পাওয়া যায়না। চাকুরি করা কেমন সুখ, যাঁহারা চাকুরী করেন তাঁহারাই জানেন। কি আমেরিকা কি বিলাত, কি অন্য যে কোন ইউরোপীয় স্বাধীন রাজ্য দেখা যাউকনা কেন কোন দেশের লোকে এরূপ চাকুরি চাকুরি করিয়া উদ্বিগ্ন হয়েন না; তাঁহা-দের মধ্যে কেহ বাণিজ্য, কেহ শিল্প, কেহ বা কৃষি ইত্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করতঃ অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুখ সম্ভোগ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এইযে বাঙ্গালীগণ কেবল চাকুরী প্রিয় হইয়া সোনার দেশটী উৎসন্ন করি-লেন। পরের ভাবনা ভেবে ক্ষীণ জীবি হইলেন, মণিবের মন রক্ষা করিতে গিয়া তোষামোদ প্রিয় হইলেন; হায়! আর কতদোষের কথা উল্লেখ করিব; যাঁহারা চাকুরীর আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন তাঁহাদিগকে কেবল ঐসকল কথা বলা হইল। যাঁহারা চাকুরীর

আপনার বৃথা কালক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহারা একবার আমার এই কৃষি পথ অবলম্বন করুন, এখানে অতুল ঐশ্বর্য্য অতুল সুখসম্ভোগ ও অতুল সম্মান আছে। আমাদের এই সবিনয় বাক্যে কেহ কর্ণ পাত করিলে আমরা যারপর নাই সুখী হইব।

এই প্রস্তাবের শির্ষ ভাগে যে প্রতি মূর্ত্তি ও তাহার নাম প্রদর্শন করা গেল, উহা এক প্রকার বাঁধা কপি, এই জাতীয় কপি কিছু ছোট হয়, সাধারণে ইহাকে নারকুলে কপি বলে, ইহা খাইতে বড়ই সুস্বাদু যত প্রকার বাঁধা কপি দেখা যায় তন্মধ্যে এই জাতীয় কপি সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হয়, এইজন্য ইহাকে জলদি কপি বলা হয় ইহার আকারাদি ঠিক চিত্রের অনুরূপ। সকলের অগ্রে এই কপির বীজ বপন করা কর্ত্তব্য, অল্প দিনের মধ্যে ইহা খাইবার উপযুক্ত হয়, এনিমিত্ত সকল কারই ইহার আবাদ করা উচিত। আমেরিকা ও বিলাতে এই কপি বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ইহার বপন ও রোপণের প্রণালী কৃষিতত্ত্বের অনেক স্থানে লেখা হইয়াছে সুতরাং বারবার ঐ সকল বিষয় লিখিয়া বৃথা পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি করা মাত্র, কেবল এই জাতীয় কপির প্রতিকৃতি সাধারণকে দেখাইবার নিমিত্ত ইহার উল্লেখ করা গেল।

ডালিয়া।

ইহা এক প্রকার মনোহর পুষ্প। ডালিয়া নানা বর্ণের। তন্মধ্যে সাদা, লাল, গোলাপি, জরদ এই চারি প্রকার এতদ্দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দল সমূহ ঘন সন্নিবেশিত, এই সকল পুষ্প দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু আদৌ গন্ধ নাই। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা শীত কালেই ইহার প্রচুর পুষ্প হইতে দেখা যায়। এবং

বর্ষাকালে গাছের তেজ অত্যন্ত হ্রাস হইয়া থাকে। পুষ্পের অত্যন্ত শোভা এজন্য উদ্যান মাত্রেই এই গাছ রাখা কর্ত্তব্য। লাল ডালিয়ার সাইমন সেনা জিন্ গোলাপের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

ডালিয়া গাছ তত অধিক বৃহৎ আকারের হয় না গাছ গুলি নাতি বৃহৎ নাতি ক্ষুদ্র। এই গাছ মাটিতে রোপণ করিলেই ভাল হয়। টবে রাখিলে কোনও ক্ষতি হয় না কিন্তু অন্যান্য ফুলের টব অপেক্ষা ইহার টব বড় বড় করা উচিত। টব বড় করিয়া রোপণ করিলে গাছের শিকড় সকল ইতঃস্তত সঞ্চারণ করিতে পারে ছোট টব হইলে গাছের শিকড় সকল আবশ্যকীয় স্থানের অভাব বশতঃ স্বাধীন ভাবে সঞ্চারিত হইতে পারেনা। সুতরাং শিকড় সমূহ পরস্পর জড়িত হইয়া গাছের তেজহ্রাস করিয়া ফেলে। প্রতি বৎসর টবের মৃত্তিকা ঝাড়িয়া দিতে হয়, মৃত্তিকা ঝাড়িতে হইলে তাহার পূর্ব্বদিবস টবে জল দিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকা নরম হইয়া থাকে এবং মৃত্তিকা উত্তোলন করিতে সহজ হইয়া আইসে।

পর দিবস টব উল্টাইয়া ঘা দিলেই তাহা হইতে গাছ পৃথক হইয়া আইসে। টবের গাছে প্রত্যেক দিবস দুইবার করিয়া জল দিতে হয়; এবং মধ্যে মধ্যে গোড়া খুড়িয়া সার মাটী মিশ্রিত করিয়া দিলে গাছের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।*

ডালিয়া কলম দুই প্রকার প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে পারা যায় প্রথমতঃ কটীং (অর্থাৎ ডাল কাটিয়া কলম প্রস্তুত করণ) দ্বিতীয়তঃ মূলদ্বারা

---

* ভূমির গাছ অপেক্ষা টবের গাছে সর্ব্বদা জল দিতে হয়। কারণ ভূমিরগাছে জল দিতেবিলম্ব হইলে মৃত্তিকাস্থ রস আকর্ষণ করিয়া উহারা জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু টবের গাছ ভূমির গাছের ন্যায় রস আকর্ষণ করিতে না পারিয়া মরিয়া যায়। সুতরাং টবের গাছের অধিক পরিমাণে যত্ন ও পাট করা উচিত।

গাছ তৈয়ার করণ। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ইহার কলম প্রস্তুত করিতে দেখা যায়না।

প্রথমতঃ কটীং অর্থাৎ ডাল কাটিয়া কলম প্রস্তুত করিতে হইলে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে গাছ সকলের চারি অঙ্গুলি পরিমাণ রাখিয়া সমুদায় ডাল কাটিয়া ফেলিতেহয়। অনন্তর প্রত্যেক ডাল এক এক বিঘত পরিমাণে কলম কাটা করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল সমূহকে বেলে মাটির ছাপোরে পুতিতে হয়। কিন্তু ঐ সকল ডাল ছাপরে দিবার পূর্ব্বে চারিপাঁচ অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপন করিতে হয়। নতুবা ছাজিয়া গিয়া অধিকাংশ মরিয়া যায়; এবং নিয়মিত স্থানে তুলিয়া পুঁতিবার ও অত্যন্ত অসুবিধা হয়। ছাপোরে দুই তিন দিবস অন্তর জল দিতে হয়। যদ্যপি প্রতি দিবস জল দেওয়া হয় তাহা হইলে সমুদায় ডাল পচিয়া যায়। কিন্তু উহাতে জল দিবার পূর্ব্বে বোমায় ঝাঁজ। বাঁধিয়া জল দিতে হয়। তাহা না দিয়া যদ্যপি অন্য কোন পাত্রে করিয়া জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে জলের গতিতে গাছের গোড়ার মৃত্তিকা উঠিয়া গিয়া গাছের অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে এমত কি উহাতে চারা সকলের গোড়া নড়িয়া গিয়া গাছ মরিয়া যাইতে ও পারে।

—এইরূপ ভাবে গাছ সকল এক মাস কাল ছাপরে থাকিলে পর রোপিত ডাল সমূহের গোড়া হইতে শিকড় বাহিরহয়। অনন্তর ঐসকল গাছকে ছাপোর হইতে উত্তোলন করিয়া যথাস্থানে রোপণ করিতে পারা যায়।

আর পূর্ব্বে কলম করিবার জন্য যে গাছ হইতে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া ডাল সমস্ত কাটা হয় সেই গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিগের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে পাতার সার, বেলে মাটি ইত্যাদি অন্যান্য সার মিশ্রিত করিয়া উহার ভিতর ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপাইয়া দিতে হয়। এবং প্রতিদিন একবার করিয়া জল দিতে হয়। এইরূপে ক্রমাগত জল দিলে পৌষ মাসের মধ্যে ইহার সমুদয় শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া উত্তম পুষ্প হইয়া থাকে।

পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে গেঁদাফুলের ন্যায় প্রথমতঃ রক্তের গোড়া হইতে ফুটিতে থাকে, এমন কি ইহা সম্পূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত হইতে এক সপ্তাহ কাল ও সময় লাগিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মূল হইতে গাছ প্রস্তুত করিতে হইলে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহার শিকড় সমুদয় উত্তোলন করত কোন একটী বালুকা পূর্ণ পাত্রে স্থাপিত করিয়া ছাওয়া যুক্ত স্থানে রাখিতে হয়। যে স্থানে ঐ পাত্রটী স্থাপন করা হইবে সে স্থানটীতে বৃষ্টি না পড়ে এবং বায়ুর ও সঞ্চারণ হওয়া চাই। নতুবা সমুদয় মূল নষ্ট হইয়া যাইবে। অনন্তর কার্ত্তিক মাসে ঐ সকল মূল মাটিতে পুতিতে হয়। এবং ঐ দিবস হইতে প্রতিদিবস উহাতেজল দিতে হইবে। এই রূপে কিয়ৎ দিবস উহাতে জল সিঞ্চন করিলে উহা হইতে গাছ হইয়া পৌষ মাসের মধ্যে উহাতে উত্তম রূপ ফুল হইয়া থাকে। ইহা ভিন্নঅন্যান্য ডালিয়ার ও এই রূপ নিয়মে সার মাটী দিয়া পাট করিতে হয়।

তিসি বা ফ্লাক্সের চাষ।

আমাদের দেশে কৃষিজাত দ্রব্য সমূহে কেবল শস্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু শস্যাদির গাছ হইতে অন্য কোন প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার কোন চেষ্টা করা হয় না দেশ মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে কৃষি জাত দ্রব্য হইতে শস্য ভিন্ন আরও নানা প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সম্প্রতি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সমূহে এবিষয়ের বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এ দেশেও ঐরূপ চেষ্টা হইলে কৃষক দিগের শস্য ভিন্ন অন্য একটী আয়ের পথ প্রকাশিত হইতে পারে। নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত না করিতে পারিলে কখনই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

আমরা যে সকল পদার্থ অতি সামান্য বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকি, বিজ্ঞান বলে সেই সকল পদার্থ কত প্রকার উৎকৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে। কৃষকেরা তিসি আবাদ করিয়া তাহা হইতে কেবল মাত্র শস্য গ্রহণ করিয়া থাকে। উহাদ্বারা আর যে কোন পদার্থ উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহা তাহারা স্বপ্নেও জানে না। তাহারা তিসি গ্রহণ করিয়া গাছ জ্বালানীতে ব্যবহার করে কিম্বা অন্য কোন সামান্য কাজে লাগাইয়া থাকে। কিন্তু তিসি গ্রহণ ভিন্ন ঐ গাছ হইতে একটী অতি আবশ্যকীয় বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাহা জানা থাকিলে কত উপকার হইতে পারে। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা অদ্য ফ্লাক্সের বিষয় প্রকাশ করিয়া আমাদের প্রস্তাব শেষ করিব।

তিশির গাছের ডাঁটা হইতে এক প্রকার আঁশ বাহির হয় ঐ আঁশকে ফ্লাক্স কহে। বিলাতে প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটী মন ফ্লাক্স আমদানী হইয়া থাকে। ফ্লাক্স দ্বারা নানা উত্তম উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই আঁসে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তুলাজাত বস্ত্র অপেক্ষা ঐ সকল বস্ত্রের মূল্য অধিক।

আমাদের দেশে প্রজা সাধারণ কি উপায়ে তিসি অধিক উৎপন্ন হইবে তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে, ফ্লাক্স প্রস্তুত বিষয়ে তাহারা সম্পুর্ণ অজ্ঞ। কোন কারণে যদি দুই এক বৎসর দেশ মধ্যে তিসির আবশ্যকতা হ্রাস হইয়া আইসে তাহা হইলে কৃষক দিগের লাভের পথে কণ্টক পতিত হয়। রুসিয়া হইতে বিস্তর তিসি ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে। যে বৎসর ইংরাজ ফরাসিস দিগের সহিত রুসিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই বৎসর রুসিয়ার তিসি আমদানি বন্ধ হওয়াতে এদেশে তিসির উপর ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সমূহের সম্পুর্ণ নির্ভর হইয়া ছিল, সুতরাং ঐসময় এদেশে তিসির মূল্য অনেক বৃদ্ধি হইয়া ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের সে বিবাদ নাই। রুসিয়া হইতে বৎসর বৎসর ভূরি পরিমাণে তিসি ইংলণ্ডে প্রেরিত হওয়ায় এদেশে তিসির মূল্য অনেক হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায়

লাভ হইবার আশা কমিয়া আসিতেছে। এই সময় যদি দেশীয় কৃষকগণ পাট প্রভৃতি প্রস্তুতের ন্যায় ফ্লাক্স প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে বিস্তর লাভ হইবার সম্ভাবনা। তিসি অপেক্ষা ফ্লাক্সতে যে অধিক আয় বৃদ্ধি হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও রুসিয়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে বিলাতে ফ্লাক্স আমদানী হইয়া থাকে, কিন্তু উহার দিন দিন যেরূপ ব্যবহার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এদেশে অধিক পরিমাণে ফ্লাক্স উৎপন্ন হইলে কখনই আয়ের হ্রাস হইবে না। উৎকৃষ্ট ফ্লাক্সের আদর সর্ব্বত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রব্য ভাল হইলে সকলেই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইয়ুরোপের মধ্যে ইটালী দেশে রেসম উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি বিলাতের বাজারে ঘাটাল নিমতলার রেসমের বিশেষ আদর আছে। ফলতঃ দ্রব্যের উৎকৃষ্টতানুসারে যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিলাতে যদিও নিকৃষ্ট ফ্লাক্সের আদর অল্প কিন্তু স্কটলণ্ড দেশস্থ ডণ্ডি নগরের কলে ঘেঁট ফ্লাক্স অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে।

তিসির সহিত অন্যান্য শস্য একত্র করিয়া বপন করিলে ভালরূপ ফ্লাক্স উৎপন্ন হয় না। কারণ অন্যান্য শস্য ভূমি হইতে রস গ্রহণ করিলে তিসি গাছ সকল আবশ্যকীয় রসের অভাবে সম্যক প্রকারে বৃদ্ধি হইতে পারে না। গাছের তেজ হ্রাস হইলে; তাহা হইতে ভালরূপ আঁশ বাহির হইতে ব্যঘাত জন্মে।

ভালরূপ ফ্লাক্স উৎপন্ন করিতে হইলে জমিতে ঘন করিয়া বীজ বপন করা উচিত। বীজ ঘন বুনিলে চারা ঘন হইবে। ক্ষেত্রে চারা ঘন হইলে গাছ সকল লম্বা হইয়া বৃদ্ধি হইতে থাকে। ডাল পালা হইতে পারেনা গাছ যত সরু এবং লম্বা হইতে থাকে তত উৎকৃষ্ট আঁশ বাহির হইবে। গাছ হইতে ডাল পালা বাহির হইলে উহা লম্বা হয় না ছোট আকারে ঝাড় বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ গাছ হইতে আঁশ ভাল জন্মেনা। তিন চারি ফিট উচ্চ পরিমিত গাছ হইতে উত্তম

ফ্লাক্স উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ শণের ন্যায় ফ্লাক্সের বীজ ঘন করিয়া বুনিতে হয়। অক্টোবর মাসে তিসি বপন করিলে মার্চমাসে গাছ তৈয়ার হইয়া উঠিবে। ফ্লাক্সের জন্য উচ্চ ভূমিতে তিসি বপন করা উচিত। নিম্ন ভূমিতে উহা বপন করিলে বৃষ্টির জল জমিয়া গাছের প্রভূত অনিষ্ট করিতে পারে। ফ্লাক্সের ক্ষেত্রে ভাল করিয়া সার দেওয়া উচিত। সার অধিক থাকিলে গাছ সকল সতেজ হইতে থাকে, তেজাল গাছ হইতে ভালরূপ আঁশ পাওয়া যায়। ফ্লাক্সের ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকা কিছু শক্ত অর্থাৎ আঁট বিশিষ্ট হইলে ভাল হয়। নরম মাটিতে গাছ হইলে সামান্য বাতাসে কিম্বা বৃষ্টির ঝাপটে গাছ সকল হেলিয়া পড়িতে পারে, গাছ একবার হেলিয়া গেলে, সোজা করা বড় কঠিন, সরল গাছ হইতে যে আঁশ ভাল উঠিয়া থাকে ইটী মনে রাখা কর্ত্তব্য। এক জমিতে প্রতি বৎসর ফ্লাক্সের আবাদ না করিয়া এক বৎসর অন্তর উহার আবাদ করা উচিত। ঐ বৎসর ক্ষেত্রে অন্য শস্য চাষ চলিতে পারে। গাছ সকল এক মাস না হইতে হইতেই নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। গাছে তিসি জন্মিয়া যখন তাহা পুষ্ট হইবে তখন উহা পাকিয়া পাতা ঝরিবার পূর্ব্বে গাছ সকল ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া পাট কাটিয়া যেরূপ তাহা পচাইয়া আঁশ বাহির করিতে হয় সেইরূপে ঐগাছ সকল জলে পচাইয়া আঁশ বাহির করিতে হয়। গাছ পচাইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ উহা অধিক পচিলে আঁশ শক্ত হয়না। এইরূপ তিসি গাছ হইতে যে আঁশ বাহির হয় তাহাকে ফলাক্স কহে। ইংলণ্ডে উৎকৃষ্ট ফ্লাক্সের মূল্য অর্থাৎ প্রতি সাতাইস মণ দশসেরের দাম ৩৫০৲ হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত।

বঙ্গদেশের ন্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও ফ্লাক্স জন্মিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা পঞ্জাবে অধিক পরিমাণে ফ্লাক্স উৎপন্ন হইতে পারে। তথায় শীত অধিক এবং অধিক দিন থাকে তাহাতে গাছ ভাল হয়। এদেশে নিরেস রকমের ফ্লাক্স অনায়াসে জন্মিতে পারে, বিলাতে এইরূপ ফ্লাক্সের সমধিক আদর।

দেশীয় কৃতবিদ্যগণ এই সকল লাভের শতসহস্র উপায় থাকিতে সামান্য পেটের ভাতের জন্য বিজাতীয়দ্বারে যে জীবন বিক্রয় করেন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে! ভারত মৃত্তিকা তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিতেছে, উদরান্নের জন্য আর্য্য মস্তক দাসত্বের পদে অবনত করিও না, প্রত্যেক মৃত্তিকা রেণুতে সুখ সৌভাগ্য ও স্বাধীনতার বীজ রোপিত আছে! ভারতবাসীগণ সামান্য যত্ন করিলেই তাহা হইতে অমৃত ময় ফল লাভ করিতে পারেন।

নারিকেল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

নারিকেল একটী উপাদেয় ও মহোপকারী পদার্থ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এবম্ভূত লাভজনক দ্রব্যে, মনুষ্যগণ অমূলক যৎসামান্য কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ইহার চাসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না। তাহারা কহে, নারিকেল আজ্ঞান আমাদের বংশাবলীতে সহেনা, সুতরাং আমরা ইহাতে সবিশেষ মনোযোগ দিতে পারিনা, এবং লাভেও বঞ্চিত রহিয়াছি। সে যাহাহউক এই উপকারী পদার্থের কোন অংশই অকিঞ্চিৎকর নহে। নারিকেলের সর্ব্বোপরিস্থ অংশ (যাহাকে ছোবড়া বলে) ইহা হইতে দড়ী প্রস্তুত হয়। উহাকে কাতা কহে। যত প্রকার দড়ি আছে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত। এবং শীঘ্র নষ্ট হয়না। ছোবড়ার নীচে যে কঠিন আবরণ থাকে, তাহাই নারিকেল খোল এবংউহাতে হুঁকা প্রস্তুত করে। ঐ খোল অতি পবিত্র বলিয়া কখন কখন স্বর্ণ পাত্র নামে আখ্যাত হয়। খোলের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যকে নারিকেল শাঁস কহে। উহা একটী উত্তম খাদ্য এবং উহা হইতেই তৈল প্রস্তুত হয়, উহাই নারিকেলতৈল। নারিকেলের শাঁস কলে দিয়া উহার তৈল বাহির করিয়া লয়। উহা এতদ্দেশীয় মহিলাগণ কেশে ব্যবহার করে এবং বড় রুক্ষম। কিন্তু পাঁচড়া সম্বন্ধীয় রোগে অত্যন্ত উপকারী।

পক্ক নারিকেল—গুরুপাক, স্নিগ্ধ শীতল, পিত্তনাশক। ইহার জলও পিত্তনাশক, রুচিকর, মধুর, আগ্নেয়, বলকারক ও শুক্র।

অপক্ক অবস্থায় নারিকেলকে ডাব বলে। ইহা তৃষ্ণানাশক সহজে পরিপাক হয়না। কিন্তু ইহার জল, লঘু, শীতল, তৃষ্ণানাশক এদেশীয় লোকেউহাতে নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হয় (এজন্য দেবতা জ্ঞানে কদাচ নষ্ট করেনা) ইহার পত্রে গৃহ মার্জ্জনী প্রস্তুত হয়। এবং অবশিষ্টাংশ জ্বালানী হইয়া থাকে। নারিকেল গাছটীও জ্বালানী কাষ্ঠ হইয়া থাকে।

নারিকেল চাষে বড় একটা অধিক পরিশ্রম করিতে হয়না। যেমন তেমন করিয়া একবার আজ্জাতে পারিলে আজীবন ফলভোগ হয়। প্রথমতঃ একটী বেশ সুপক্ক নারিকেল এমন স্থলে প্রোথিত করিবে, যেখানে সদাসর্ব্বদা জল পতিত হইয়া থাকে। ২০।২৫ দিন বা এক মাস মধ্যেই নারিকেল চারাটী বহির্গত হইবে। পরে চারা উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে (যে খানে প্রোথিত করিবার সংকল্প হইয়াছে) তথায় সার প্রভৃতি দিয়া লাঙ্গল কিম্বা কোদাল দ্বারা মৃত্তিকার অতি উত্তম রূপ পাট্ করিয়া বসাইয়া দিবে। যাহাতে গাছ নষ্ট না হয় এমত করিয়া আজ্জাইতে হইবে অর্থাৎ সর্ব্বদা তদারক করা ও জল প্রভৃতি দেওয়াউচিত। এই রূপ করিলে চারা মরিবার সম্ভাবনা থাকিবেনা। এবং এই নিয়মানুসারেই নারিকেল বাগান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যেখানকার মাটী যত সরস তথায় অধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মিয়া থাকে। যথা সিংহল দ্বীপে যত নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ভারত বর্ষের (গ্রীষ্ম প্রধান দেশে) কখনই তত উৎপন্ন হয়না। বরং নিম্ন বঙ্গ ভূমিতে কতক কতক হইয়া থাকে। উল্লিখিত বিষয়ে নারিকেল হইতে যে উপকার হয় তাহা প্রদর্শন করা গেল। কিন্তু একটা একটা গাছ হইতে যে লাভ হয় তাহা দেখা যাউক। এক জাতীয় নারিকেল হাজারে নামে প্রসিদ্ধ। উহার একটা নারিকেল (৫ এক পয়সা করিয়া বিক্রয় হইলে অন্ততঃ ১৫। ১৬ টাকা হইতে পারে এজন্য সামান্য কথায়

বলে এক বিঘা ভূমির রাজস্ব ও একটা নারিকেল গাছের লাভপ্রায় সমতুল্য।

শ্রীকরালীপদ মুখোপাধ্যায়
ভান্তাড়া

কৃষি ব্যবহার্য্য অস্ত্র।

আজকাল অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, এদেশে বিলাতী অস্ত্রাদি কৃষি কার্য্যে ব্যবহার করিলে সমধিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। বাস্তবিক বিলাতী অস্ত্র আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যের উপযোগী কি না তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সমূহ হইতে আমাদের দেশে কৃষি কার্য্য ভিন্ন প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেশের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কৃষিকার্য্য হইয়া আসিতেছে। যে দেশের ভূমি যে প্রকার কৃষি কার্য্যোপযোগী অস্ত্রাদিও তদুপযোগী। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সমুহের মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন, সুতরাং ঐ সকল দেশের জন্য কৃষি ব্যবহার্য্য অস্ত্রও সেই রূপ আকারে গঠিত। আমাদের দেশের লাঙ্গল, কোদালী প্রভৃতি অস্ত্র সমূহ যে আকর বিশিষ্ট ইয়ুরোপ খণ্ডেঅস্ত্রাদি তৎসমুদায় অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফলতঃ দেশের প্রকৃতি অর্থাৎ মৃত্তিকার কাঠিন্য ও ক্ষমতানুসারে অস্ত্রাদিও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডীয় কৃষি প্রণালী আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইলে উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত এতদ্বারা যে প্রভুত অপকার সংঘটিত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিলাতি লাঙ্গলে ভূমি অধিক গভীর করিয়া মৃত্তিকা খনিত হইয়া থাকে। ঐরূপ গভীর খননে এদেশে শুভ ফলহইবার কোন আশানাই। এদেশের মৃত্তিকা যে প্রকার উর্ব্বরা সামান্য রূপ ভূমি কর্ষিত হইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া

দেখা গিয়াছে, অধিক গভীর খননে ভূমির যে স্বাভাবিক উর্ব্বরতা শক্তি আছে, তাহার অনেক হ্রাস হয়। যে দেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন তৎপ্রদেশে মৃত্তিকা গভীর করিয়া খনিত হইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। আসাম প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশে যে পরিমাণে ভূমি খনন করিয়া চাষ করিতে হয়, বঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে সে প্রণালীতে চাষের আবশ্যকতা করেনা। যে কোন প্রদেশে কৃষিকার্য্য দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় লোকের অবস্থা ও দেশের প্রকৃতি অনুসারে সকল দেশেই কৃষি প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিজাতীয় খাদ্য যেমন আমাদের শরীরের পক্ষে অপকারী, ভিন্ন দেশীয় কৃষি প্রণালীও আবার সেই রূপ মৃত্তিকার পক্ষে অহিত জনক। বিলাতী লাঙ্গলে যেরূপ ব্যয় আবশ্যক করে। এদের কৃষক গণ সেই ব্যয় ভার বহনকরিতে সমর্থ হয়না আমাদের দেশে গবাদি পশুদ্বারা হল চালিত হইয়া থাকে, বিলাত প্রভৃতি দেশ সমূহে অশ্বদ্বারা উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। ঐ লাঙ্গল আকর্ষণ করিতে যে পরিমাণে সামর্থের আবশ্যক করে, গোরুর দ্বারা তাহা কখনই সম্পন্ন হইতে পারেনা যখন কৃষকগণ দুই একটী গরু খরিদ করিতেই কষ্ট বোধ করে তখন যেবহু ব্যয় সাধ্য অশ্ব খরিদ করিয়া কৃষি নির্ব্বাহ করিবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। বিশেষতঃ অশ্বের প্রতিপালন, খাদ্যের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র রূপ। গরুর দ্বারা গৃহস্থের যে পরিমাণে উপকার হয় অশ্বদ্বারা তাহা হইতে পারেনা। গোরুকে দানা দিতে হয় না। সামান্য আহারে সন্তুষ্ট, অধিক সময় ধরিয়া পরিশ্রম করিতে পারগ। গোবর দ্বারা জ্বালানি কার্য্য এবং সারের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এদেশে যে সকল শস্য চাষ হইয়া থাকে, গোবরের সারই তাহার উপযুক্ত, অশ্ব দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় না। বিলাতী লাঙ্গলের একটী প্রধান দোষ এই যে উহা মেরামত করিতে হইলে মফস্বলে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। দেশীয় লাঙ্গল সর্ব্বত্রই মেরামত হইতে পারে। এবং উহা মেরামতের যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে কৃষকগণকে টাকার জন্য বিব্রত হইতে

হয় না। এদেশে এরূপ নিয়ম আছে, যে কৃষি ব্যবহার্য্য যাবতীয় অস্ত্রাদি মেরামত করিতে হইলে অগ্রে টাকা দিতে হয় না। যাহারা ঐসকল অস্ত্রাদি মেরামত করিয়া থাকে, তাহারা টাকার পরিবর্ত্তে শস্যের সময় কিয়ৎ পরিমাণে শস্য পাইয়া থাকে, এইনিয়মে কৃষিগণকে টাকার জন্য বিব্রত হইতে হয় না। কিন্তু কৃষি কার্য্যে বিলাতী নাঙ্গল প্রভৃতি অস্ত্রাদি প্রবর্ত্তিত হইলে, উহা খরিদ, মেরামত এবং ব্যবহার জন্য সমধিক ব্যয় পড়িবে। ঐ ব্যয় এদেশের পক্ষে কোন মতেই উপযোগী নহে।

যে সকল ইয়ুরোপীয় কৃতবিদ্যগণ বহুদিবস এদেশে থাকিয়া কৃষিকার্য্যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কৃষিব্যবহার্য্য অস্ত্রাদি সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবগত হইতে সকলেরই ইচ্ছা হয়, তজ্জন্য ভারত বর্ষীয় এগ্রিকলচার সোসাইটীতে শ্রীযুক্ত জেমস্ গিবন সাহেব যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

“কৃষিকার্যের যে সকল অস্ত্রাদি এতদ্দেশে শত শত বৎসারাবধি ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, তাহা এতদ্দেশীয় বলদের ও দরিদ্র প্রজাদিগের যোত্রানুসারে উপযুক্তই বোধ হয়। এই বিষয় যদি বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করা যায় তবে দৃষ্টি হইবে যে দেশীয় অবস্থা বিবেচনা করিলে এই সকল অস্ত্র এতদ্দেশে যেমন কর্ম্মণ্য তেমনি অন্য কোন দেশীয় অস্ত্র হইতে পারেনা। ইংলণ্ড দেশে দুই কারণে অত্যুত্তম লাঙ্গলের ব্যবহার আছে, প্রথমতঃ ভূমি অধিক খনন নিমিত্ত দ্বিতীয়তা নিম্নোচ্চ ভূমি সমতা জন্য। কিন্তু এদেশে ঐরূপ ভূমি খনন ও মৃত্তিকা উচ্চ নীচ করণের কোন আবশ্যকতা নাই। যদ্যপি এতদ্দেশে লাঙ্গলের কার্য্য এক প্রকার অকর্ম্মণ্য বোধ হয়, তথাপি এই দেশে বারম্বার মৃত্তিকা কর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে সেইরূপ ইংলণ্ড দেশেও লাঙ্গল ও মই দিতে হয় এবং ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যেমন বলদের অধিক শক্তি ও ব্যয় অধিক আবশ্যক করে, তাহার সহিত তুলনা করিলে বোধ হয় ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্য

এতদ্দেশ অপেক্ষা বড় উৎকর্ষ নহে। বিলাতী লাঙ্গলের পরীক্ষা জন্য জনৈক সাহেব এদেশে দুইশত বিঘা ভূমি লইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত কৃষি করিয়া ছিলেন, কিন্তু দেশের অবস্থা বুঝিয়া ঐ লাঙ্গলের ব্যবহার সম্পুর্ণ অনুপযুক্ত দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিলাতী লাঙ্গল কেবল পতিত জঙ্গলীয় ভূমি আবাদ করিবার পক্ষে সুবিধা জনক। কয়েক বৎসর ধরিয়া বিলাতী লাঙ্গলের পরীক্ষা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ডেবিড স্কট্ সাহেব গোরক্ষপুরে বাহুল্য রূপে চেষ্টা করিয়া কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই।”

অনেক দিন হইতে বিলাতী লাঙ্গল এদেশে ব্যবহারের চেষ্টা করা হইতেছে। মধ্যে নীলকর সাহেবেরা নদীয়া ও যশোহর জেলায় কোন কোন নীল কুঠীতে বিলাতী লাঙ্গল আনাইয়া বিস্তর যত্ন করিয়া ছিলেন, কিন্তু সকলেই পরিশেষে বিফল যত্ন হইয়াছেন। যাঁহারা কৃষি কার্য্যের সবিশেষ তত্ত্ব রাখেন না তাঁহারাই বিলাতী লাঙ্গলের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। বিলাতী লাঙ্গল যে আমাদের দেশের উপযোগী নহে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে যদি ঐ লাঙ্গল এদেশের প্রজা দিগের সঙ্গতি, গবাদির শক্তি এবং মৃত্তিকারপ্রকৃতি অনুসারে নির্ম্মিত হইয়া ব্যবহৃত হয়, তদ্বারা উপকার হইতে পারে বর্ত্তমান লাঙ্গলযে সম্পুর্ণ উৎকৃষ্ট এবং উহার যে আর উন্নতি হইতে পারেনা। তাহা অমাদের অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে লাঙ্গলে যে প্রকার ফাল ব্যবহার হইয়া থাকে, প্রাচীন কালে উহার আকার অনেক প্রভেদ ছিল। পরাশর ঋষিকৃত কৃষি বিষয়ে যে শ্লোক কয়েকটী দেখা যায়, তাহাতে লিখিত আছে ফালের দৈর্ঘ এক হস্ত পাঁচ অঙ্গুলি ও তাহার আকার আকন্দ পত্র সদৃশ। বর্ত্তমান প্রচলিত ফাল অপেক্ষা পরাশর বর্ণিত ফাল দ্বারা যে কর্ষণ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ প্রকার ফাল ব্যবহার করিতে হইলে দুর্ব্বল পশু দ্বারা তাহা চালিত হইতে পারেনা কারণ উক্ত ফালযুক্ত লাঙ্গল আকর্ষণ করিতে যেরূপ বলের আবশ্যক বর্ত্তমান

দুর্ব্বল গবাদি দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া কঠিন। অতএব অগ্রে কৃষি ব্যবহার্য্য পশুর বলবৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া লাঙ্গলের উন্নতি চেষ্টা করা যে কতদূর সঙ্গত তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

কৃষি ব্যবহার্য্য আর আর যে সকল অস্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে তন্মধ্যে কোদাল একটী প্রধান অস্ত্র। ক্ষেত্রে মাটি তুলিতে খানা কাটিতে পাট বাঁধিতে এবং মৃত্তিকা খনন প্রভৃতি কার্য্যে কোদাল অত্যন্ত আবশ্যকীয় অস্ত্র বিশেষতঃ উদ্যানকার্য্য কোদাল ভিন্ন চলিতে পারেনা। উদ্যান মধ্যে নানাবিধ বৃক্ষ থাকাতে তন্মধ্যে হল চালনার সুবিধা না হওয়াতে বাগানে কোদাল ব্যবহার করিতে হয়। বিশেষতঃ অধিক মৃত্তিকার মধ্যে যে সকল উদ্ভিজ্জের শিকড় প্রবিষ্ঠ হয়, সেই সকল মূল তুলিতে কোদাল যেমন উপকারী অন্য অস্ত্র সেরূপ নহে। ছোট বড় নানা প্রকার কোদাল এদেশে ব্যবহার হইয়া থাকে। কোন প্রকার কোদাল দ্বারা কি কার্য্য, সাধিত হয় তাহা এদেশে সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং এস্থলে তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক বিবেচনায়, কেবল দেশীয় কোদালের তুলনা লিখিত হইল।

লাঙ্গল সম্বন্ধে যেমন অনেকের মনে নানা প্রকার কুসংস্কার দেখা যায় কোদাল সম্বন্ধেই ঐরূপ। আমাদের বিশ্বাস দেশীয় লাঙ্গল যেমন এদেশের পক্ষে উপকারী, সেইরূপ এতদ্দেশীয় কোদাল এদেশের পক্ষেই প্রশস্ত। এতদ্ সম্বন্ধে বিজ্ঞবর গিবন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ড দেশীয় কোদাল অপেক্ষা এতদ্দেশীয় কোদাল অধিক ভারি, অধিক অকর্ম্মণ্য রূপে ব্যবহার হয়। ইংলণ্ড দেশের কোদাল দ্বারা কেবল ভূমিতে আঁচড় দেওয়াযায় তাহাতে তৃণাদির শিকড় ভূমিতেথাকিয়া পুনর্ব্বার জন্মিতে পারে; কিন্তু এদেশীয় কোদাল দ্বারা চারিবুরুল মৃত্তিকা খনিত হওয়াতে তৃণাদির শিকড় শুদ্ধ উঠিয়া যায়। ফলতঃ এদেশীয় কোদালের ন্যায় ইংলণ্ডীয় কোদাল দ্বারা কোন মতেই এদেশের কার্য্যের উন্নতি হইতে পারেনা। গিবন সাহেব বিহার দেশের খুরপা দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, বিহার বাসীরা অন্যান্য দেশীয় লোক অপেক্ষা

খুরপা দ্বারা অধিক কার্য্য করিতে পারে। এই অস্ত্র দ্বারা স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা প্রভৃতি সকলেই কার্য্য করিতে অত্যন্ত তৎপর। এই ক্ষুদ্র অস্ত্র এক ফুট লম্বা ও তাহার মুখে বুরুল পরিমিত লৌহার পাতা থাকে। এই সামান্য অস্ত্রে ক্ষেত্রের যাবতীয় ঘাস নিড়াইয়া ক্ষেত্রের পার্শ্বে নিক্ষেপ করে। ইংলণ্ড দেশে নিড়ানি কার্য্য যেমন অপকৃষ্ট রূপে হইয়া থাকে, তদ্‌দৃষ্টে স্বীকারকরিতে হইবে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা নিড়ানি কার্য্যে উন্নত। দশ অবধি কুড়ি জন পর্য্যন্ত এক দিনের মধ্যে এক এক বিঘা ভূমি নিড়াইতে পারে।”

এক্ষণে পাঠক গণ সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিলাতী অস্ত্র এদেশের কৃষি কার্য্যের কোন অংশেই উপযুক্ত নহে। কৃষি ব্যবহৃত প্রধান প্রধান অস্ত্রাদি সম্বন্ধে গিবন সাহেবের মত কখনই অযুক্তি মূলক বোধ হয়না।

আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কৃষি সম্বন্ধে কোন কোন কার্য্যে দেশীয় অস্ত্র অপেক্ষা বিলাতী অস্ত্র সমূহ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। বৃক্ষাদি ছাটাই অর্থাৎ কেয়ারি করিতে কলম বাঁধিতে দেশীয় অস্ত্র তত কার্য্যোপ যোগী নহে।

কএকটি নিত্য ব্যবহার্য্য দেশী তরকারি।

ঋতু ভেদে ভিন্নভিন্ন শাক সবজী তরকারী উৎপন্ন হয়। কোন্ কোন্ তরকারী চাষ করিতে হয়, এবং কি নিয়মে চাষ করিলে সফল যত্ন হইতে পারা যায়, তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক। বিলাত বাসী সাহেব দিগের ন্যায় আমাদিগকে ভাড়াটিয়া আবাসে বাস করিতে হয় না যে স্থানের অভাবে গাছ পালা প্রস্তুত করিতে ব্যাঘাত জন্মে। এদেশে যে নিতান্ত দরিদ্র তাহারও এক এক খানি কুটির এবং তাহার

চতুর্দ্দিকে কিয়ৎ পরিমাণে ভূমি পতিত থাকে আবাস স্থানের চারি দিকে শাক সবজী তরকারী উৎপাদন করিলে অনায়াসেই সংসার নির্ব্বাহ হইতে পারে। বাড়ীর গাছপালায় যে কত সুখ তাহা বলিয়া শেষ হয়না। গাছের সুপক্ক ফল সতেজ টাট্‌কা শাক সবজী প্রভৃতি তরকারীর আস্বাদন যে কত মধুর, তাহা যাঁহারা বাজারের বাসী, শুষ্ক দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সে সুখে বঞ্চিৎ। গৃহস্থ মাত্রেরই উচিত ঐসকল দ্রব্যাদি স্বস্ব আবাসবাটীতে প্রস্তুত করা। সুদক্ষ গৃহস্থ হাট বাজারের মুখ অপেক্ষা করিয়া থাকেন না। তাঁহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই নিত্য হাট বাজার সজ্জিত থাকে। কোন বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন “বাপুহে বাড়ীতে নিত্য হাট বাজার বসাইবে।” এই হাট বাজারের অর্থ আর কিছুই নহে, আবাস বাটীর চারিদিকে শাক সবজীর ক্ষেত করিয়া তদ্‌সমুদায় উৎপাদন করা। আমরা আশা করি আমাদের পাঠকগণ স্ব স্ব আবাস ভূমির চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ফুল, ফল, শাক সবজী তরকারীর আবাদ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

যতপ্রকার শাকসবজী ব্যবহৃত হইয়া থাকে তদ্ সমুদয় প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ কতক গুলি স্থলজ, তাহারা স্থলে উৎপন্ন হয় যথা পালং ডাঁটা, নটে ইত্যাদি। আর কতক গুলি জলে জন্মিয়া থাকে, তাহা দিগকে জলজ কহে, যথা কলমী, হিঞ্চে, শুসনি প্রভৃতি প্রত্যেক জাতীয় শাক তাহাদিগের প্রকৃতি অনুসারে স্থলে ও জলে রোপণ করিতে হয়। শাক অতি সুখাদ্য তরকারী। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই নিকট উহার আদর। বিশেষতঃ দুঃখি দিগের অন্নের প্রধান উপকরণ। অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা শাক অতি সহজে বিনা ব্যয়ে উৎপন্ন হয়। বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শাক জন্মিয়া থাকে। দেশীয় শাক সমূহের তাদৃশী পুষ্টিকারিতা শক্তি নাই। সুতরাং প্রতিদিন উহা ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। নিত্য একরূপ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পাকস্থলী দুর্ব্বল

হয়, তাহাতে ভালরূপ রুচি থাকে না; সুতরাং নানা প্রকার পীড়া হইতে পারে, এজন্য হিন্দু শাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণ তিথি বিশেষে ভিন্ন ভিন্নতরকারী ভক্ষণেরব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। যখন খাদ্যের উপর মানব জাতির স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তখন তাহা শরীর রক্ষার উপযোগী নিয়মে ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

লাউ—ইহা তরকারীতে ব্যবহার হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে নবমী তিথি ও ভাদ্রমাসে ভক্ষণ নিষেধ। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই লাউ জন্মিয়া থাকে। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে উহা রোপণ করা যাইতে পারে। অগ্রপশ্চাৎ করিয়া বীজ রোপণ করিলে সম্বৎসর ফলভোগ করিতে পারা যায়। দোঁয়াস মৃত্তিকায় লাউ ভাল হইয়া থাকে। এক একটী মাদা করিয়া ৩।৪ টী বীজ রোপণ করিলে যথেষ্ট হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছ বাড়িতে আরম্ভ হইলে চারার গোড়ায় কাটি পুতিয়া দিতে হয়। এবং যত ডগা বাড়িতে থাকে, ডগা সকল ডাল পালায় আশ্রয় করিয়া দিয়া মাচাতে তুলিয়া দিলে স্বাধীন ভাবে চারিদিকে বিস্তৃত হইতে পারে। সকল প্রকার লাউ এক আকারের নহে। লম্বা ও গোল প্রভৃতি আকার ভেদে উহা ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে পরিগণিত। এক একটী গাছে প্রচুর লাউ হইয়া থাকে উহা সুপক্ক হইলে মুখ কাটিয়া গোবর পুরিয়া রাখিলে, মধ্যের শস্য পচিয়া যাইবে, তখন জলদ্বারা ধুইয়া পরিষ্কার করিলে, কমণ্ডুল, সেতার তানপুরা প্রভৃতি প্রস্তুতের উপযুক্ত হয়। এবং ঐ পক্ক বীজ সমূহ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিলে, রোপণের উপযুক্ত হইয়া থাকে। সেতার ও তান পুরার উপযুক্ত করিলে তদ্বারা উত্তম আয় হইতে পারে। লাউ চাষ করিতে হইলে বিশেষ পরিশ্রম কিম্বা অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয় না।

বেগুণ—দেশীয় তরকারির মধ্যে বেগুণ অতি উৎকৃষ্ট। উহার বিশেষ গুণ এই যে বারমাসেই পাওয়া যায়। অন্যান্য সময়ের অপেক্ষা শীত কালের বেগুণ অতি সুস্বাদু। হিন্দু শাস্ত্র মতে ত্রয়োদশী তিথিতে ভক্ষণ

নিষেধ। লাউ কুমড়া প্রভৃতি অপেক্ষা বেগুণের চাসে অধিক যত্ন করিতে হয়। দোঁয়াস রসাল মৃত্তিকায় বেগুন ভালজন্মে। বেগুন নানা জাতীয় এবং উহাদিগের আস্বাদনের বিভিন্নতা আছে। সকল স্থানের বেগুণের সমান আস্বাদন নহে। হুগলী জেলার মধ্যে হাঁসনা-নের বেগুণ অতি প্রসিদ্ধ।

দোঁয়াস মৃত্তিকার বেগুণ ভাল হয়। বেগুণ ক্ষেত্রে সার দেওয়া উচিত। অগ্র পশ্চাৎ করিয়া বেগুণ রোপন করিলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ফললাভ করিতে পারা যায়। চৈত্রের শেষ হইতে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত বেগুণ রোপণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঘাস মুথা প্রভৃতি উত্তম করিয়া বাছিতে হইবে। এবং ঐ স্থানের মৃত্তিকা কোদ্লাইয়া তাহাতে কিছু সার মিশ্রিত করিতে হইবে, খনিত মৃত্তিকার সহিত সার যেন ভালরূপ মিশ্রিত হয় তজ্জন্য মাটী উত্তম চূর্ণ করিতে হয়। এইরূপে মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে, বীজ অন্যূন ২।৩ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ ক্ষেত্রে বপণ করা কর্ত্তব্য। বীজ ভিজাইলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। এজন্য যতদিন অঙ্কুর না বাহির হয়, মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে জল সিঞ্চন করা ভাল। অত্যধিক রৌদ্র নিবারণ জন্য পাতা কিম্বা দরমা দ্বারা ক্ষেত্র ঢাকিয়া রাখা উচিত। অনন্তর চারা ৬।৭ অঙ্গুলি বড় হইলে তখন তাহা হাপর হইতে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য। এক বিঘা জমিতে অন্যূন ১৮০৯ টী চারা রোপণ করিলে যথেষ্ট হয়। চারা সকল লাইন করিয়া রোপণ করিলে গাছের গোড়ায় মাটি ধরাইতে জল দিতে এবং উহা তুলিতে সুবিধা হয়। দুই হাত অন্তর এক একটী চারা রোপণ করা সুব্যবস্থা। চারা রোপণের সময় তাহার শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া পুঁতিতে হয়। পিপিলিকা প্রভৃতি কীটাদি লাগিলে গাছে ছাই ছড়াইয়া এবং হরিদ্রা গুলিয়া দেওয়া উচিত বেগুন ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়ার ব্যবস্থা এবং গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক।

ভুট্টা—ইহাকে মক্কাও কহিয়া থাকে। বঙ্গ দেশ অপেক্ষা পশ্চিমা-

ঞ্চলে উহার অধিক চাষ হয় এবং তত্রত্য লোক সকল ভুট্টার ময়দা, খৈ প্রভৃতি নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। এক্ষণে এদেশেও নানা স্থানে উহার চাষ হইতেছে। বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত উহা বপণের সময়। অন্যান্য সময়েও চাষ করিলে গাছ হইয়া থাকে। মটর বুনিবার ন্যায় জোলের মধ্যে ২।৩ টী করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। গাছ বড় হইলে অনেকে ইক্ষু গাছের ন্যায় পরস্পর দুই তিনটী গাছ এক সঙ্গে বাঁধিয়া দেয়, এরূপ করাতে ঝড়ে গাছের কোন অপকার করিতে পারেনা। গাছের গোড়ায় মাটি আলগা হইলে মধ্যে মধ্যে মাটি দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। বর্ষাকালে ক্ষেত্রে জল দিবার কোন আবশ্যকতা নাই, শীত কালে আবাদ করিলে মধ্যে মধ্যে জল সেচিয়া দেওয়া উচিত। প্রায় তিন মাসের মধ্যে ভুট্টা প্যাকিয়া উঠে। শ্বেত, পীত, প্রভৃতি বর্ণভেদে নানাপ্রকার ভুট্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল জাতীয় খাইতে সুখাদ্য নহে ভাল রূপ ফলন হইলে বিঘা প্রতি অন্যুন ত্রিশ টাকার শস্য বিক্রীত হইতে পারে।

কাঁকুড়—ইহা কাঁচা অবস্থায় তরকারী ও পক্কাবস্থায় জলপানে ব্যবহার হয়। কাঁকুড় সুখাদ্য ফল অপক্কাবস্থায় মধুর ও শীতল এবং পক্কবস্থায় মূত্ররোগ নাশকারী। বঙ্গ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই কাঁকুড় জন্মিয়া থাকে। বেলে মাটিতে অর্থাৎ যে মৃত্তিকায় বালুকার ভাগ অধিক সেই মৃত্তিকায় প্রচুর ফল জন্মিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাসের মধ্যে বীজ রোপণ করিতে হয়। বৈশাখ মাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। কাঁকুড়ের জমিতে প্রথমতঃ অন্যুন তিন চারিবার উত্তম করিয়া চাষ দিতে হয়। চাস দিয়া ক্ষেত্রস্থ ঘাস মুথা প্রভৃতি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। অনন্তর এক একটী স্থানে দুই তিনটী করিয়া বীজ পুঁতিতে হয়। বীজ রোপণের পূর্ব্বে উহা ৮।১০ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া রোপণ করিলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। গাছ বড় হইলে ভুমিতে লতাইয়া বেড়াইয়া থাকে। কাঁকুড় গাছ মাচা প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া দিতে হয়না। মধ্যে মধ্যে ক্ষেত পরিষ্কার করিয়া

দিতে হয়। কারণ ক্ষেতে অধিক জঙ্গল হইলে গাছ মরিয়া যায়, ফল ভাল হয় না। মৃত্তিকা নীরস বশতঃ যদি গাছের কোন অপকার হয়, তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে জল দেওয়া আবশ্যক। গোল ও লম্বা আকৃতি ভেদে কাঁকুড় নানা জাতীয়।

পটল—হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তৃতীয়া তিথি ও হরিশয়নে ভক্ষণ নিষেধ পটল অত্যন্ত উপকারী তরকারী। অনেক ঔষধে উহার সত্ত্ব অনুপানে লাগিয়া থাকে। পটলের পাতাকে পলৃতা কহে। ইহা দ্বারাও ঔষধের কার্য্য হইয়া থাকে, পটলের গেঁড় বা মূল অত্যন্ত বিরেচক।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পটল জন্মিয়া থকে। কঠিন মৃত্তিকায় ফলন ভাল হয়না দোঁয়াস মৃত্তিকায় যথেষ্ট ফলন হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে জল বদ্ধ হইয়া থাকিলে, গাছ মরিয়া যায় এজন্য জল নির্গমের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। কিছু টিকোল ভুমিতে পটলের আবাদ করা ভাল। গোবর খৈলের সার পটলের পক্ষে প্রশস্ত। পটলের প্রায় প্রত্যেক গাঁইট হইতে সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় সকল নির্গত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পটলের আবাদ করিতে হইলে, ঐ সকল গাঁইট দুই দিকে এবং শিকড়ের কতক অংশ কাটিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দিতে হয়। যতদিন না গাছ লাগিয়া যায় ততদিন মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে গোবর মিশ্রিত জল উহার গোড়ায় দেওয়া মন্দ নহে। রৌদ্রের উত্তাপ নিবারণ জন্য পাতলা করিয়া খড় দিয়া উহা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। গাছ বসাইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকা উত্তমরূপ প্রস্তুত করা আবশ্যক। ঘাস প্রভৃতি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কর্ষণ করতঃ ভাল করিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করিতে হইবে। ক্ষেত্রে আইল বাঁধিয়া গাছ পুতিতে হয়। পটলের লতানিয়া গাছ। কিন্তু কোনরূপ মাচা করিয়া দিতে হয়না ফুটিও তরমুজ প্রভৃতির ন্যায় মাটিতে গাছ লতাইয়া বেড়ায়। একবার গাছ করিলে অন্যুন তিন বৎসর ফলভোগ করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ ইচ্ছা করিলে নিত্য ব্যবহার্য্য পটল বাড়ীতে উৎপন্ন করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে

বাড়ীতে কিয়দংশ ভূমি পটল ক্ষেত করিয়া উহার আবাদ করিতে পারিলে, স্বস্ব সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিয়া প্রতি বেশী দিগকে বিতরণ করা যাইতে পারে।

চিরস্থায়ী ফুল।

ইহা এক প্রকার ঋতু পুষ্প মধ্যে পরিগণিত। এই পুষ্প দেখিতে অতি সুন্দর। ঋতুপুষ্প অধিকাংশই গন্ধ বিহীন, সুতরাং ইহার ও গন্ধ নাই। ইহার ফুলের বর্ণ ঘোর জরদ। এক একটী গাছে বিস্তর ফুল ফুটিয়া থাকে। এই ফুল দেখিতে অতি মনোহর ইহার সঠিক সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝান বড় কঠিন। শিরোভাগস্থ চিত্র দর্শনে ইহার সৌন্দর্য্য কতক অনুমিত হইবে। চন্দ্রমল্লিকার সহিত এই ফুলের অনেকটা সাদৃশ্য আছে চন্দ্রমল্লিকার ন্যায় ইহাও শীঘ্র শুষ্ক হইতে জানেনা। একবার ফুটিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত গাছের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে ইহার কএকটী ফুল একত্রিত করিয়া বাঁধিয়া গ্লাসে বসাইয়া রাখিলে বহুদিবস পর্য্যন্ত সজীব অবস্থায় থাকে। তৎজন্য ইহার নাম চিরস্থায়ী ফুল, এবং ইহাকে ইংরাজীতে Everlasting flower. কহিয়া থাকে। ইহা

শীতলদেশের পুষ্প সুতরাং আমাদের দেশে শীতকালেই হইয়া থাকে। সমস্ত শীতকাল ফুল ফুটিয়া থাকে এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে রৌদ্র প্রবল হইলে উহা মরিয়া যায়। ইহার ফুলগুলি মরেনা কেবল পত্র ও ডালগুলি শুকাইয়া যায়। এরূপ আশ্চর্য্য পুষ্প সকলেরই দর্শন করা উচিত, এই ফুলের বর্ণ ঘোর জরদ এবং চিরদিন ঐ বর্ণ দেখা যায় কোনক্রমে সুক্না ফুল বলিয়া প্রতীত হয়না। ইহার রোপণ প্রনালী অপর অপর জেড়ুয়া বা মরসমি ফুলের ন্যায় এবং কৃষিতত্ত্বে তাহা আনু পূর্ব্বিক বর্ণনা করা হইয়াছে তজ্জন্য আধার বলা বাহুল্য।

কদলী-সূত্র।

আপনার কৃষি তত্ত্বে কদলী বৃক্ষের রোপণ ও উন্নতি বিষয়ে অনেকটা লিখিত হইয়াছে কিন্তু উক্ত বৃক্ষ দ্বারা যে সমাজের অন্যবিধ উন্নতি বিধান ও অসংশায়িত রূপে একটী লাভ জনক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইতে পারে আজ আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম বোধ হয় কদলী বৃক্ষের সূত্র অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেখিতে বড় শুভ্র ও উজ্জল-গুচ্ছ গুলি চিক্কন ও মসৃন যথারীতি প্রস্তুত করিতে পারিলে পাট বলিয়া ভ্রম জন্মে। কদলী বৃক্ষের দীর্ঘতানুসারে ইহার সূত্রের দীর্ঘতা হইয়া থাকে। আমরা দৈর্ঘে চারি পাঁচ হাত সূত্র প্রস্তুত করিয়াছি। ঐ সূত্রের কতকটা মহানগরীর প্রদর্শনীতে ও প্রেরিত হইয়াছে। প্রদর্শনীতে বাহবা লাভ করুক বা না করুক তাহাতে আমাদের বড় একটা ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, এটী দ্বারা যে একটী সুবিস্তৃত লাভের দ্বার উন্মুক্ত হইতে পারে তাহাই আমাদের বক্তব্য। আমাদের দেশে ভীম কলেবর অতিশয় দীর্ঘ কদলী বৃক্ষের বহুল চাষ হইয়া থাকে, উহার ফলকে সাধারণত ভীম আটিয়া বলিয়া থাকে। ফলে

বেশ বিচিত্র থাকে, উচ্চ শ্রেণীর লোক মধ্যে যদিও ইহার বিবরণ প্রচার কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একটী উপাদেয় উপভোগ্য। এই জাতীয় বৃক্ষের সূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেখিতেও যেমন সুশ্রী, তেমনি, পাটের মত না হউক ইহার সূত্র গুলি কতকটা শক্ত। অতি সহজে ছিন্ন হয় না। ঐ জাতীয় আর একপ্রকার কদলীআছে, যাহাকে লোকে বীচেকলা বলিয়া থাকে উহার বৃক্ষ দ্বারাও সুন্দর সূত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কি প্রকারে এই সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে দেখা যাউক। বর্ষার শেষে অর্থাৎ শ্রাবণ ভাদ্রে কদলী বৃক্ষ সকল মূল সহিত কর্ত্তন করিয়া পাট ও শণের মত জলে রক্ষা করিতে হয় পরে আনুমানিক ১০।১৫ দিন পরে ঐ বৃক্ষ গুলি ঠিক পাট ওশণের ন্যায় ধৌত করিলেই সুচিকণ সূত্র সকল বহির্গত হইতে আরম্ভ হইবে। তখন রৌদ্রে রাখিয়া ঐ গুলিকে শুষ্ক করিয়া লইলেই হইল। যখন এত সহজ উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে তখন সকলেরই এবিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এখন কথা এই সূত্র যেন হইল এই সূত্রর দ্বারায় কি কাজ হইবে আসুন একবার তাহাই দেখি। আমাদের দেশে যে যে উপায়ে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা অনায়াসলব্ধ হইলেও অনেক গুলি উপাদানের প্রয়োজন। কেবল এই সূত্র দ্বারাই কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। পেষণ যন্ত্রে সুন্দর চূর্ণ করিয়া চুণ মিশ্রিত জলে মিশাইয়া আলোড়িত করিয়া লইতে হয়, পরে বস্ নির্ম্মিতযন্ত্র বিশেষ দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া স্তরে স্তরে রাখিতে হইবে। শুষ্ক ও পালিষ করিলে ভাল কাগজ হইল। আমাদের ইচ্ছা এই প্রকারের কাগজ প্রস্তুত প্রণালী দেশমধ্যে প্রচলিত হয়। ইহাতে লাভের পথ দুইটী। বহুল কদলী বৃক্ষ চাষ করিতে লোকের মতি হইলে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল উৎপন্ন হইবে। ফল শেষে যে বৃক্ষ গুলি বৃথা নষ্ট হইয়া যাইত তদ্দারা সূত্র হইবে। বর্ষাকাল বলিয়া কোন কথা নাই সকল সময়েই হইতে পারে। বৃক্ষ সংস্থাপন জন্য উপযুক্ত জল হইলেই হইতে পারে। বিস্তৃত রূপে চাষ করিতে পারিলে ইহার ফল দ্বারা কম লাভের সম্ভাবনা নাই। পয়সায় ৩।৪টী কদলী বিক্রয় হইলে প্রত্যেক

বৃক্ষে কত লাভ দাঁড়ায় দেখুন। এটী অসময়ে জীবন রক্ষার একটী প্রধান সহায়। দুর্ভিক্ষের সময় কদলী ভক্ষণ করিয়াও প্রাণ ধারণ করা যাইতে পারে। অন্তত এটী মনে করিয়াও ইহার চাষবিষয়ে যত্ন পর হওয়া উচিত। কদলী দ্বারা নানা প্রকার পিষ্টকাদি প্রস্তুত করতঃ আমাদের কৃষি জীবি ভ্রাতারা যার পর নাই আনন্দ উপভোগ করেন। অতএব যাহাতে দেশ মধ্যে ইহার অধিক চাষ হয় তৎপক্ষে আমাদের যত্ন ও উৎসাহ দুয়েরই একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীকালিকমল স্যান্যাল।
তৃতিয় শিক্ষক সেরাজগঞ্জ।

ইক্ষু।

ইংরাজী ১৮৫৫ সালের জুলাই মাস অবধি ১৮৫৬ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডও অন্যান্য দেশে ১২৮৯৫৪৩ মোন ইক্ষু ও খেজুরেচিনি রপ্তানি হয় তন্মধ্যে কেবল বিলাতে ৮৮২৪৯৯ মোন গিয়াছিল। বিলাতে বৎসর বৎসর ১১৭৬০০০০ মোন চিনি খরচ হইয়া থাকে। পাঠকগণ সহজেই বুঝিতেছেন, বিদেশে বাণিজ্যার্থে যে পরিমাণে চিনি প্রেরিত হইয়া থাকে, দেশ মধ্যেও তদপেক্ষা যে অধিক পরিমাণে উহা ব্যবহৃত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিষেষতঃ চিনির ন্যায় গুড়ের ব্যবহারও কোন অংশে ন্যুন নহে। দেশ মধ্যে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্যবহার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা যে এদেশে গুড় ও চিনির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গুড় ও চিনিও যে প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব এই লাভজনক কৃষির বিষয় বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করা কৃষিতত্ত্বের একটী

প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। ইক্ষু চাষের পরীক্ষিত বিষয় গুলি সাধারণের দৃষ্টিগোচর জন্য সোসাইটীর বাগানের প্রধান মালী যেং জোসেফ ডিক্রুজ সাহেবের লিখিত জর্ণেল ৬ষ্ঠ ভাগ ১ম খণ্ডের অনুবাদিত ভারত বর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ পুস্তক হইতে এই বিষয়টী গৃহীত হইল।

ওটাহিটি নামক প্রসিদ্ধ ইক্ষু ইহা মরিসস্ উপদ্বীপ হইতে আনীত। এই ইক্ষু রাঙ্গা বোম্বাই ইক্ষু অপেক্ষা বৃদ্ধিশীল, এদেশে এক্ষণে এই ইক্ষু রই অধিক চাষ হইয়া থাকে। ইহার চাষ করিলে একটা রেটুন * ফসল হয়। উর্ব্বরা ভূমি হইলে ঐরূপ দুইটী ফসলও হইয়া থাকে। এই ফসলের জন্য ক্ষেত্রে চাষ দিয়া ইক্ষুর গোড়ায় অধিক পরিমাণে মাটি দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক কেননা অধিক মৃত্তিকা না দিলে শিকড় বাহির হইয়া পড়ে। এই প্রকার চাসে যে রেটুন ফসল হয় তাহা হইতে বাছিয়া লইলে অন্য ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যেসকল ইক্ষুর চোক তেজাল এবং ডগা মোটা থাকে, তাহাদের কলম বড় ভাল হয়, অতএব চাষ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কতক বিঘা জমিতে সর্ব্বদাই এই জাতীয় ইক্ষুর কলম বা বীজ রাখা উচিত। এই জাতীয় ইক্ষুর রেটুন ফসল কলে মাড়িয়া রস বাহির করিবার পক্ষে সুবিধা নহে, কারণ উহা অতিশয় শক্ত ও গাঁইট ঘন ঘন এবং চারি পার্শ্বে ফেঁকড়ি থাকে সুতরাং অন্য জাতীয় ইক্ষুর প্রথম বৎসরের চারা অপেক্ষা অত্যল্প রস পাওয়া যায়। সোসাইটীর বাগানে মরিসস্ উপদ্বীপের ইক্ষু যথেষ্ট জন্মিয়াছিল। উহার এক এক গাছি ইক্ষু ৯।১০ ফিট উচ্চ এবং তাহার বেড় ৬।৭ ইঞ্চ হইয়াছিল। ঐ সকল ইক্ষুর মধ্যে যে গুলি উৎকৃষ্ট তাহা গোড়া হইতে পাতার নিকট পর্য্যন্ত ১২।১৩ ফিট উচ্চ এবং তাহার বেড় ৭ অবধি ৯ ইঞ্চ এবং ওজনে এক এক গাছ সাত সের হইয়া ছিল।

* ইক্ষু কাটা হইলে পরে গোড়া হইতে যে ফসল হয় তাহাকে রেটুন কহে।

খুড়ুয়ারঙ্গেরওটাহিটি—যতপ্রকার ওটাহিটী দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে এই জাতীয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার চাষ অতি সহজে হয়, এই ইক্ষু শক্ত ও কলম হইতে উত্তম রূপ গাছ হইয়া থাকে এবং ইহা অতি মূল্যবান। বিদেশীয় অন্যান্য প্রকারের ইক্ষু অপেক্ষা এই জাতীয় ইক্ষুর চাসে জল সেচন করিতে ও মরা কলম উঠাইয়া নূতন কলম বসাইতে এবং গাছের গোড়ায় মাটি গুঁড়া করিয়া দিতে অধিক পরিশ্রম হয়না। এই জাতীয় ইক্ষু এক বিঘা ভূমিতে চাষ করিয়া চারার উপযুক্ত এক ফসল, এবং চারিটা রেটুন গৃহীত হইয়াছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরের চাষে যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের তুল্য অধিক ইক্ষু হয় নাই তথাপি ফসল ভাল হইয়াছিল। চতুর্থ বৎসরে কমিটী বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিবেন যে এক জমিতে ক্রমাগত চারিবৎসর এইজাতীয় ইক্ষুর চাষ হইল, অতএব এক বর্ষা উহা পতিত রাখা উচিত। কিন্তু ঐ জমি হইতে ইক্ষুর গোড়া তুলিয়া অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় দেখা গেল গোড়াতে অসংখ্য ভাল ভাল তেজাল ফেঁকড়ি ধরিয়াছে। যদি গোড়া না উঠাইয়া পঞ্চম বৎসরেও ঐ জমিতে ফসল হইতে দেওয়া যাইত, তাহাতে পূর্ব্ব বৎসরের ফসলের সমান ফসল হইত না বটে কিন্তু স্পষ্টই জানাগেল যে ঐ জাতীয় ইক্ষু অতিশয় শক্ত ও বহু ফল জনক, কেননা পঞ্চম বৎসরের গাছের গোড়া হইতেও ফেঁকড়ী হইয়াছিল। উর্ব্বরা ক্ষেত্রেই ওটাহিটির চাষ করা হইয়া থাকে। গত অক্টোবর মাসে দুই বিঘা ভূমিতে ঐ ইক্ষুর নূতন চাষ করা হইয়াছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে প্রথম কাটুনির সময়ে অর্থাৎ সেপ্টম্বর মাসের শেষ অবধি ফেব্রুয়ারির শেষ না হইতে হইতে এই কয়েক মাসের মধ্যে তাহাতে দশ হাজারের অধিক ইক্ষু পাওয়া যাইবে। এই চাষে শতকরা ৯৫ টা ফেঁকড়ি বাহির হইয়াছে এবং যে ফসল হইয়াছে এ অপেক্ষা তেজস্কর ও উত্তম ফসল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মরিসস্ উপদ্বীপের অন্যান্য ইক্ষু অপেক্ষা এই জাতীয় ইক্ষু লম্বায় ছোট হয় বটে কিন্তু উহাতে রস ও মিষ্টতার ভাগ অধিক আছে।

আমার বিশেষ এই অনুরোধ যাঁহারা নিজে ইক্ষু চাস করিয়া চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই জাতীয় ওটাহিটির চাষে প্রবৃত্ত হউন। ফলতঃ যদি ভূমি উত্তম হয় এবং ঋতু অনুকুল থাকে তাহা হইলে অন্যান্য জাতীয় ইক্ষু অপেক্ষা ইহার অধিক চাষ করা উচিত।

সিঙ্গাপুরীয় ইক্ষু—ডাক্তার মণ্টেগু মেরি সাহেব সিঙ্গাপুর হইতে এই জাতীয়ইক্ষু ইংরাজী ১৮৩৭ সালে সোসাইটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন এই জাতীয় ইক্ষু কোন্ স্থান হইতে প্রথমে শিঙ্গাপুরে আইসে তাহা নিশ্চয় বলিতে পারাযায় না। বোধ হয় জাহাজের নাবিক গণের দ্বারা কোন দ্বীপ হইতে এই ইক্ষু এখানে আনীত হইয়াছিল। এই জাতীয় ইক্ষু অন্যান্য ইক্ষু অপেক্ষা অনেকাংশে ভিন্ন। ইহার আকার কাচের ন্যায় চক্‌চকিয়া; সোসাইটীর বাগানে নানাজাতীয় ইক্ষু আছে বটে কিন্তু তদ্‌সমুদায় অপেক্ষা ইহা দেখিতে অতি সুন্দর, যেসকল লোকে ইক্ষুর চাষ করিয়া থাকে, তাহারা প্রায় এই জাতীয় ইক্ষু পছন্দ করে। এই ইক্ষুর বর্ণ ঈষৎ জরদ ইহা দীর্ঘে ৮।১০ ফিট হয় এবং ৪।৫ ইঞ্চ মোটা হইয়া থাকে। ফিকা রঙ্গের ইক্ষুর পাতাসকলও ফিকা হয় তাহা কিছু ক্ষুদ্র ও চৌড়া হইয়া থাকে; তাহার মধ্যস্থলে চৌড়া অথচ সাদা একটা ডোরা থাকে, তাহাতেইঅন্য জাতীয় ইক্ষু অপেক্ষা ভিন্নতা জানা যায়। কিন্তু এই জাতীয় ইক্ষুর চাস অতি কঠিন, পাভি শেয়ালে এই ইক্ষু অতিশয় ভাল বাসে, তাহাতে তাহারা অধিক নষ্ট করিয়া ফেলে; অপর কিঞ্চিৎ অধিক বাতাস বহিলেই পড়িয়াযায় একবার পড়িলে সহজে তুলিয়া দেওয়া যায় না, প্রায়ই ভাঙ্গিয়া পড়ে। অন্যান্য জাতীয় ইক্ষু বাতাসে পড়িয়া গিয়াথাকে বটে কিন্তু সে সকলের অধিকাংশ তুলিয়া দিয়া বাঁচান যাইতে পারে। অতএব এই প্রকার ইক্ষুর চাষ করিতে হইলে, ক্ষেত্রের চারিদিকে ৮ বা ১০ ফিট চৌড়া স্থানে চীন দেশীর ইক্ষু ঘন করিয়া বসাইয়া দিবে, তাহা হইলে বাতাসে অধিক হানি করিতে পারিবেনা। আমায় বিবেচনায় সিঙ্গাপুরীয় ইক্ষু উৎকৃষ্ট, অতএব যদি উক্ত সহজ উপায় দ্বারা প্রবল

ও দম্‌কা বাতাস হইতে রক্ষা করিতে পারাযায়, তাহা হইলে ইহার চাষ করা কর্ত্তব্য।

বটেবিয়া ইক্ষু—এদেশে ইহাকে বোর্বন ইক্ষু কহিয়া থাকে। এই প্রকার ইক্ষুর বিষয়ে আমার অধিক কত্তব্য নাই, আমি যতপ্রকার ইক্ষু দেখিয়াছি সকল অপেক্ষা ইহা অধম, ইহাতে অত্যল্প রস থাকে। এই ইক্ষুতে সবুজ ও ঘোর লালের ডোরা থাকে। ইহা প্রায় ৮ ফিট লম্বা এবং তিন চারি ইঞ্চ মোটা হইয়া থাকে। লোকে অন্যান্য প্রকারের ইক্ষু অপেক্ষা ইহা অধিক পছন্দ করেনা; সুতরাং ইহার চাষ অধিক নাই।

চীনা ইক্ষু—এই জাতীয় ইক্ষু অতি প্রসিদ্ধ, সুতরাং এতদ্ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এই জাতীয় ইক্ষু সকল ইক্ষু অপেক্ষা শক্ত কুই পোকাতে সকল প্রকার ইক্ষু জীর্ণ করিতে পারে কিন্তু ইহাকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা নাই এবং যত প্রবলঝড়বাতাস হউক না কেন কিছুতেই ইহাকে ফেলিয়া দিতে পারেনা। এই নিমিত্ত এই জাতীয় ইক্ষুর অধিক চাষ করিয়া থাকে এবং ইহার চাষে রেটুন ফসল অধিক জন্মে। আমি যত প্রকার ইক্ষুর চাষ করিয়াছি সকল অপেক্ষা ইহার চাসে অল্প পরিশ্রম লাগে এবং সাবধান হইয়া চাষ করিলে অতি বৃহৎ অথচ মোটা যথেষ্ট ইক্ষু পাওয়া যাইতে পারে। ১৮৪৫ সালে সাধারণ কৃষিকারী লোকে এই জাতীয় ইক্ষু অধিক পরিমাণে চাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমি দুই বিঘা জমিতে এই ইক্ষু চাষ করিয়াছিলাম। ক্ষেত্রে ইক্ষু রোপণের পূর্ব্বে একবার এবং রোপণের পরে একবার সার দিয়াছিলাম। তাহাতে এই জাতীয় ইক্ষু সচরাচর যেরূপ হয় তদপেক্ষা দেড় গুণ বৃহৎ এবং তন্মধ্যে কতগুলা তিন ইঞ্চ মোটা হইয়াছিল গত বৎসর মে ও জুন মাসে অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে সকল প্রকার ইক্ষু বিশেষতঃ মরিসস্ উপদ্বীপের ইক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কিন্তু চীনা ইক্ষু বরাবর সমান তেজে বৃদ্ধিশীল ছিল। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে একটী গাছও ঝল্‌সিয়া যায় নাই।

সোসাইটীর ভূরি ভূরি পত্র প্রেরক সোসাইটীতে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তদসমুদায়ে উল্লেখ ছিল চীনা ইক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারে। মেং এফ নিকল সাহেব যশোহরস্থ চাঁদপুরের কারখানা হইতে লিখিয়া ছিলেন তিনি যত প্রকার ইক্ষুর চাষ করিয়া ছিলেন তন্মধ্যে এই জাতীয় ইক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অধিক হয়। তাঁহার চাষে এই ইক্ষু ৯ ফিট উচ্চ হইয়াছিল, অধিকন্তু রুই পোকাতে ওটাহিটি, শিঙ্গাপুরীয়, বোর্ব্বন এবং ধোলি এ সকল জাতীয় ইক্ষু নষ্ট করিয়া ছিল কিন্তু এই জাতীয় ইক্ষুকে স্পর্শও করে নাই। অতএব যে সকল জমিতে হানিকারক কীট পতঙ্গ থাকে সেই সকল ভূমির পক্ষে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ বড় ভাল। মেং পি পি কার্টার সাহেব বক্সার নিকটস্থ ভোজ পুরের কারখানা হইতে ইংরাজী ১৮৪৬ সালের জুন মাসে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন গত মার্চমাসে সোসাইটী হইতে যে পাঁচ প্রকার ইক্ষুর বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার মধ্যে চীনা ইক্ষুর চাসে আশ্চর্য্য প্রকার ফসল জন্মিয়া ছিল। রুই পোকা গ্রীষ্ম এবং অন্যান্য উৎপাতে আর আর জাতীয় এবং এতদ্দেশীয় ইক্ষুর গাছ নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল ব্যাঘাতে চীনা ইক্ষুর কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে নাই। আমার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহার বীজ কনিষ্ঠ অঙ্গুলির তুল্য অতি ক্ষুদ্র ছিল কিন্তু আকারে ওটাহিটি ইক্ষু অপেক্ষা অধিক বড় হইয়াছিল। মেং এস্ এইচ্ রবিন্সন সাহেব কালনার নিকটস্থ ধোবা নামক স্থান হইতে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে লিখিত ছিল, আমি সকল প্রকার ইক্ষুর চাস করিয়াছি কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চীনা ইক্ষু অতি শক্ত ইহা রুই পোকা, উত্তাপ অথবা অন্য কোন উৎপাতে নষ্ট হয় না, আমি যত বিঘা জমিতে ঐ জাতীয় ইক্ষু চাস করিয়াছিলাম, প্রত্যেক বিঘাতে ২০২ মোণ উত্তম পরিষ্কার ইক্ষু জন্মিয়াছে। কিন্তু ঐরূপ জমিতে ওটাহিটি ও লাল রঙ্গের অন্য দুই প্রকার ইক্ষুর চাষ করিয়াছিলাম, তাহা সমুদয় পোকায় নষ্ট করিয়াছে। কেবল দেশীয় সামান্য ইক্ষুগুলা নষ্ট হয় নাই তাহা বিঘাপ্রতি

৫৫মন মাত্র জন্মিয়াছে চীনা ইক্ষু কলে মাড়িলে শতকরা ৫৫ মোণ রস হয় আর তাহার শীটা শতকরা ৪৫ মোন মাত্র এই রস পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানাযায় শতকরা ১১ মোন গুড়ীয় ভাগ থাকে ফলতঃ এদেশের মধ্যে যদিস্যাৎ অত্যুত্তম ইক্ষু জন্মে তাহা হইলেও ঐ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক গুড় হয়না। অতএব যে স্থানে ঐ জাতীয় ইক্ষু অধিক জন্মিবে তথায় অল্প গুড় হইবার সম্ভাবনা নাই। আর ঐ ইক্ষু যখন জন্মিতে থাকে, তখন তাহার যে প্রকার আকার দেখা যায় তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হয় উহা এদেশে উত্তমরূপ হইতে পারে; কারণ যদিও ঐ ইক্ষুর মধ্যস্থলের পরিসর এক ইঞ্চের অধিক নহে, তথাপি সামান্যরূপ চাসেও দশবার ফিট লম্বা এক একটা ঝাড়ে ১৮ গাছ কখন বা ২০ গাছ পর্য্যন্ত ইক্ষু হইতে দেখা গিয়াছে। এই জাতীয় ইক্ষুর পাতা লম্বা অথচ কোমল হওয়াতে অন্যান্য জাতীয় ইক্ষু অপেক্ষা ইহা বরাবর তাজা থাকে।

রসেরগুণ—ওটাহিটির রস সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তাহার রসে জলীয় ভাগ শীঘ্র শুষ্ক হইয়া দানাদার গুড় হইয়াছিল। শিঙ্গাপুরীয় ইক্ষুতেও উৎকৃষ্ট গুড় হয়, ঐ গুড় ১৪।১৫ সের করিয়া এক এক কলসীতে রাখা গিয়াছিল, তাহাতে কলসীর নীচে মিছরির মত আড়াই সের তিন সের সার পড়িয়াছিল এবং তাহার রঙ্গও উত্তম। মরিসস্ এবং বোর্ব্বন ইক্ষুর গুড় তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চীনা ইক্ষুর গুড় সর্ব্বাপেক্ষা ভিন্ন প্রকার হয়, তাহাতে মাত মাত্র হয় নাই একেবারে খাঁড়ের ন্যায় শক্ত সাদা সাদা রঙ্গের গুড় হইয়াছিল।

রোপণ।—যে স্থানে বন্যা আসিবার সম্ভাবনা কিম্বা বৃহৎ বৃহৎ গাছ অধিক না থাকে সেই স্থানের ভূমিই ইক্ষুরোপণের উপযুক্ত। অক্টোবর এবং নবেম্বর মাসে ঐরূপ ভূমিতে তিন বা চারি দিন অন্তর এক এক বার চাষ দিবে। ইক্ষু রোপণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় অক্টোবর মাসের মধ্যে অথবা নবেম্বর মাসের প্রথম, ঐ সময়ে রোপণের নিমিত্ত জমিতে এক ফুট চৌড়া ও একফুট গভীর করিয়া চারি চারি ফিট অন্তরে জুলি কাটিবে এবং মধ্যস্থলে তিন ফিট চৌড়া এক একটা আলি বান্ধিয়া

দিবে জুলি খুঁড়িতে যত মাটী উঠিবে সেই সকল মাটী ঐ আলির উপরে রাখিবে কেননা পরে ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দিবার সময় ঐ স্থান হইতে সহজে মাটি লওয়া যাইতে পারিবে। কৃষকেরা যদি ইংরাজী কোদালের ব্যবহার না জানে তবে দেশীয় কোদাল দ্বারাই ভূমি খনন কার্য্য হইতে পারিবে, কেবল এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যেন জুলি সকল পরস্পর সমান রেখাস্থ হয়। ঐ রূপে জুলি কাটা হইলে চারি চারি ফিট অন্তরে আট ইঞ্চ দীর্ঘ ও আট ইঞ্চ প্রস্থ এবং তিন ইঞ্চ গভীর করিয়া গর্ত্ত খনন করিবে সেই গর্ত্তেও চারিদিকে চারিটী ও মধ্যস্থলে একটি এই রূপ যেন শ্রেণীবদ্ধ হয়। পরে ঐ গর্ত্তে ইক্ষুর ডগা পুতিয়া দিবে। প্রতিবিঘায় ১২০০ বারশত ডগা অথবা ইংরাজী এক একার পরিমিত ভূমিতে ৩৬০০ শত ডগা লাগিবে। জুলি সকলের মধ্যস্থানে চারি চারি ফিট ভূমি ফেলিয়া রাখিবার তাৎপর্য্য এইযে তদ্বারা সূর্য্যের উত্তাপ ও আলো এবং বাতাস আসিয়া ফসল উন্নতি করিবে। প্রত্যেক তিনটা করিয়া পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তের মধ্যে মাটির দিকে মুখ করিয়া পাতিয়া বসাইবে, কিন্তু ঐরূপ ডগা বসাইবার পূর্ব্বে গর্ত্তের মধ্যে যে মাটি থাকে তাহার সঙ্গে সরিসার খোইল মিসাইতে হইবে। পরন্তু সাবধান হইতে হইবে যেন তিসির খোইল না হয়, তাহা হইলে অনতি বিলম্বে উই পোকা ধরিয়া গাছ নষ্ট করিবে। ইক্ষুর ডগা বসান হইলে পর, তখনি তাহার উপরে দুই ইঞ্চ পুরু করিয়া মাটি চাপা দিবে এবং তৎ-ক্ষণাৎ জলসেচন করিবে। অনেকে ছায়াতে ইক্ষু রোপণ করিয়া চারা বড় হইলে সে স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া অন্যত্র রোপণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের পরিশ্রম বিফল হয়। গাছ বারম্বার নাড়িয়া পুঁতিলে অনেক বিলম্বে পুনরায় সতেজ হয়, কারণ তদ্বারা শিকড় ছিঁড়িয়া যাওয়াতে সূর্য্যের উত্তাপ প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। ফলতঃ বিষেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ঘন করিয়া একেবারে একস্থানে রোপন করাই ভাল। তাহাতে কোন প্রকার হানি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং সূর্য্যের উত্তাপে কোন ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ বিনা বাধায় অতি

শীঘ্র বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠে। পরন্তু অত্যন্ত শীঘ্র হইবার আশয়ে হাপোরের মধ্যেই গাছ করিতে চেষ্টা করিলে ইক্ষু প্রকৃত রূপে বৃদ্ধিশীল হইবে না, ক্রমে খর্ব্ব হইয়া যাইবে।

অনেক প্রকার ইক্ষুর চাস করিয়া পরস্পর তুলনা করা গিয়াছে, তাহাতে জুলি কাটিয়া চাস করাই উত্তম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কারণ ঐরূপে চাষ করিলে জুলির মধ্যে মধ্যে যে আলি থাকে তাহাতে ছোট ছোট চারা গাছ আশ্রয় পায় এবং আলির উপর গমন করিয়া জুলিতে সহজে জল দেওয়া যাইতে পারে, অপর অধিক জল দিতে হয়না সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন দিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু জুলি না কাটিয়া চতুষ্কোণে গর্ত্ত করিয়া ইক্ষু রোপণ করিলে চাসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অধিক খরচ পড়ে, কেননা প্রত্যেক গর্ত্তে জল সেচন করা কঠিন ব্যাপার এবং সে সকলের মধ্যস্থল কাটাইয়া না দিলে এক গর্ত্ত হইতে অন্য গর্ত্তে জল যাইতে পারেনা। অপর সূর্য্যের উত্তাপ সম্পূর্ণ লাগাতে শীঘ্রই জল শুখাইয়া যায় তাহাতে প্রায় এক দিন অন্তর জল সেচনের আবশ্যক হয় সুতরাং অধিক খরচ পড়ে।

সার।—ইক্ষুর চাসের নিমিত্ত যত প্রকার সার আছে সর্ব্বাপেক্ষা এই সারগুলি অতিশয় তেজস্কর যথা রাই সরিষার খোইল, পুষ্করিণীর মৃত্তিকা, পচাগোবর, পচা লতাপাতা, ডেলা চূণ এবং সিটা এই সকল সার নিম্ন লিখিত প্রকারে ক্রমে ক্রমে জমিতে দিয়া মাটির সঙ্গে মিসাইবে। নীলকুঠীর চৌবাচ্চায় যত সিটা পাওয়া যায় একত্র করিয়া অগ্রে ভূমির উপর ছড়াইয়া দিয়া দুই তিনবার লাঙ্গল দিবে। পরে বিঘা প্রতি চারি মোণ করিয়া ডেলা চূণ ছড়াইয়া দিয়া যাবৎ ঐসার মাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে মিশ্রিত হইয়া জমি প্রস্তুত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত অনেক বার লাঙ্গল দিবে। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জুলি ও কলম পুঁতিবার গর্ত্ত কাটিয়া তত্রস্থ মাটির সঙ্গে রাই সরিসার খোইল মিশাইয়া দিবে, এই সারের গুণ এই যে জমিতে উই পোকা আসিতে পারেনা এবং শেষে ইক্ষু অতিশয় তেজাল হইয়া উঠে। গত দুই বৎসর

সোসাইটির বাগানে ইক্ষুর জমি প্রস্তুত করিবার সময় উই পোকাতে বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর ১৮৩৬ সাল অবধি ঐকীটে বড় হানি করিতে পারে নাই। অনুমান হয় বারম্বার চাষ করাতে ঐ সকল পোকা নষ্ট হইয়া থাকিবে অথবা রাই সরিসার খোইল এবং ডেলা চূণ সারের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেওয়াতে ঐ পোকার মূল নষ্ট হইয়াছিল।

পাইট।—ইক্ষুর জুলি হইতে আগাছা ঘাস বিশেষতঃ কেশে ঘাস তুলিয়া ফেলিয়া সর্ব্বদা ঐ সকল পরিষ্কার রাখিবে। কারণ কেশে অনেক দূর পর্য্যন্ত বদ্ধ মূল হয়। এবং ইক্ষুর গোড়ায় সমুদয় রস আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহাতে ইক্ষুর পক্ষে বিস্তর হানি হয়। জুলির পার্শ্বে উপরিভাগে যে সকল ঘাস জন্মে তাহাতে অধিক হানি সম্ভাবনা নাই। সে সকল ঘাস কাস্তিয়া দিয়া একেবারে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে অথবা সেই স্থানে শুকাইয়া জ্বলিয়া যায়। নিড়াইবার সময় ইক্ষুর কলম সকলের তদারক করিতে হইবে, যদিস্যাৎ দেখিতে পাও কোন ডগা হইতে কেকড়ি বাহির হয় নাই, তাহা হইলে ঐ সময়েই সেই স্থানে অন্য একটি ডগা বসাইয়া দিবে। পরে জানুয়ারী মাসের মধ্যে চারা সকল একফুট উচ্চ হইলে জুলিগুলি একবার খুঁড়িয়া দিয়া জল দিবে। তদনন্তর চারা সকল তেজে বৃদ্ধিশীল হয় এনিমিত্ত গোড়ার মাটী ঈষৎ শুষ্ক হইলে তাহা উল্টাইয়া দিয়া হাত দিয়া গুঁড়া-করিয়া দিবে, তাহাতে মার্চ মাসের কয়েক দিনের মধ্যে গাছ সকল অধিক তেজাল হইয়া উঠিবে। এই সময় গাছের গোড়ায় অধিক পরিমাণে সার দিতে হইবে। ফলতঃ ইক্ষুর ভূমি সার দিয়া সম্পূর্ণ রূপ উর্ব্বরা প্রায় করিতে পারা যায় না এই নিমিত্ত পুনর্ব্বার গাছের গোড়ায় সার দিতে হয়। সার দিবার সময় দুই মুঠা সরিসার খোইল, পচা গোবর পচা পাতা, এবং পুকুরের পাঁক এই সকল একত্র করিয়া আধ আধ ঝুড়ি পরিমাণে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দিবে, তাহার পর জল সেচন করিতে আরম্ভ করিবে। এই সকল কার্য্যের পর আর একবার খুঁড়িয়া

দিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে যেন গাছের গোড়া দুই ইঞ্চ মাত্র খুলিয়া আইসে, এবং যে সার দেওয়া যায় তাহা যেন ঢাকা পড়ে। যদি এপ্রেল মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হয় তাহাহইলে পুনর্ব্বার জল সেচন খনন ও নিড়ান করিতে হইবে পরে সে মাসে অধিক বৃষ্টি হইলে আলির উপরিস্থ মৃত্তিকা সকল জুলির মধ্যে ফেলিয়া দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিবে। ঐ সকল লোক যেন আলির উপরিস্থ ঘাস ও অন্যান্য গাছ বাছিয়া ফেলিয়া সেই আলি ভাঙ্গিয়া সমুদয় ক্ষেত সমান করিয়া দেয়। এই রূপে মাটী দেওয়ার কাজ জুন মাসের শেষ ও জুলাই মাসের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

জুন মাসে গাছের গোড়ায় শুক্না পাতা সকল তুলিয়া দিয়া দুই মুঠা খোইল, প্রত্যেক ঝাড়ের গোড়ায় দিবে। কিন্তু পাতা তুলিবার সময়ে সাবধান হইতে হইবে একটীও কাঁচাপাতা যেন নষ্ট না হয়; কেননা কাঁচা পাতা নষ্ট হইলে গাছের পক্ষে অত্যন্ত হানি হইবে। বিবেচনা করিয়া ঐ প্রকারে খোইল দিলে বিঘা প্রতি চারি মোণ খোইল হইলেই যথেষ্ট হইবে। খোইল দেওয়া এবং শুক্না পাতা তুলিয়া দেওয়া হইলে গাছের গোড়ায় ছয় ইঞ্চ উচ্চ করিয়া মাটী দিবে। তাহাতে গাছ সকল উত্তম রূপে জল আকর্ষণ করিতে পারিবে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে যেন ইক্ষু সকলের মধ্য স্থান শূন্য নাথাকে, মাটী দ্বারা সকল যেন পূর্ণ হয়।

জুলাই মাসে ইক্ষু সকল এক ফুট উচ্চ হইলে পাতা সকল একত্র করিয়া দড়ি দিয়া গোড়ায় বাঁধিয়া দিবে। কিন্তু প্রত্যেক ঝাড়ের মধ্যে এমত ছিদ্র রাখিতে হইবে যে তাহা দ্বারা ইক্ষুতে আলো ও বাতাস লাগিতে পারে। অনন্তর গোড়া শক্ত করিবার জন্য মাটী দিবে, কিন্তু গাছ একফুট উচ্চ না হইলে কোন ঝাড় বাঁধিয়া দিবেনা এবং তাহার গোড়াতেও শক্ত হইবার জন্য মাটী দিতে হইবেনা। ইক্ষু ক্রমে যেমন বড় হইবে, তেমনি চারিধার পাতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে থাকিবে। বন্ধনের গুণেই ফসল ভাল হয় এনিমিত্ত এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

ভূমির উর্ব্বরত্ব এবং সারের গুনানুসারে ইক্ষু কাটিবার সময় হয়। যে প্রকারে জমি প্রস্তুত করিতে ও সার দিতে বলা হইল যদি সেই নিয়মে জমি প্রস্তুত ও সার দেওয়া হয় তাহাহইলে মাড়িবার উপযুক্ত যেসকল ইক্ষু ১৬ই অক্টোবর অবধি ১০ নবেম্বর পর্য্যন্ত রোপণ করা যায়, তাহা আগামী নবেম্বর ও ডিসেম্বর মধ্যে কাটিবার যোগ্য হইবে। কিন্তু যদি কলম করিবার মানস থাকে তাহাহইলে অক্টোবর কিম্বা নবেম্বর মাসেই কাটিবে, ইহা অপেক্ষা বিলম্ব করিলে ইক্ষুর অনেক চোক মরিয়া বিস্তর ক্ষতি হইবে।

পলাণ্ডু

এতদ্দেশে বড় ও ছোট—দুই প্রকার পেঁয়াজ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দুই প্রকারই সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, পূর্ব্বে হিন্দু দিগের মধ্যে অনেকেই পেঁয়াজ ব্যবহার করিতেননা, এক্ষণে পেঁয়াজের বিলক্ষণ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া এবং ক্রমশঃ হিন্দুদিগের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতির সহিত স্বধর্ম্ম বন্ধনের শিথিলতা নিবন্ধন পেঁয়াজ প্রভৃতি নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

বড় পেঁয়াজ তরকারি বিশেষের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ছোট পেঁয়াজ তরকারী ও মসলার কার্য্য করে। বড় পেঁয়াজ অপেক্ষা ছোট পেঁয়াজের মূল্য অধিক ও উপকারী।

নিম্ন প্রদেশে ছোট পেঁয়াজের আবাদই অধিক হইয়া থাকে। অগ্রে ছোট পেঁয়াজের আবাদ প্রণালী লিখিয়া, পশ্চাৎ বড় পেঁয়াজের বিষয় বিবৃত করিব।

বর্ষাকালে যে ভূমি জলমগ্ন থাকে সেই ভূমিতেই ছোট পেঁয়াজের আবাদ ভাল হয়। জমীতে আশুধান্য রোপন করা হইয়া থাকিলে

তাহার খড় পচিয়া পেঁয়জের উপযোগী সার হয়। আর হৈমন্তিক ধান্য রোপিত হইলে তাহার খড় পোড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট সার হয়, অন্যথা গোবরের সারও পেঁয়াজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে।

২০।২২ খান চাষ দিলেই জমী বিলক্ষণ পাইট হয়, ঢিল ভাঙ্গিয়া মাটি ধূলিবৎ হইলে মৈ দ্বারা ভূমি সমান করিতে হয়। তৎপর অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর করিয়া আকরা † দ্বারা ৮ অঙ্গুলি পরিমিত গর্ত্ত করিয়া ভিলি কাটিতে হয়। তাহাতে পেঁয়াজের বীজ সোজাভাবে ৫ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর বসাইয়া সম্মুখস্থ ভিলির মাটী হস্তদ্বারা টানিয়া উহাতে চাপা দিতে হয়। এই প্রকারে রোপন কার্য্য সমাধা হইলে সাবধানে দেখিবে যেন গোরু ইত্যাদি উহার মধ্যে যাইয়া পেঁয়াজের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া না দেয়। ক্রমে পেঁয়াজ গাছ বড় হইলে উহার চতুর্দ্দিক হইতে অনেক গাছ উঠিয়া, ঝাড়াল হইয়া থাকে। এই ভাবে সমুদয় গাছ বড় হইলে উহার ফুল হয়, মধ্যে মধ্যে মাটিশুষ্ক হইলে জল দেওয়ার আবশ্যক হয়। কার্ত্তিক মাসে পেঁয়াজের আবাদ হইলে মাঘ মাসেই পেঁয়াজের ফুল দেখা যায়, যখন ঐ ফুল ও বীজ পত্রাদি শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ হয় তখন বাঁসের গোঁজ দ্বারা পেঁয়াজ গুলি উঠাইতে হয়। বাঁশের গোঁজে গাছ হইতে ২ দুই অঙ্গুলি অন্তরে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত মাটীতে সোজাভাবে প্রবেশ করাইয়া চাড় দিলেই পেঁয়াজ গাছ সমূলে উঠিয়া পড়ে, তখন উহা বাড়ীতে লইয়া গিয়া, শিকড় ও পত্র কাটিয়া শুকাইয়া উচ্চ স্থান (মাচার উপর) রাখিতে হয়। যে স্থানে পেঁয়াজ রাখিবে সেস্থানে সর্ব্বদা বাতাস যাওয়া আবশ্যক, মধ্যে মধ্যে রৌদ্রও লাগাইতে হয়।

---

† আকরা, অর্থাৎ ভিলি কাটিবার যন্ত্র বিশেষ। লাঙ্গলের আকৃতি বিশিষ্ঠ কিন্তু লাঙ্গল হইতে ছোট।

বীজরক্ষার নিয়ম ।

উক্ত পেঁয়াজের মধ্যে যে গুলি বীজের জন্য রাখিতে হয় তাহা মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হয় ও রোপন করিবার সময় উহার পড় সকল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পৃথক্ করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক পড়ের (কোয়ায়) গোড়ায় যেন শিকড়ের অংশ থাকে এমত ভাবে ছাড়াইতে হয়। যতই পরে পরে ছাড়ান যাইবেক ততই অল্প অল্প ওজনের পেঁয়াজে অনেক জমী আবাদ হইবে।

ব্যয় ।

১ বিঘা জমিতে চাস খরচ		...	...	৪
"	" জন মজুর	...	...	৩
"	" খোরাকী	...	...	২
"	" রাজস্ব	...	...	২
"	" বীজ পাঁচ মোনের মূল্য		...	৭৷৹
			মোট	১৮৷৹

এক বিঘা জমীতে আয়; যখন মাটী হইতে উঠান যায় তখন কাঁচা পেঁয়াজ ২৫০ মোন হইয়া থাকে উহা তৎকালে ৷৹আনা দরে বিক্রয় করিলে ও ১২৫ টাকা হয় আর ঐ পেঁয়াজ শুকাইলে ১২৫ মোণ থাকে তখন ১) টাকার দরে বিক্রয় করিলে ১২৫ টাকা হয়, কিন্তু পেঁয়াজ শুকালে ব্যয় পড়ে ও অনেক পচিয়া যায় অতএব খরচ বাদে ৮৩।৮২ টাকা লাভ থাকে। কাঁচা পেঁয়াজ বিক্রয় হইলে বিঘায় ১০০ টাকাই লাভ থাকে।

বড় পেঁয়াজ অবাদেরপ্রণালী ।

বড় পেঁয়াজ আবাদের প্রণালী স্বতন্ত্র।

প্রথমতঃ ইহার বীজ প্রস্তুত করণের জন্য কার্ত্তিক মাসে ভূমি চাষ করিয়া পূর্ব্বোক্তমত ভিলি কাটিয়া অর্দ্ধ হস্তান্তর পরিমাণে পেঁয়াজ রোপন করিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিয়া ভূমি সিক্ত রাখিতে হয়। ক্রমে গাছ বৃদ্ধি হইয়া গাছের অগ্রভাগ পুষ্পিত হইয়া উঠে, এবং একটী বৃহদাকার থকা হইয়া তাহাতে বীজ জন্মে, চৈত্র মাসে উহা সুপক্ক হইলে কাটিয়া বীজ ছাড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ পরিষ্কৃত পাত্রে মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে, এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হয়।

পেঁয়াজের বীজ কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বপন হইয়া থাকে। বীজ বপণের ভূমিতে উত্তমরূপ চাষ দিয়া ধূলিবৎ মৃত্তিকা করিতে হয়, ঐ ধূলিবৎ মৃত্তিকা ক্ষেত্রের মধ্যে একস্থানে স্তুপাকার করিয়া রাখিতে হয়, তৎপর সমস্ত ক্ষেত্রে মৈ দ্বারা সমান করিয়া ২ হাত দীর্ঘ ও ২ হাত প্রস্থ করিয়া খুপি বাঁধিতে হয়। ঐ খুপি সমুদয়ের মধ্যে বীজ ছড়াইয়া দিয়া ধূলি স্তুপ হইতে মাটী লইয়া বীজোপরি ছড়াইয়া দিতে হয়। এই ভাবে বীজ বপন হইলে ৭।৮ দিন মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, ইহাতে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হয়। মাঘমাসে বীজগুলি তুলিয়া রোপনের যোগ্য হইলে, এদিগে পেঁয়াজ রোপণের জন্য ভূমি চাস করিতে হয়। ভূমির উৎকৃষ্ট রূপ পাইট্ হইলে ভূমিতে পূর্ব্বলিখিত মত খুপি কাটিয়া লইতে হয়। কৃষকেরা পেঁয়াজের ক্ষেত্রে ছাই সংগ্রহ করিয়া রাখে, পেঁয়াজ বপনের খুপির উপরে সেই ছাই ছড়াইয়া দিয়া চারা গুলি এক একটী আট অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপন করে। ভূমি সিক্ত থাকিলে রোপণের পর ২।১ দিন জল দিতে হয়না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া সর্ব্বদা ক্ষেত্র সিক্ত রাখাই কর্ত্তব্য। পেঁয়াজের গাছ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উঠে এবং গোড়ায় অনেক গুলি

পেঁয়াজ জন্মে। গাছ পক্ক হইবার উপক্রম দেখিলেই পূর্ব্বোক্ত রূপ নিয়মে পেঁয়াজ তুলিয়া লইতে হয়। এবং শুষ্ক করিয়া যত্নে মাচার উপরি রাখিয়া দিতে হয় এই পেঁয়াজের দর কম হইলেও প্রত্যেক বিঘায় খরচ বাদে ৬০।৭০ টাকা লাভ থাকে।

ইহার বীজের আবাদ অর্থাৎ পেঁয়াজ রোপন করিয়া বীজ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলে তাহাতেও বিলক্ষণ লাভ হয়। ইহার বীজ সচরাচর ২৫।২৬ টাকা মোণ দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। পেঁয়াজের সম্বন্ধে আমরা সময়ান্তরে আরও কিছু বলিব। পেঁয়াজের কৃষি বড় লাভবান। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের অনেক জাতিতে ইহার আবাদ করিতে আজও ঘৃণা করেন।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
চাভট্ট কৃষিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা।